বাংলায় আফগান শাসন

(১৫৩৮-১৫৭৬)

আবদুস সাঈদ

অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসে আফগান শাসনকাল (১৫৩৮–১৫৭৬) সময়ের বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বে অপরিসীম। তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্ম, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আফগান শাসনের ছোঁয়ার ক্রমবিকাশের ধারায় আজকের স্বাধীন সার্বভৌম, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক, আধুনিক বাংলাদেশ। আফগান শাসকেরা, বিশেষত শেরশাহ, সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের ধারা বাংলার সমাজে রেখে গেছেন। আলোচ্য গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসবিদগণ এই বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। ড. সাঈদ এর ফার্সি, আরবি ও উর্দু ভাষায় সাবলীল দখলের কারণে বাংলার ইতিহাসের সেই লুকিয়ে থাকা দিকটি আজ উন্মোচিত হয়েছে। শের হত্যা করে শেরশাহ উপাধি পাওয়ার দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক গল্পটি তিনি শুধু অসত্যই প্রমাণ করেননি বরং বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে উপাধি লাভের ঐতিহাসিক বিবরণী 'ভূমি জরিপ' (ভূমি পরিমাণ) যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোধহয় আফগান শাসক শেরশাহের পূর্বে কেউ উপলব্ধি করেননি। গ্রন্থকারের অনুজ আমলা সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া–এর অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ইকবাল হোসেনকৃত গবেষণা গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তরের ফলে বাংলা ভাষার পাঠক এসব ইতিহাস গল্পকে ঐতিহাসিক সত্যে আনতে পারবেন।

প্রফেসর ড. আবদুস সাঈদ ১৯৪৪ সালের কোলকাতার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মওলানা আজাদ কলেজ থেকে ফার্সি ভাষায় সম্মান কোর্স কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২-৯৪ সালে তিনি ইতিহাস বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজের পরিচালকের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমির সাথে যুক্ত থেকে অবসর জীবন যাপন করছেন।

অনুবাদক পরিচিতি

অনুবাদক মো. ইকবাল হোসেন-এর জন্ম ১ জুন ১৯৫৭ সালে কুষ্টিয়া জেলায়। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে ইংরেজিতে সম্মান ডিগ্রি এবং ১৯৭৮ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে সুদীর্ঘ ২৬ বছর সফলভাবে শিক্ষকতা করে বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার আমলা সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। গ্রন্থের ভাষান্তর হিসেবে এটি তাঁর প্রথম প্রয়াস।

বাংলায় আফগান শাসন (১৫৩৮-১৫৭৬)

বাংলায় আফগান শাসন
(১৫৩৮-১৫৭৬)

মূল : আবদুস সাঈদ
অনুবাদ : মো. ইকবাল হোসেন

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কার্যক্রম
অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা
অর্থায়ন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬॥ প্রকাশনা ২৭

বাংলায় আফগান শাসন (১৫৩৮-১৫৭৬)

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৩/এপ্রিল ২০১৬

বা/এ ৫৪৬২
[অর্থবছর ২০১৫-২০১৬ : গসঅবি : গবেষণা ৫]

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০ কপি

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
মোবারক হোসেন
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ড. আমিনুর রহমান সুলতান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
দেওয়ান মিজান

মূল্য
সাতশত সত্তর টাকা মাত্র

BANGLAY AFGHAN SHASON Translated by Md. Iqbal Hossain. Published by Mobarak Hossain, Director, Research, Compilation, Lexicography and Encyclopedia Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published April 2016. Price Tk. 770.00 only.

ISBN 984-07-5471-8

উৎসর্গ

আমার ও মূল গ্রন্থকার-এর পরম শ্রদ্ধেয়
শিক্ষাগুরু প্রফেসর ড. এ.এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
প্রফেসর ড. আব্দুল করিম
প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান স্যারকে

~ www.amarboi.com ~

পূর্ব কথা

আফগানরা বাংলায় খুবই সীমিত সময়ে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ৩৮ বছর শাসন করেছিল। কিন্তু যেমনটা গ্রন্থের লেখক দেখিয়েছেন, কিছু তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আফগান শাসক ছিলেন শেরশাহ যিনি বাংলাও জয় করেছিলেন। বস্তুত বাংলা অধিকার ছিল ইতিহাসে তার পরবর্তী বিরাট সাফল্যের একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। প্রশাসক হিসেবে তার ভূমিকা গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে. আর. কানুনগো। তিনি লিখেছেন, "শেরশাহ যর্থাথই আকবরের সাথে দ্বন্দ্বে যেতে পারেন যিনি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠিকে সমঝোতার মাধ্যমে প্রথমবারের মত একটি মহান ভারত জাতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।" কিন্তু শের শাহের নীতি তার উত্তরসুরীদের দ্বারা অনুসৃত হয়নি। তার মৃত্যুর অল্পকিছুদিন পরেই তার রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। বাংলাকে তার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং দেশটি সূর ও কররানীদের মত বিভিন্ন আফগান গোষ্ঠীদ্বারা শাসিত হতে থাকে। কররানীদের শেষজন, দাউদ খান, শেষ পর্যন্ত মোগলদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ১৫৭৬ সালেই আফগানরা মোগলদের কাছে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

বাংলায় আফগান শাসনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে প্রশাসনের বিকেন্দ্রিকরণ যা ঘটনাক্রমে বারো ভুঁইয়াদের জন্ম দেয়। এই বিষয়টিকে 'মূলুক আল তাওয়ায়েফ' হিসেবে আফগান ঐতিহাসিক নিমাত আল্লা তার গ্রন্থ 'তারিখ-ই খান জাহানী ওয়া মাখজান ই আফগানী' তে খুব দক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "(যখন) ইসলাম শাহের মৃত্যু, ফিরোজ খানের হত্যাকাণ্ড এবং আদলীর সিংহাসন আরোহণের খবরটি হিন্দুস্তানের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়লো, প্রত্যেক অমাত্যরা, যেখানে তার অবস্থান হোক না কেন, বিদ্রোহ করে বসলেন এবং 'মূলুক আল তাওয়ায়েফ' এর মত রাজা হয়ে গেলেন এবং সর্বত্র এক বিশাল বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।"

শেরশাহ বাংলাকে প্রথমবারের মত শাসন করেন তার ডেপুটি বা গর্ভনর খিদির খানের মাধ্যমে। কিন্তু খিদির খান বিদ্রোহ করেন এবং শেরশাহকে বাংলায় ছুটে আসতে হয় তার সীমান্ত রক্ষার্থে। তিনি পাঞ্জাব থেকে এত দ্রুত ছুটে এলেন যে খিদির তার আগমন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নাই। খিদির তার জন্য নির্ধারিত ভাগ্যই বরণ করলেন এবং শেরখান বাংলাকে নির্দিষ্ট কতকগুলো ছোট ছোট প্রশাসনিক একক পরগনায় বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক পরগণার জন্য একজন করে কর্মকর্তা নিযুক্ত করলেন এবং সকল কর্মকর্তার উপর সমন্বয়কারী হিসেবে কাজী ফদিলাতকে নিয়োগ করলেন। তাকে

~ www.amarboi.com ~

গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়নি এবং তার ক্ষমতা কেবল পরগনার কর্মকর্তাদের কাজের তত্বাবধানে সীমিত রাখা হয়। এভাবেই শেরশাহ তার প্রশাসনকে বিকেন্দ্রিকরণ করেন এবং এটাকেই আফগান ঐতিহাসিক নিমাত আল্লা ' মূলুক আল তাওয়ায়েফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এ থেকেই বাংলায় বারো ভুঁইয়াদের উত্থান।

শেরশাহ একজন মহান শাসক, রাষ্ট্রনায়ক, অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রশাসক ছিলেন। তিনি এমন একটি পদ্ধতি নিমার্ণ করেছিলেন যা শুধু তাকেই জীবিত রাখেনি বরং মোগলদের জন্য একটি মডেলও ছিল। এর কোন কোনটি আজও চিহ্নিত করা যায়। তার গ্রান্ড ট্রাংক রোড এবং অনেক শেরপুর ও শেরগড় আজও টিকে আছে। তার 'সরাই' বর্তমান শতাব্দীতেও একটি বহুল আলোচিত শব্দ।

ড. আব্দুস সাঈদ বাংলায় আফগানদের উত্থান ও পতনের ইতিহাসের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে করেছেন এবং এ কয়টি কথা দিয়েই আমি তার গবেষণাগ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব দি আফগান রুল ইন বেঙ্গল'কে পাঠকদের জন্য অনুমোদন দিচ্ছি।

চট্টগ্রাম
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

ড. আব্দুল করিম
প্রফেসর ইমেরিটাস
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ
ও
প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি গবেষণা সন্দর্ভ যা বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাস নিয়ে রচিত। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহ কতৃক গৌড় বিজয় থেকে শুরু করে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ শাহ কররানীর রাজমহলের যুদ্ধে মোগলদের হাতে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত এর সময়কাল বিস্তৃত। সময়কাল ও ঘটনাসমূহ মাত্র ৩৮ বছরের যা ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদেশি শাসনের ইতিহাসের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি একক, কিন্তু গুরুত্ব ও তাৎপর্যে সময়টি যুগান্তকারী, বিশেষত বাংলায়। বাংলার রাজনীতিতে শেরশাহ এবং তার উত্তরসুরীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের সার্বভৌমত্বের সময়কাল সংক্ষিপ্ত কিন্তু শাসক হিসেবে তারা এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। দিল্লির শাসক হিসেবে আফগানদের কর্তৃত্ব ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি কেড়েছে বটে কিন্তু দিল্লির সূর সালতানাতের অংশ হিসেবে বাংলার ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে বাংলায় আফগান শাসকেরা ঐতিহাসিকদের নিকট থেকে তাদের প্রাপ্য গুরুত্ব লাভ করেননি।

সুতরাং রাজনৈতিক সমাজ হিসেবে বাংলায় আফগান কর্তৃত্বের উপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। শেরশাহের শাসন এবং বাংলায় আফগান শাসকেরা ঐতিহাসিকদের নিকট থেকে খুব কম মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। স্যার যদুনাথ সরকার তার 'হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বাংলায় আফগান শাসন নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাপ্ত সূত্র নিয়ে বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাস রচনার এখানেই প্রথম চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মাত্র বিশ পৃষ্ঠায় দুই অধ্যায়ে রাজকীয় প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কে. আর. কানুনগো তার 'শেরশাহ' (১৯২১) এবং 'শেরশাহ এন্ড হিজ টাইমস' (১৯৬৫) গ্রন্থদ্বয়েও রাজকীয় প্রেক্ষাপটে শেরশাহ সম্পর্কে লিখেছেন। এখানে গৌড় বিজয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। শেরশাহের পরবর্তী সময় নিয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত কোন আলোচনাই করেননি। নীরোদ ভূষণ রায় তার 'সাকসেসরস অব শেরশাহ' গ্রন্থে বাংলায় আফগান শাসন সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলো ছড়াতে পারেননি। ড. আব্দুল করিম-এর 'বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল' উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে ১৫৭৬ সালে কররানী আফগানদের পতন পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের উপর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এখানেও মাত্র ৩৪ পৃষ্ঠায় বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

~ www.amarboi.com ~

আমার এই গ্রন্থটিকে নয়টি অধ্যয়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এতে দুটো পরিশিষ্ট সংযুক্ত আছে। প্রথম অধ্যায়ে ইতিহাসের সূত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান রচনাবলির একটি বিবরণ এবং গবেষণার ক্ষেত্র নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আফগান বিজয়ের পূর্বে বাংলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কে. আর. কানুনগো শেরশাহের গৌড় বিজয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কিন্তু শের শাহের পরবর্তী সময় নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। অন্যান্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়টি নিয়ে পর্যাপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি। কীভাবে এক শক্তিশালী শাসক আলা-আল-দীন হুসেন শাহের পুত্র সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের অধীন বিশাল বঙ্গরাজ্য, শাশারামের ক্ষুদ্র এক জায়গীরদারের পুত্রের আক্রমণের কাছে হার মানলো তাই নিয়ে বিস্তারিত ভাবে উপর্যুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বাংলার সুলতানের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ যা পূর্বের পণ্ডিতেরা সাময়িক সূত্র/উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র, তাকেই সুনির্দিষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনায় আনা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শের শাহের গৌড় বিজয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্ববতী পণ্ডিতদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে হয়েছে। গবেষণাটি মূলত এককভাবে আফগানদের নিয়ে। চতুর্থ অধ্যায়টি শেরশাহের বংশধরদের নিয়ে এবং বাংলায় তার কর্তৃত্বের সুসংহতকরণ বিষয়ে যা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি তো আকৃষ্ট করেই নি এমনকি ফারসি ভাষার ঐতিহাসিকরাও তা উল্লেখ করেননি। বিষয়টা সম্ভব সর্বোচ্চ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মুদ্রা, শিলা লিপি, পর্তুগিজ, আরাকানীয় এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কিছু নূতন উপকরণ যেমন খোদাই করা বাণী, মুদ্রা এবং ফারসি ভাষার সাহিত্যকর্ম 'গঞ্জ-ই রাজ' এর সহযোগিতায় শামস আল দিন মুহাম্মদ শাহ গাজির বংশের রাজকয়ী উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে কররানী বংশের ইতিহাস। কিছু নতুন খোদাইকৃত বাণীর উদ্ধার আমাকে এতদসংশ্লিষ্ট কিছু পূর্ব ধারণার পুনঃব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করেছে। সপ্তম অধ্যায় প্রধানত শেরশাহ সূরের প্রশাসনিক বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ। অষ্টম অধ্যায়ে প্রথমবারের মতো দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে আফগান শাসনের কারণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। নবম অধ্যায়টি উপসংহার যেখানে প্রধান বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-১ এ ফরিদখান বাঘ/সিংহ হত্যা করে শেরখান উপাধি লাভ করেছিলেন মর্মে প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-২ এ মুদ্রা ও সাহিত্য কর্ম সূত্রের ওপর ভিত্তি করে শের শাহের অভিষেক অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবি, ফার্সি, উর্দু এবং বাংলা ভাষার শব্দ বা বাগধারার ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত চিহ্নসমূহ তুলে দেওয়ার জন্য আমি পাঠকদের কাছে দুঃখিত। এটা করা হয়েছে শুধুমাত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কম্পিউটারে লেখার সুবিধার্থে। আর এটা করতে গিয়ে আমি ঐ সব শব্দের বানানকে উচ্চারণের সরলতায় ব্যবহার করেছি।

আগেই বলেছি এ বইটি আমার ১৯৮৬ সালে সমাপ্ত পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য কৃত সন্দর্ভের একটি সংশোধিত রূপান্তর। সন্দর্ভটি ১৯৮৭ সালে আমাকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি এনে দেয় যা আমি দেশের বরেণ্য ঐতিহাসিক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল করিমের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছিলাম। আমার সমগ্র শিক্ষা জীবনে ড. করিমের অবদান অতুলনীয় ও ব্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স গ্রহণকালে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণা কার্যক্রম তিনি আমাকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সেই ১৯৬৮ সাল থেকে যখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান করি। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমার পি.এইচ.ডি গবেষণাকালে তিনি আমাকে সফলভাবে গবেষণা সমাপ্ত করা পর্যন্ত নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আমার গবেষণা সহায়ক সব ধরনের উপকরণ ব্যবহারে সহজ প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। আমি তার কাছে চিরঋণী। আমার এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণার সুপারভাইজার তার শেষ আনুষ্ঠানিকতাও সুচারু রুপে করেছেন আমার এই গ্রন্থের একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়ে যা বইয়ের শুরুতেই দেখা যাবে। আমার পরম দুর্ভাগ্য এই যে তিনি বইটির প্রকাশিত রূপ দেখে যেতে পারেননি।

আমার বাবা এবং আমার নিজের আধ্যাত্মিক গুরু আল হাজ্ব শাহ সূফি মুহাম্মদ আবুল হোসেন মুজাদ্দেদী সাহেবের নিকট আমি অন্তরের দিক থেকে কৃতজ্ঞ। তার ভালবাসা, যত্ন এবং আর্শিবাদ আমাকে আমার বর্তমান অবস্থান পর্যন্ত এনে দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির স্যার এর কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আমার গবেষণাকালীন সব ধরনের সহযোগিতার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিভাগীয় সকল শিক্ষকের নিকট কৃতজ্ঞ। তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্য আমি আমার ইতিহাস বিভাগীয় সকল জুনিয়র ও সিনিয়র সহকর্মীদের জানাই কৃতজ্ঞতা। আমি প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, প্রফেসর মুকাদ্দেসুর রহমান (মরহুম) এবং প্রফেসর আসমা সিরাজুদ্দিন-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ তারা সমগ্র গবেষণাকালে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রফেসর সিরাজুদ্দিন আমার পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত সংস্করনটি আদ্যোপান্ত পড়েছেন, ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সমালোচনা করেছেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বইটি প্রকাশনার বিভিন্ন স্তরে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন যা ছাড়া বইটির প্রকাশনা সম্ভব হতো না। আমি প্রফেসর মাহমুদুল হককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক পাঠদানের জন্য এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য, বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতার জন্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী চৌধুরী এবং মি. বকুল চন্দ্র চাকমাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে শিক্ষাছুটি প্রদান ও গবেষণা বৃত্তি প্রদানের জন্য আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এবং প্রো- উপাচার্য প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিনের নিকটও আমি ঋণী। কারণ তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে বইটি ছাপার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন দেশে বিদেশে যে সমস্ত গ্রন্থাগার আমি ব্যবহার করেছি তাদের গ্রন্থগারিক ও সর্ব স্তরের কর্মচারীদের আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতার জন্য। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই মি. এস.এম. আবু তাহের ,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থগারিককে। আমি বিশষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই মওলানা আজাদ কলেজ, কোলকাতার অবসর প্রাপ্ত উর্দু, আরবি ও ফার্সি ভাষার অধ্যাপক প্রফেসর আব্দুস সুবহানস্যারকে। প্রফেসর মো. ইকবাল হোসেন, বিভাগীয় প্রধান,ইংরেজি, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, এবং মি. মুফাখখারুল আনাম ,ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ঢাকাকে ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন সময়ে তাদের সহযোগিতার জন্য। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সহায়তার জন্য আমি পরিচালক, প্রেস ,জনাব সেকেন্দার আলমকে ধন্যবাদ জানাই। কম্পিউটারে টাইপ করে দেওয়া ছেলেটির জন্যও আমার স্নেহ ভালবাসা রইল।

আমার সহধর্মীণী মনোয়ারা বেগম (হীরা) এর অতুলনীয় ত্যাগ ও সার্বক্ষণিক উৎসাহ প্রদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ না করলে আমি আমার দায়িত্ব পালনে অ-কৃতজ্ঞই থেকে যাবো। আমার দুই সন্তন ডা. আব্দুস সালাম ,এমবিবিএস এবং স্থপতি ওয়ালী মুহাম্মদ, যারা তখন শিশু ছিল, তাদের আত্নত্যাগ না থাকলে আমি গবেষণা চালিয়ে যেতে পারতাম না। তারা দীর্ঘদিন আমার স্নেহ থেকে বঞ্ছিত থেকেও কোন অভিযোগ না করায় আমার ঋণ অপরিশোধ্য হয়ে রয়েছে। এই বইয়ের প্রচ্ছদ মুদ্রণ, সুচিলিখন ও ডিজাইন করেছে স্থপতি সন্তান ওয়ালী মুহাম্মদ। পরিশেষে বিভগীয় সকল নতুন ও পুরাতন সহকর্মীকে জানাই শুভেচ্ছা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
অক্টোবর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

আবদুস সাঈদ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের কথা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলেও অনেক আগে থেকেই আরব মুসলিম বণিকেরা বাংলার উপকূলবর্তী স্থানসমূহে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। এই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বাংলা প্রথমত মোগল ও পরে আফগান শাসনাধীনে আসে। মোগল শাসনকাল দীর্ঘ হলেও সূর আফগান শাসনকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ; সময়ের ব্যাপ্তিতে যা মাত্র ৩৮ বছরের (১৫৩৮–১৫৭৬) কিন্তু বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায়, বাংলায় বিকেন্দ্রিকৃত জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সূচনা এই সময়ে হয়েছিল। বাংলায় আফগান শাসনের কর্ণধার ছিলেন শেরশাহ। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আব্দুল করিম শেরশাহ সম্পর্কে বলেছেন "শেরশাহ একজন মহান শাসক, রাষ্ট্রনায়ক, অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রশাসক ছিলেন। তিনি এমন একটি পদ্ধতি নিমার্ণ করেছিলেন যা শুধু তাকেই জীবিত রাখেনি বরং মোগলদের জন্য একটি মডেলও ছিল। এর কোন কোনটি আজও চিহ্নিত করা যায়। তার গ্রান্ড ট্রাংক রোড এবং অনেক শেরপুর ও শেরগড় আজও টিকে আছে। তার 'সরাই' বর্তমান শতাব্দীতেও একটি বহুল আলোচিত শব্দ।"

পিতৃতুল্য অগ্রজ অধ্যাপক আব্দুস সাঈদ তার 'দি হিস্ট্রি অব দি আফগান রুল ইন বেঙ্গল, ১৫৩৮-১৫৭৬' গবেষণা গ্রন্থে বাংলা আফগান শাসনাধীনে আসার গোড়ার কথা এবং ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও ছোট-বড় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কীভাবে শেরশাহ বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তার ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তার প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, জনকল্যানমূলক কার্যক্রম, কার্যকর বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায়ে নতুন ফর্মূলা এবং ভূমি পরিমাপ ইত্যাদি সব দিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এর পূর্বে বাংলায় আফগান শাসন সম্পর্কে পৃথক কোন গবেষণা গ্রন্থ না থাকায় এটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলা একাডেমি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য তা সুফল বয়ে আনবে। বিষয় হিসেবে ইতিহাস বাংলাদেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। অনূদিত গ্রন্থটি তাদেরও কাজে আসবে বলে আশা করি।

অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে কঠিন, কারণ এতে মূল লেখকের চিন্তা চেতনার সবদিক বজায় রাখা যায় না। কোনো গবেষণা গ্রন্থের অনুবাদ হিসেবে এটাই আমার প্রথম প্রয়াস। এই কাজে আমাকে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থাকারের ইচ্ছাকে অনুমোদন

~ www.amarboi.com ~

করায় আমার শিক্ষাগুরু প্রফেসর এমিরিটাস ড. আনিসুজ্জামান স্যার এর নিকট ঋণী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা কালে তিনিই আমাকে গবেষণা ও অনুবাদ কাজে দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের একটি সরকারি কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে ভিন্ন মানসিক পরিবেশে এতবড় গুরুদায়িত্ব পালনে সর্বদা শঙ্কিত ছিলাম, কিন্তু বড় ভাইয়ের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও আনিসুজ্জামান স্যারের আশীর্বাদ ছিল সবসময়। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটির দায়ভাগ একান্ত আমারই।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। তিনি গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতানকে অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব প্রদান করায় কাজটি গতিশীল হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ড. সুলতান যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তাতে শুধু এটুকুই বলবো যে, তিনি সর্বোতভাবে সহযোগিতা না করলে গ্রন্থটির প্রকাশনা আরো বিলম্বিত হতে পারতো। একাজের সাথে সংশ্লিষ্ট একাডেমির সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

মা মেহেরুন্নেছা ও বাবা ডা. শেখ তাজের হোসেনকে স্মরণ করছি তাদের অদৃশ্য আশীর্বাদের জন্য। বড় ভাবী মিসেস মনোয়ারা সাঈদ মাতৃস্নেহে লালন না করলে হয়তো আজ এতদূর আসা সম্ভব হতো না। স্ত্রী অধ্যাপিকা নুর আসমা ও কন্যা ইফফাত আরা নুর আমাকে এ কাজে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। তাদের সবার কাছেই আমি ঋণী।

সবশেষে হলেও গুরুত্বে অপরিসীম শিক্ষার্থী ও পাঠক যদি কাজটিকে গ্রহণ করে উপকৃত হন তবেই এ পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

মো. ইকবাল হোসেন
অধ্যক্ষ
আমলা সরকারি কলেজ
কুষ্টিয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংক্ষেপকরণ

সারওয়ানী	আব্বাস সারওয়ানী; তারিখ-ই- শেরশাহী এস.এম. ইমামুদ্দিন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঢাকা ১৯৬৪, খণ্ড-১ ফার্সি মূল পাঠ, খণ্ড-২, ইংরেজি অনুবাদ
আকবরনামা	আবুল ফজল এর আকবরনামা; এইচ বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজ, কলি-১৯০২, পুনর্মুদ্রণ-দিল্লি ১৯৭৩
ক্যাম্পোস	জে জে এ, ক্যাম্পোস দি হিস্ট্রি অব দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল; পুনর্মুদ্রণ, পাটনা ১৯৭৯
দাউদী	আব্দুল্লাহ; তারিখে দাউদী; শেইখ আব্দুর রশিদ কর্তৃক সম্পাদিত; আলীগড় ১৯৫৪
ডর্ন	বার্নাড ডর্ন দি হিস্ট্রি অব দি আফগান; সুশীল গুপ্ত প্রকাশনা, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি ১৯৬৫
এইচ বি ২	যদুনাথ সরকার সম্পাদিত হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এর ২য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৪৮; পুনর্মুদ্রণ ১৯৭২
ইনস্ক্রীপশনস	শামসুদ্দিন আহমদ ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড, রাজশাহী ১৯৬০
জে.এ.এস.বি	জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতা
জে.এ.এস.পি	জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা
জে.এ.এস.বিডি	জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা
রহিম	এম. এ. রহিম দি হিস্ট্রি অব দি আফগানস ইন ইন্ডিয়া (১৫৪৫-১৬৩১) করাচি, ১৯৬১
নিমাত আল্লা	খাজা নিমাত আল্লা তারিখ-ই-খান জাহানী ওয়া মাখজানে আফগানী; সম্পাদনায় এস.এম.ইমামুদ্দিন, ঢাকা ১৯৬৯, ১ম ও ২য় খণ্ড ফার্সি মূল পাঠ
এন.বি.রায়	নীরোদ ভূষণ রায় : দি সাকসেসরস অব শেরশাহ; ঢাকা ১৯৩৪।
কানুনগো	কে. আর. কানুনগো শেরশাহ এন্ড হিজ টাইমস, কলিকাতা ১৯৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রিয়াদ	গোলাম হোসাইন সেলিম; রিয়াদ আল সালাতিন; আব্দুস সালাম কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ এবং নোটযুক্ত, কলি-১৯০২; পুনর্মুদ্রণ দিল্লি ১৯৭৫
করিম	সুলতানী আমল আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, ঢাকা ১৯৭৭
তরফদার	মমতাজুর রহমান তরফদার : হুসেইন শাহী বেঙ্গল, ঢাকা ১৯৬৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা ১৯-৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়
আফগান বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা ৩৩-৫০

তৃতীয় অধ্যায়
শের খান সূরের বঙ্গ বিজয় ৫১-৭৮

চতুর্থ অধ্যায়
শেরশাহ সূরের বংশধর ৭৯-৯৭

পঞ্চম অধ্যায়
শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজীর বংশ ৯৮-১১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
কররানী বংশ ১১৬-১৪৭

সপ্তম অধ্যায়
বাংলায় আফগান প্রশাসন ১৪৮-১৬৭

অষ্টম অধ্যায়
আফগান শাসনকালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু চিত্র ১৬৮-১৮৫

নবম অধ্যায়
উপসংহার ১৮৬-১৯০

গ্রন্থপঞ্জি ১৯১-২০৬

পরিশিষ্ট-এক
ফরিদ এর শের খান উপাধির ঐতিহাসিক তথ্য ২০৭-২১২

পরিশিষ্ট-দুই
শের খান সূরের অভিষেক ২১৩-২২১

পারিভাষিক শব্দকোষ ২২২-২২৭

নির্ঘণ্ট ২২৯-২৪০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাস সময়ের রেখায় সুনির্দিষ্ট। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহের গৌড় বিজয়ের সময় থেকে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মোগল সৈন্যদের কাছে দাউদ খান কররানীর পতনের সময় পর্যন্ত ৩৭ বছর বাংলায় আফগান শাসনকাল হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু শেরশাহের গৌড় বিজয়ের পূর্বেও বাংলায় আফগানদের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে তাদের আগমনের কারণ ছিল দুটো এক. বাংলার সুলতানদের ভাড়াটিয়া সৈনিক হিসেবে কাজ করা; আর দুই. ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত থেকে শান্তিপূর্ণ বসতি স্থাপন করা। তবে সবারই লক্ষ্য ছিল সমৃদ্ধ জীবিকার সন্ধান ও প্রাপ্তি। বাংলায় আফগানদের আগমন বা উপস্থিতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ সালে রচিত কবি বিপ্রদাস পিপলাই এর বই মনসা বিজয়ে।[১] সপ্তগ্রামের[২] মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি সৈয়দ, মোল্লা, কাজী, মখদুম, মোঙ্গল (মোগল) এবং পাঠান এর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] মোঁঙ্গল ও পাঠান জাতিগোষ্ঠীর প্রতিশব্দ হিসেবে এবং সৈয়দ, মোল্লা ও কাজী পেশা ও পারিবারিক পরিচয় নির্দেশ করে।

ইতিহাসবিদ ড. আব্দুল করিম এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন যে পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে মোঙ্গল এবং পাঠানরা এত ব্যাপক সংখ্যায় বাংলাদেশে ছিল কিনা যা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে একজন হিন্দু কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তার মতে,

> এটা ঠিক যে মোঙ্গলরা (মোগলরা) এই উপমহাদেশে মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে অপরিচিত ছিল না কারণ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আগ্রাসন বিষয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক বিবরণীতে তাদের কথার উল্লেখ আছে। তারা দিল্লিতেও বসবাস করতো বলে কথিত আছে। কিন্তু অন্য কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, যা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, শান্তিকামী মোঙ্গলেরা পূর্ব ভারতের সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) পর্যন্ত এসেছিল বিশেষত এত ব্যাপক সংখ্যায় বিপ্রদাসের কবিতায় উল্লেখ করার মতো। এমন কি পাঠান শব্দের ব্যবহার এই তথ্যের উপর সন্দেহের রেখাপাত করে।[৪]

কিন্তু আফগানদের পক্ষে বাংলায় আগমন অসম্ভব ছিল না; কারণ ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের শুরু থেকেই মুসলমান আক্রমণকারীদের অধীনে আফগান সৈন্যদের (পাঠান হিসেবে বিশেষ পরিচিত) বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।[৫] উত্তর ভারতে তাদের আগমন হয়ে থাকলে পূর্ব ভারতের সুদূর বাংলা পর্যন্ত তাদের আগমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব না কারণ বাংলার উর্বর প্রকৃতি তাদের অবশ্যই আকৃষ্ট করে থাকবে। আর তাদের দীর্ঘ সুঠাম দেহের কারণে তাদের উপস্থিতি ও দেশের মানুষের কাছে সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। যেহেতু কবি বিপ্রদাস তাদের নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, সুতরাং বলা যেতে পারে যে তিনি তাদের দেখেছেন। এছাড়াও, মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখায় অন্তত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সময় থেকে বাংলায় আফগানদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। সুলতান আলাউদ্দিনের প্রশাসনিক পুনর্গঠন সম্পর্কে গোলাম হুসেইন সেলিম লিখেছেন,

> যেহেতু তিনি নিজে উচ্চ বংশজাত ছিলেন বলে শ্রুতি আছে, তাই তিনি সৈয়দ, মোগল এবং আফগানদের পাশে পাশে রাখতেন আর তার দক্ষ জেলা কর্মকর্তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন।[৬]

যাই হোক, বাংলায় আফগানদের উপস্থিতির প্রসঙ্গটি ছাড়াও আমরা জানি যে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সূরদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় আফগান শাসনের শুরু হয়। বাংলায় ৩৮ বছর আফগান শাসনকালে ১৫৩৮ সাল থেকে ১৫৫৩ সাল পর্যন্ত শেরশাহ সূর, ১৫৫৩ সাল থেকে ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজী এবং ১৫৬৪ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত কররানী রাজবংশের শাসন বিদ্যমান ছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা রোহ ছিল আফগানদের প্রাচীন আবাসস্থল।[৭] রোহ পশতু শব্দ যার অর্থ পাহাড়। রোহ ভূখণ্ডটি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সোয়াত এবং বাজাউর থেকে সিন্ধু প্রদেশের বুক্কুর জেলা হয়ে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত।[৮] এই পার্বত্য এলাকা থেকে আফগানরা ভারতের সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের পূর্বেকার মুসলিম বিজেতাদের আগমনের ধারাবাহিকতায় তারা এ উপমহাদেশে আগমন করতে থাকে।[৯] আফগানরা পাঠান নামেও পরিচিত। আফগান ঐতিহাসিক নিমাত আল্লা দাবি করেন যে পাঠান শব্দটি আফগান বংশোদ্ভূত জনৈক আবদ আল রশীদ কায়েস নামক এক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ মহৎকাজের জন্য মহানবী (দ.) কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি বিশেষ। যেহেতু আফগানরা আবদ আল রশীদ কায়েস এর উত্তরসূরী তাই তাদেরও পাঠান বলা হয়।[১০]

মুসলমানদের নিকট স্বজাতিকে মহান বংশোদ্ভূত হিসেবে পরিচিত করতে ঐতিহাসিক নিমাত আল্লার এ এক অদ্ভূত কল্পকাহিনি। আবুল কাশিম ফিরিশতার তথ্য মতে পাটনায় নিবাসী আফগানদের পাঠান বলা হতো।[১১] পার্কি সাইকিস-এর মতে পাঠান ভাষাগত শব্দ (linguistic word) যার অর্থ পশতু ভাষার বক্তা।[১২] সাইকিস এর বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কারণ পশতু শব্দের বহুবচন পাশতুন বা পাখতুন থেকে পাঠান শব্দের উৎপত্তি।[১৩] তাই আফগান একটি জাতিগত এবং পাঠান ভাষাগত শব্দ। সব আফগান পশতু ভাষায় কথা বলে, সুতরাং তারা সবাই পাঠান। কিন্তু সব পাঠান আফগান নাও হতে পারে, কারণ পশতু ভাষায় কথা বললেও রোহ এলাকার বাইরের মানুষেরা আফগান হতে পারে না।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদিও বাংলায় আফগান শাসকদের সার্বভৌমত্বের সময়কালটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তারা এদেশের ইতিহাসে একটা দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে গেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে আফগান শাসনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক রহিম লিখেছেন :

> ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে আফগানদের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আফগানরা তাদের পূর্বসূরী তুর্কিদের চেয়ে এবং উত্তরসূরী মোগলদের চেয়ে অনন্য। তারা এদেশের মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নতুন নতুন উপাদান যোগ করেছেন। ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে সূর আফগান শাসকেরা অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। অন্যান্য বিজিত জাতিরা যেমন তাদের স্বকীয় পরিচয় হারিয়ে ফেলে, আফগানরা তেমনটি করেনি। সমগ্র মোগল শাসনকালে এদেশে তারা আত্মপরিচয় ধরে রেখেছে এবং এজন্যই মোগলদের নিকট রাজ্য হারানোর পরও রাজনৈতিক জনসমষ্টি হিসেবে তাদের একটা ইতিহাস রয়েছে। বস্তুত ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি শাসক হিসেবে এবং মোগলদের নিকট পরাজিত শক্তি হিসেবে এদেশের জনজীবনে আফগানদের ভূমিকা বিশ্লেষিত না হয়।[১৪]

রহিমের এই পর্যালোচনা বাংলায় আফগান শাসনের যথার্থ মূল্যায়ন কিন্তু তার দাবি অনুযায়ী বাংলায় আফগান শাসনকাল ঐতিহাসিকদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। আমার এ গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত দিল্লির রাজকীয় আফগান শাসকদের প্রতিই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ ছিল। যদিও আফগান শাসনকালের এক বড় অংশ জুড়েই বাংলা স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তথাপিও এ যাবৎ লিখিত ইতিহাসের ধারণাগত কাঠামোয় ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহের একটি হিসেবে বাংলার ইতিহাসে আফগান শাসনকাল যথাযথ সুবিচার পায়নি।

১৮১৩ সালে রচিত চার্লস স্টুয়ার্টের বই 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' বাংলা সম্পর্কে প্রথম আধুনিক ইতিহাস গ্রন্থ। বইটি বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি অগ্রবর্তী কাজ হলেও এতে বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষণীয়।

বর্তমানে প্রাপ্ত সেই সময়ের বেশ কয়েকটি মূল ঐতিহাসিক উপকরণ লেখকের নিকট প্রাপ্য ছিল না। অবশ্য লেখকের একটা বড় সুবিধা ছিল যে তিনি পর্তুগিজ উপকরণসমূহকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত উপকরণের উপরেই তার কাজটি নির্ভরশীল ছিল বিধায় তার কাজের সীমাবদ্ধতা ছিল। দ্য ব্যারোস এবং কাস্টেলহেডার এর মত পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের উপকরণে সমৃদ্ধ ও ১৯১৯ সালে প্রকাশিত জে. জে. এ. ক্যাম্পোস এর লেখা 'দ্য হিস্ট্রি অব দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল' বইটি তার কাছে সহজলভ্য ছিল না। তবে আরও অনেক পরে লেখা গোলাম হোসেইন সেলিমের লেখা বই 'রিয়াজ-উস সালাতিন' স্টুয়ার্টের অন্যতম উপকরণ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত The History of Bengal ২য় খণ্ড গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। প্রাপ্ত সকল সূত্রকে ব্যবহার করে আফগান ইতিহাস লেখার এটাই প্রথম প্রয়াস। কিন্তু আলোচনার ব্যাপ্তিটা বেশ সংক্ষিপ্ত। বইটিতে বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচিত হয়েছে কিন্তু আফগান শাসনকালের উপর রয়েছে মাত্র দুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাজকীয় আফগান শাসনের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে পূর্ববর্তী আফগান সুলতানদের কাহিনি। অধ্যায় দুটির সমষ্টি মাত্র বিশ পৃষ্ঠা। ফলশ্রুতিতে আলোচনাটি কেবল রাজকীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

সীমিত গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কালিকা রঞ্জন কানুনগোর বই 'শেরশাহ' এর কথা। এটা মূলত ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে বইটি পুনঃমুল্যায়িত ও বর্ধিত কলেবরে Shershah And His Times নামে প্রকাশ করেন। শেরশাহের জীবন ও সাফল্য এবং তার গৌড় বিজয়ের উপর বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বিহার থেকে গৌড়ে সেনাবাহিনীর যাতায়াতের যে বিস্তারিত তথ্যচিত্র বইটিতে পাওয়া যায় তা বছরের পর বছর ইতিহাস গবেষকদের জন্য পথনির্দেশিকা হয়ে থাকবে। গবেষণার বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতার কারণে শেরশাহের শাসনকালের পরবর্তী সময় নিয়ে তিনি তেমন কিছু আলোচনা করেননি।

প্রায় আঠারো পৃষ্ঠাব্যাপী পৃথক একটি অধ্যায়ে বাংলায় শেরশাহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। কিন্তু বিজ্ঞ লেখক শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসেই তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়টি তার আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বইটি উল্লেখযোগ্য এবং আমার গবেষণার ক্ষেত্রে বইটি বেশ ব্যবহার করা হয়েছে।

নীরোদ ভূষণ রায় আফগানদের ইতিহাস রচনায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার Successors of Sher Shah[১৫] বইটি আফগানদের বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার এক মূল্যবান সংযোজন। কিন্তু এই বইটিও বাংলায় আফগান শাসনকাল সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোকপাত করতে পারেনি। এম. এ. রহিমের লেখা The History of the Afghans in India[১৬] বইটিও আফগান শাসকদের রাজকীয় কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত। বইটির মুখবন্ধে তিনি পূর্ব ভারতে আফগান শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রস্তাবনা করেছেন। তিনিও বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাসের প্রতি ন্যায়বিচার করেননি, কারণ যে দীর্ঘ সময়কালকে তিনি তার বইয়ের আলোচনায় এনেছেন তা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। এম.এ. রহিম আফগানদের শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চা করেছেন, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এম. আর. তরফদার এর 'হুসেন শাহী বেঙ্গল'[১৭] বইটির কথাও উল্লেখ করা যায়। যদিও বইটিতে আফগান শাসনকালের আলোচনা নেই, কিন্তু হুসেন শাহী শাসনকালের সমাপ্তির আলোচনায় শেরশাহের গৌড় বিজয়ের কথা লেখককে বলতে হয়েছে। এই আলোচনাটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত এবং আধুনিক গবেষকদের জন্য যথেষ্ট সহায়ক।

বাংলা ভাষায় লেখা ড. আবদুল করিমের 'বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল'[১৮] গ্রন্থটি বাংলায় মুসলিম শাসনকালের শুরু থেকে ১৫৭৬ সালে কররানী আফগানদের পতন পর্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনায় সমৃদ্ধ। চৌত্রিশ পৃষ্ঠার একটি পৃথক অধ্যায়ে গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে বাংলায় আফগান শাসনকালের আলোচনা রয়েছে। প্রাসঙ্গিক অধ্যায়টি প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যে সমৃদ্ধ। এছাড়া মুদ্রালিপি, শিলালিপি এবং স্থানীয় বাংলা, ফার্সি ও আরবি ভাষায় লিখিত সমসাময়িক সাহিত্য সূত্রগুলোসহ তার নিজের গবেষণা বইটিকে তথ্যগুণে সমৃদ্ধ করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইতিহাস পত্রিকায়' লেখকের চট্টগ্রামে ইসলাম'[১৯] শীর্ষক প্রবন্ধটিতে চট্টগ্রামে আফগানদের সম্পর্কে উল্লেখ আছে। লেখাটি আমার গবেষণার জন্য একটি বড় সূত্র যা থেকে আমি উপকৃত হয়েছি।

সুতরাং বলা যায়, বাংলায় আফগান শাসনের উপর একটি বিস্তৃত গবেষণা যথার্থ না মনে করার কোনো কারণ নেই। এখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আফগান শাসনকালের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের সংযোগ স্থাপন। লক্ষ্যণীয় যে পূর্ববর্তী গবেষকেরা গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রকৃতির কারণে এই শাসনকালের বিস্তৃত আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থেকেছেন। তাই আমার বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বাংলায় আফগান শাসনের বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাবনা করা হয়েছে। তবুও গবেষণাটি আফগানদের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের সময়কালের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে কারণ ঐ সময়কালেই আফগানরা বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও মানের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন ও দেশের ভাগ্য নির্দেশিত করেছেন। বাংলার রাজনীতিতে আধা-স্বাধীন গোষ্ঠী হিসেবে তাদের কার্যক্রমকে গবেষণার আওতায় আনা হয়নি।

এ ধরনের গবেষণার জন্য উৎসগুলো প্রাথমিকভাবে যতটা সীমিত ধারণা করা হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে ততটা সীমিত নয়। এই সূত্রগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। আফগান ইতিহাস, প্রাদেশিক ইতিহাস, বিদেশি গবেষণা সূত্রসমূহ, স্থাপত্য সূত্রসমূহ এবং মুদ্রা ও শিলালিপি। গুরুত্বপূর্ণ আফগান ইতিহাস গ্রন্থসমূহ হচ্ছে

১. তারিখে দাউদী[২০] হিজরি ৯৮৩/১৫৭৫-৭৬ খ্রি. আব্দ আল্লা কর্তৃক রচিত। বইটি বাংলার সুলতান দাউদ শাহ কররানীকে উৎসর্গিকৃত।

২. তারিখে শেরশাহী[২১] হিজরি ৯৮৭/১৫৭৯ খ্রি. এর অব্যবহিত পরেই আব্বাস খান শেরওয়ানী কর্তৃক রচিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩. ওয়াকিয়াতে মুশতাকী[২২] হিজরি ৯৮৯/১৫৮১ খ্রি. আব্দ আল্লা মুশতাকী ওরফে রিজক আল্লা মুশতাকী কর্তৃক রচিত।

৪. তারিখ-ই-শাহী বা তারিখ-ই-সালাতিন-ই আফগান[২৩] হিজরি ৯৮০/১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি. এর মধ্যে আহমদ ইয়াদগার কর্তৃক রচিত।

৫. তারিখ-ই-খান জাহানী ওয়া মাখজান-ই-আফগানী[২৪] হিজরি ১০২১/১৬১২-১৬১৩ খ্রি. এ খাজা হাবীব আল্লার পুত্র খাজা নিমাত আল্লা কর্তৃক রচিত।

সুলতান বাহালুল লোদী থেকে দাউদ কররানী পর্যন্ত ভারতবর্ষে আফগান শাসনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ হচ্ছে তারিখে দাউদী। গ্রন্থটি সম্রাট আকবরের শাসনকালে আব্দ আল্লা কর্তৃক রচিত। বইটিতে ঘটনার পরম্পরা সুবিন্যস্ত নয় কারণ ঘটনার বর্ণনা অধিকাংশ সময়েই ফার্সি ও হিন্দি ভাষার বিভিন্ন কবিতা ও গল্প দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এমন কিছু তথ্য সন্নিবেশিত আছে যা অন্য কোনো গ্রন্থে সহজলভ্য নয়। বইটিতে সূর আফগান শাসনকালের একটি বিশদ বিবরণ আছে আর বিশেষত ইসলাম শাহ সূর এর উত্তরাধিকারীদের ইতিহাসের জন্য বইটি মূল্যবান।

তারিখ-ই-শেরশাহী (তোহফায়ে আকবর শাহী নামেও পরিচিত) এর লেখক আব্বাস খান সারওয়ানী আফগান ঐতিহাসিকদের অগ্রদূত। তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে ওয়াকিয়া নবীশ বা দলিল লেখক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জানা যায় সম্রাটের নির্দেশেই তিনি ইতিহাস সংকলন করেন। তার সংকলনটি শুরু হয়েছে বাহালুল লোদীর শাসনকাল থেকে এবং শেষ হয়েছে শেরশাহের কাল পর্যন্ত। বইটি হিজরি ৯৮৭/১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত। শেরশাহের সাথে সারওয়ানীর পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। যে সব আফগানদের পিতা পিতামহরা বাংলায় বসবাস করেছেন অথবা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিদের সাথেও সারওয়ানীর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল[২৫]। তাই শেরশাহ এবং তার উত্তরাধিকারীদের বিষয়ে সারওয়ানীর প্রাথমিক ধারণা ছিল। অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক হিসেবে তিনি শেরশাহকে কৃতিত্ব প্রদান করে আদর্শায়িত করেছেন। এসব কারণে সারওয়ানী তার মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। গবেষণার জন্য বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী উৎস।

লোদী এবং সূর বংশের বিচ্ছিন্ন বিবরণ এবং মজাদার কাহিনির সংকলন হচ্ছে আব্দ আল্লা মুশতাকীর ওয়াকিয়াতে মুশতাকী। ইতিহাসসম্মত না হলেও বইটিতে এমন প্রচুর উপাদান আছে যা সমসাময়িক গণমানুষের জীবন ও আচার আচরণের উপর আলোকপাত করে এবং তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরে।

আহমদ ইয়াদগার এর তারিখ-ই-শেরশাহী সুলতান বহুলুল লোদী থেকে দাউদ শাহ কররানী পর্যন্ত আর একটি পূর্ণাঙ্গ আফগান ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটি নিজাম আল দীন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বখশীর লেখা তবাকাত-ই-আকবরীর তথ্যসমূহকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে। বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ শাহ কররানীর ঘটনাপঞ্জি (chronology) অনুসরণে বইটি লেখা হয়েছে মর্মে লেখক দাবি করলেও বইটিতে উল্লেখিত তারিখসমূহ এবং ঘটনাক্রম যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় না।

আব্বাস খান সারওয়ানীর তারিখ-ই-শেরশাহীর পরে গুরুত্বপূর্ণ আফগান ইতিহাস সূত্র হচ্ছে খাজা নিমাত আল্লার 'তারিখ ই খানজাহানী ওয়া মাখজান ই আফগানী'। এই বইটিতেও সুলতান বাহালুল লোদী থেকে খাজা উসমান (হিজরি ১০২১/১৬১২-১৬১৩ খ্রি.) এর মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাসকে ধারণ করা হয়েছে। খাজা উসমানের মৃত্যুর পরেই বাংলায় আফগানরা তাদের সর্বময় শাসনক্ষমতা হারিয়েছিলেন। বইটি দাক্ষিণাত্যে হিজরি ১০২১/১৬১২-১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এবং খান জাহান লোদীকে উৎসর্গীকৃত। উল্লেখ্য, খান জাহান লোদীর অধীনে নিমাত আল্লা একজন গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ সকল ঐতিহাসিক সূত্র ছাড়াও শেখ ইসমাইল হাজিয়ার পুত্র মহম্মদ কবীর এর 'আফসানা এ সাহান'[২৬] গ্রন্থটি লোদী ও সূর বংশের আফগান সুলতানদের ১৪০টি মজার কাহিনির সংকলন যাতে তৎকালীন গণমানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মোগল ইতিহাস সূত্র হিসেবে নীচের গ্রন্থগুলোও উল্লেখযোগ্য।

১. আইন ই আকবরী : আবুল ফজল কর্তৃক হি: ১০০৬/১৫৯৭-৯৮ সালে রচিত।
২. আকবরনামা আবুল ফজল কর্তৃক হি: ১০১০/১৬০১-০২ সালে রচিত।
৩. তবাকাত ই আকবরী নিজাম আল দীন আহমদ বখশী কর্তৃক হি: ১০০৩/১৫৯৫ সালে সংকলিত।
৪. মুনতাখাব আল তাওয়ারিখ মোল্লা আব্দ আল কাদির বাদাউনী কর্তৃক হি: ১০০৪/১৫৯৫-৯৬ সালে রচিত।
৫. তারিখ ই ফিরিশতা বা গুলশান ই ইব্রাহিমী মহম্মদ কাশিম গোলাম হিন্দু শাহ আশতাকাবাদী কর্তৃক হি: ১০১৫/১৬০৬-০৭ সালে রচিত।

নিজাম আল দীন আহমদ বখশী সংকলিত তবাকাত ই আকবরী ভারতবর্ষের মুসলিম সুলতানদের বিষয়ে লেখা একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। লেখক আফগানদের বিষয়ে কোনো প্রকার সংস্কার প্রদর্শন করেননি। বইটিতে উল্লেখিত তারিখসমূহ সাধারণভাবে যথার্থ।

আফগান রাজা ও সুলতানদের সম্পর্কে বিবরণসমূহ সংক্ষিপ্ত হলেও শেরশাহ সম্পর্কে বিবরণটি বেশ বিস্তৃত। সমসাময়িক প্রায় সব ঐতিহাসিকই এই বইটি থেকে কমবেশি সহযোগিতা নিয়েছেন। সুতরাং বলা যায় 'তবাকাত ই আকবরী' আফগান শাসনকালের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক সূত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোল্লা আব্দ আল কাদির বাদাউনীর লেখা 'মুন্তাখাব আল তাওয়ারিখ'[২৮] ভারতবর্ষে মুসলিম সুলতানদের বিষয়ে লেখা এক সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। তিনিও বাংলায় আফগান শাসনকাল এবং ইসলাম শাহ ও তার উত্তরসূরীদের প্রশাসন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। এই রইটিও প্রয়োজনীয় ইতিহাস সূত্র হিসেবে বিবেচিত।

আবুল ফজলের 'আকবরনামা'[২৯] ভারতের পূর্বাংশে আফগানদের বিষয়ে তথ্য ও উপকরণে পরিপূর্ণ। কিন্তু লেখক আফগানদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি সূর আফগানদের বিধৃত কাহিনি উপস্থাপন করেছেন মাত্র। তথাপিও বইটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র। আফগানদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর পর্যাপ্ত উপকরণ রয়েছে 'আইন ই আকবরী' গ্রন্থে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি তৎকালীন ভারতের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক তথ্যের অগাধ ভাণ্ডার। বইটিতে লিপিবদ্ধ বাংলার সুলতানদের তালিকাটি যথার্থ না হলেও এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণগুলো খুবই গুরুত্ব বহন করে। বাংলার রাজস্ব সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে সমৃদ্ধ অধ্যয়টিও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রায় আধুনিক গেজেটের মতো একটা বই। বইটি বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের নাম এবং বিভিন্ন রাজস্ব বিভাগের নাম সরবরাহ করেছে। এই তথ্যগুলো আফগান শাসনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। গুণে ও মানে 'আইন ই আকবরী' মূল্যবান একটি ইতিহাস সূত্র।

এগুলো ছাড়াও আফগানদের সম্পর্কে আরও কিছু মূল্যবান সমসাময়িক লেখা রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাবরনামা[৩০] জহির আল দীন মহম্মদ বাবর নিজেই গ্রন্থটির রচয়িতা। হুমায়ুননামা[৩১]: হুমায়ুনের সাথে বাংলায় আগমনকারী বাবরের কন্যা গুলবাদান বেগম এর রচয়িতা। তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত[৩২] হুমায়ুনের কলসি বাহক (ewer bearer) জওহর আফতাবচি এর রচয়িতা। হুমায়ুননামা[৩৩] খান ই খানান মুনিম খানের সাথে আফগানদের বিরুদ্ধে বাংলা অভিযানে আগমনকারী বায়েজিদ বিয়াত এর রচয়িতা।

উল্লেখিত বই সমূহের মধ্যে শেষ তিনটি বই তৎকালীন বাংলা এবং আফগানদের সম্পর্কে প্রাথমিক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্বলিত। রাজনৈতিক দৃশ্যপটের নায়ক এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কারণে জওহর আফতাবচীর 'তাজকিরাতুল ওয়াকিয়া' এবং বায়েজিদ এর 'হুমায়ুননামা' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই বইগুলো সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানে লেখকদের সুযোগ করে দিয়েছে। মোল্লা মহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ ফিরিশতার 'গুলশানে ইব্রাহিমী'[৩৪] (তারিখ ই ফিরিশতা নামে সমধিক পরিচিত) বইটিতে আফগান ইতিহাসের মৌলিক উপাদান খুব সামান্যই পাওয়া যায়। লোদী বংশ এবং শুরীদের সম্পর্কে তার বিবরণ নিজাম আল দীন বখশীর বিবরণের সাথে মিলে যায়। ভারতের পূর্বাংশে আফগানদের সম্পর্কে লেখা অংশটুকু শ্রুতি নির্ভর। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহের দরবারে হিজরি ১০২১/১৬১২ সালে তিনি বইটি লিখেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬০৭ সালে লিখিত তাহির মহম্মদের 'রওদাত-আল-তাহিরীন'[৩৫] একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। বাংলায় আফগানদের বিষয়ে লেখা অংশটুকু গবেষণার জন্য উপযোগী। ১৭৮৮ সালের পূর্বে ফার্সি ভাষায় লেখা বাংলার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। অযোধ্যার জায়েদপুরের অধিবাসী মুন্সি গোলাম হোসেন সেলিম বাংলায় দেশান্তরী হয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং ডাক বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। তার পৃষ্ঠপোষক জর্জ উডনের নির্দেশনা মতে তিনিই প্রথম ফার্সি ভাষায় কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি (chronicles) সংকলন করেন।

> তিনি হিজরি ১২০৫/১৭৮৬ সালে 'রিয়াদ আল সালাতীন'[৩৬] নামে বাংলার ইতিহাস লেখা শুরু করেন। দুই বছর ধরে তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক গবেষণাকর্মসমূহ, ভ্রমণ বিবরণী, প্রস্তর লিপি ইত্যাদি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন। ১৭৮৮ সালে 'রিয়াদ আল সালাতিন' লেখা শেষ হয়।[৩৭]

মুন্সি গোলাম হোসেন সেলিম ফার্সি ভাষার জীবনীকারদের (chroniclers) রচনাশৈলীতে ফার্সি ভাষায় প্রথমবারের মতো বাংলার ইতিহাস উপস্থাপন করেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সময় থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে তার নিজের কাল পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসকদের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস হিসেবে বইটি তাৎপর্যপূর্ণ। ফার্সি ভাষায় লেখা ভারতের বেশ কিছু মানসম্পন্ন ইতিহাস গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের ধারণা না থাকায় বইটির বিবরণীতে এবং উল্লেখিত তারিখ সমূহে যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। আব্দুস সালাম বইটি অনুবাদ ও টীকা সংযোজন করেছেন। টীকাসমূহ সত্যিই অপূর্ব এবং এ কাজটিই সালামকে বাংলার ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ধারার ঐতিহাসিক হিসেবে পরিগণিত করেছে।

আর একটি গ্রন্থ হচ্ছে মুন্সি ইলাহী বক্সের 'খুরশীদ ই জাহানুমা'[৩৮]। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা গ্রন্থ হলেও এটি এখনও অপ্রকাশিত। শুধু চার্লস বেভারেজ-এর কিছু অংশ অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। আব্দ আল রাহমানের 'গঞ্জ ই রাজ'[৩৯] ফার্সি ভাষায় লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ যেখানে 'তাসাউফ' সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সুলতান বাহাদুর শাহ গাজীর শাসনকালে হিজরি ৯৬৬/১৫৫৯ সালে বইটি চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদে রচিত হয়।

ত্রিপুরা এবং আরাকান রাজাদের শক্তিবৃদ্ধির সমসাময়িক কালই ছিল বাংলায় আফগান শাসনকাল। তখন ত্রিপুরার সিংহাসনে ছিলেন রাজা বিজয়মানিক্য আর আরাকান রাজা ছিলেন মিন বিন। উভয় রাজারই তখন ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্ব এবং পূর্ব বাংলা বিশেষত চট্টগ্রামের প্রতি তাদের বিশেষ লোভনীয় দৃষ্টি ছিল। তাই ত্রিপুরা ও আরাকান রাজাদ্বয়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রগুলোও বাংলায় আফগান শাসনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ত্রিপুরা রাজাদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজমালা'র[৪০] কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। এ.পি.ফাইরে ও জি.ই. হারভে[৪১] কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত আরাকানীয় ঐতিহ্যসমূহ যথেষ্ট সহায়ক সূত্র।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে পর্তুগিজেরা ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তারা এদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। সুলতান মাহমুদ শাহ এবং শের খান (পরবর্তীকালে শেরশাহ)-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্তুগিজেরা বাংলার সুলতানের পক্ষেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তারা শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রতিদানে সুলতান মাহমুদ শাহ বাংলায় তাদের শুল্ক আদায়ের অধিকার দেন এবং চট্টগ্রামে শুল্কভবন নির্মাণসহ বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে পর্তুগিজেরা আরাকান রাজার দোসরে পরিণত হয় এবং বাংলার স্থল ও জলসীমায় দস্যুতায় জড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক বাংলার ইতিহাস পুর্নগঠনে পর্তুগিজদের বিবরণী তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। The History of the Portuguese in Bengal[৪২] গ্রন্থে জে. জে. এ ক্যাম্পোস পর্তুগিজদের বিবরণ সংকলন করেন। এই সংকলনের সাথে যুক্ত মানচিত্রসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিই একমাত্র সমসাময়িক ভৌগোলিক ও টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র।

সমসাময়িক শিলালিপি এবং আফগান শাসকদের তৈরি বিপুল পরিমাণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিসমূহের প্রাপ্তিস্থান, মুদ্রায় খচিত শাসনকর্তা ও টাকশালের নাম তৎকালীন সুলতানদের শাসনকালের পরিধি নির্ধারণে, আফগান শক্তি সম্প্রসারণ চিহ্নিতকরণে এবং বাংলার নানা জায়গায় তাদের বসতি স্থাপনের পঞ্জি তৈরিতে সহায়ক।

শিলালিপিতে প্রাপ্ত মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উৎস; সুলতান, সূফি, আলেম ও অন্যান্য পণ্ডিতব্যক্তিদের নাম প্রমাণ করে যে মুসলিম সমাজ নির্মাণে কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অবদান রেখেছেন। একইভাবে মুদ্রা ও শিলালিপিতে বাংলার সুলতানদের উপাধি, ইসলামের খলিফাদের প্রতি তাদের মনোভাব, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের মোহ, তাদের পাণ্ডিত্য ও খিলাফতের প্রতি বিশেষ প্রবণতার স্বাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এ সমস্ত সূত্রগুলো যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিলালিপি এবং মুদ্রা লিখন অনেক আগে আবিষ্কৃত এবং পূর্বের ঐতিহাসিকেরা সেগুলোর ব্যবহারও করেছেন।[৪৩] কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কৃত কিছু মুদ্রা ও শিলালিপি, যা আগে ঐতিহাসিকদের সময়ে আবিষ্কৃত হয়নি, এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করছে। ফলে বাংলায় আফগানদের ইতিহাস নতুন করে লেখার চিন্তাভাবনার খোরাক যোগাচ্ছে। এমনকি ঐ আবিষ্কারগুলো পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের মূল ধরণারও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের কিছু শিলালিপি ও মুদ্রা হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১. চট্টগ্রাম ও ভাগলপুরে আবিষ্কৃত সুলতান গিয়াস আল দীন মাহমুদ শাহের দুটো শিলালিপি[৪৪]।

২. চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত সোলাইমান কররানীর একটি শিলালিপি[৪৫]।

৩. চট্টগ্রামে প্রাপ্ত সুলতান মুবারিজ শাহ এর আমলের মুদ্রা[৪৬]।

৪. আরাকান টাকশাল-এর নাম খচিত সুলতান গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ এর আরাকানী মুদ্রা[৪৭]।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য এই গবেষণায় যথার্থ উপকরণ যোগ করেছে। ১৫৫৩ সালে রচিত দৌলত উজির বাহরাম খান এর 'লাইলী মজনু'[৪৮] এবং ১৬৪৭ সালে মহম্মদ খানের 'মকতুল হুসেইন'[৪৯] খুব উপযোগী একটি সূত্র। বংশ বৃত্তান্তের উপর লেখকের আলোচনা মুসলিম শাসনকালে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে অনেক তথ্য সরবরাহ করে কারণ তাদের পূর্বসূরীরা ইলিয়াস শাহ, হুসেন শাহ ও আফগান শাসনকালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে সংযুক্ত ছিলেন।

উপরোল্লিখিত সূত্রসমূহের সাহায্যে এই গ্রন্থে বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাস রচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

টীকা ও সূত্রসমূহ

১. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৪০, খণ্ড-১ পৃ. ১০৫।

২. সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম বাংলার একটি প্রাচীন নদী বন্দরের নাম যা ভাগিরথী ও স্বরস্বতী নদীর মোহনায় অবস্থিত। সুলতানি আমলে এটা বড় বন্দর ছিল।পর্তুগীজরা এটাকে ছোট নদী বন্দর বলতো। স্বরস্বতী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাতগাঁও বন্দর হিসেবে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। এটা এখন ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার একটা ছোট গ্রাম। মধ্য যুগের মুসলিম আমলে এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক ছিল যার আয়তন প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সমান এবং এঁটাকে আরসাহ বলা হতো। দেখুন প্রসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিষ্ট্রি কনফারেন্স, করাচি ১৯৫৬; পৃ. ২৩৫ পাদটীকা ১;আরও দেখুন কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল, ঢাকা ১৯৬০ পৃ. ১৫৯

৩. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ১১৪

৪. করিমঃ সোসাল হিষ্ট্রি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, চট্টগ্রাম ১৯৮৫, পৃ. ১৯৪।

৫. রহিম :হিষ্ট্রি অব দি আফগানস ইন ইন্ডিয়া, করাচি ১৯৬১, পৃ. ১, ২

৬. রিয়াদ আল সালাতিন; ইংরেজি অনু:আব্দুস সালাম, কলি[illegible]২, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি ১৯৭৫, পৃ. ১৩২

৭. সারওয়ানীঃ তারিখ ই শেরশাহী সম্পাদনা ও অনু [illegible] [illegible]মুদ্দিন; ঢাকা ১৯৬৪, খণ্ড-১, পৃ. ৫, ৬। তারিখ ই ফিরিশতা, ইং অনুঃ আলেক[illegible]ডার [illegible]য় খণ্ড, পৃ. ১৫০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮. নিমাত আল্লা, তারিখ ই খানজাহানী ওয়া মাখজান ই আফগানি খণ্ড-১, পৃ. ১২৪-১২৫, কানুনগো : শেরশাহ এন্ড হিজ টাইমস, কলি: ১৯৬৫, পৃ. ১

৯. এলিয়ট এন্ড ডাউসন হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ঔন হিস্টোরিয়ানস, কলি: ২য় খণ্ড, ১৯৫৪, পৃ. ২, ৩২

১০. নিমাত আল্লা, খণ্ড ১, পৃ. ১০৭-১১২, ১১১ পৃষ্ঠার একটি ফারসি উদ্ধৃতি এবং তার ইংরেজি অনুবাদ "যখন খালেদ মহানবীর সামনে এলেন তিনি তাঁর নিকট আব্দ আল রশিদ এর ভোগান্তির বর্ণনা দিলেন। মহানবী তার সেবার কথা স্বীকার করে সর্বশক্তিমানের নিকট তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সংখ্যার জন্য প্রার্থনা করলেন।তিনি বলেন যে, জিবরাঈল তাকে জানিয়েছেন যে তারা পাঠান রুপি নৌকা বা জাহাজ তৈরির সময় একখণ্ড কাঠের মত হবে। এই হিসেবে তিনি আব্দ আল রশীদ কে পাঠান উপাধি দেন।

১১. আবুল কাশিম ফিরিশতা :তারিখ ই ফিরিশতা; উর্দ্দু সংস্করন, অনু: আব্দুল হাই, লাহোর ১৯৬২; খণ্ড ১ পৃ. ৮৭

১২. পার্সী সাইকিস, হিষ্ট্রি অব আফগানিস্তান, লন্ডন ১৯৪০, খণ্ড-১, পৃ. ৩

১৩. এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, হেইডেন, খণ্ড ১ পৃ. ১৪৯

১৪. রহিম, হিষ্ট্রি অব দি আফগানস ইন ইন্ডিয়া, করাচি ১৯৬১, পৃ. ১

১৫. এন, বি, রায় : সাকসেসরস অব শেরশাহ ঢাকা, ১৯৩৪

১৬. রহিম, হিষ্ট্রি অব দি আফগানস ইন ইন্ডিয়া, করাচি ১৯৬১

১৭. তরফদার, হুসেন শাহী বেঙ্গল, ঢাকা ১৯৬৫

১৮ করিম, বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, ঢাকা ১৯৭৭

১৯. ইতিহাস পত্রিকা, করিম সম্পাদিত; এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের একটি গবেষণা পত্রিকা। পত্রিকাটির ১ম ও ২য় সংখ্যায় "চট্টগ্রামে ইসলাম" শীর্ষক ড. করিমের প্রবন্ধটি পরে বই আকারেও প্রকাশিত হয়। লেখকের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১.কয়েন্স এন্ড ক্রোনোলজি অব দি আফগান রুলার্স ইন বেঙ্গল যা জার্নাল অব দি ন্যুমিসম্যাটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, বারানসীতে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ২. দি প্লেস এন্ড ডেট অব শেরশাহ'স অ্যাকসেসন যা জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান এ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত এবং ৩. ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অব চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম, ১৯৭৯ তে প্রকাশিত

২০. আব্দ আল্লা তারিখ-ই-দাউদি; সম্পাদনা শেখ আব্দ আল রশিদ, আলিগড়, ১৯৫৬

২১. সারওয়ানী: তারিখ ই শেরশাহী :সম্পাদনা ও অনু এস.এম. ইমামুদ্দিন; ঢাকা ১৯৬৪, খণ্ড-১, ফারসিমূল পাঠ, ২য় খণ্ড

২২. ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপির রোটোগ্রাফ কপি যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত

২৩. ফারসিমুলপাঠ ; বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজ কলি ১৯৩৯

২৪. নিমাত আল্লা, তারিখ ই খানজাহানী ওয়া মাখজান ই আফগানি :সম্পাদনা এস এম ইমামুদ্দিন, খণ্ড ১ও ২, ঢাকা, ১৯৬০। বার্নাড ডর্ন, হিষ্ট্রি অব দি আফগানস, পুনর্মুদ্রণ দিল্লি ১৯৬৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৫. সারওয়ানী: তারিখ ই শেরশাহী খণ্ড ১, পৃ. ৬১, ৬২ এখানে ফারসি উদ্ধৃতি আছে

২৬. এই পাণ্ডুলিপিটি ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে

২৭. বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত ১৯২৭-৩৫। এতে তিনটি খণ্ড আছে যার ৩য় খণ্ডে বাংলার উপর একটি অধ্যায় আছে

২৮. বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত।

২৯. আকবরনামা ১৮৮৬ সালে বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত। ১৯০২ সালে এইচ, বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত। আইন ই আকবরীর ১ম খণ্ডটি এইচ, ব্লাকম্যান কতৃক সম্পাদিত ও অনুদিত এবং বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত। ২য় ও ৩য় খণ্ডটি এইচ, এস জারেট কর্তৃক অনুদিত ও বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে ১৮৯১ ও ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত। আইন ই আকবরীর ২য় ও ৩য় খণ্ডটি পরবর্তীতে স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা, ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রকাশিত।

৩০. বাবরনামা : বেভারিজ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত; লন্ডন ১৯২১; পুনর্মুদ্রণ দিল্লি ১৯৭২

৩১. ৯৯৫ হি:/১৫৮৭ খ্রি. গুলবাদান বেগম হুমায়ন নামা সংকলন করেন। এ.এস বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত ও বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত; কলি ১৯০২; পুনর্মুদ্রন দিল্লি ১৯৭২

৩২. তাজকিরাত আল ওয়াকিয়াত; লেখক জওহর আফতাবচী, ইংরেজি অনু: চার্লস স্টুয়ার্ট, পুনর্মুদ্রণ; লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৪, মূল গ্রন্থটি সংকলিত হয় হি. ৯৯৫/১৫৮৭ খ্রি.।

৩৩. বায়েজিদ বিয়াৎ হুমায়ুন নামা হিঃ ১০০০/১৫৯১ খ্রি. সংকলন করেন।ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এর একটি কপি আছে

৩৪. মুল্লা মুহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ ফিরিশতা গুলশান ই ইব্রাহিমী বা তারিখ-ই-ফিরিশতা; উর্দু সংস্করণ, অনুবাদ আঃ হাই; লাহোর, ১৯৬২

৩৫. ১৬০৭ সালে বইটি সংকলিত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এর একটি কপি আছে

৩৬. রিয়াদ আল সালাতিন গোলাম হোসেন সেলিম লেখক, ১৯০২ সালে বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত। পুনর্মুদ্রন দিল্লি ১৯৭৫

৩৭. উপরোল্লিখিত পৃ. ৩

৩৮. খুরশিদে জাহানুমা, মুন্সি ইলাহি বখশ; এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এ বেভারিজ. কৃত ইংরেজি অনুবাদ; কলি: ১৮৯৫

৩৯. আব্দ আল রহমান কর্তৃক কবিতায় লেখা মাখজান এ গঞ্জ ই রাজ; মূল ফারসি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত, তারিখ নেই

৪০. কালি প্রসন্ন সেন কর্তৃক ৩ খণ্ডে সম্পাদিত রাজমালা।

৪১. এ. পি, ফাইরে হিষ্ট্রি অব বার্মা, লন্ডন, ১৯৩৫

৪২. জে. জে. এ. [illegible] পর্তু[illegible] পুনর্মুদ্রণ পাটনা ১৯৭৯।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৩. দেখুন শামসুদ্দিন আহমদের ইন্সক্রিপসন্স অব বেঙ্গল; ৪র্থ খণ্ড রাজশাহী ১৯৬০, পৃ. ২৩৬-২৪০। মুদ্রার জন্য দেখুন এইচ, এন রাইটস ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম; ২য় খণ্ড নং ২২৯, পৃ. ১৮০।করিম ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অব চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম, ১৯৭৯ পৃ. ১১, ২০, ২২-২৭, ৬৪-৬৮, ৭১-৭৬

৪৪. কিয়ামুদ্দিন আহমদ কর্পাস অব দি এরাবিক এন্ড পার্সিয়ান ইন্সক্রিপসন্স অব বিহার, পাটনা ১৯৭৯; পৃ. জে এ এস পি ডি খণ্ড ১২, নং ৩, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১-৩৩১

৪৫. জে এ এস পি ডি খণ্ড-৯, নং ২, ১৯৬৪, পৃ. ২৫০-২৫৫

৪৬. এম, রবিনসন ও এল এ, শ' কয়েন্স এন্ড ব্যাংক নোটস অব বার্মা, ম্যানচেষ্টার, লন্ডন, ১৯৮০; পৃ. ৫১, ৫২

৪৭. উপরোল্লিখিত

৪৮. দৌলত উজির বাহরাম খান : লাইলী মজনু; সম্পাদনা : আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৫৭

৪৯. সুলতানী আমল পৃ. ৬০-৬২ ; ৫৫৯-৫৬০ ইতিহাস পত্রিকা :সম্পাদনা :করিম ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪ পৃ. ৩২-৫৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

আফগান বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা

পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে এক রাজনৈতিক পরিবর্তন বাংলার সালতানাত সংলগ্ন বর্তমান বিহার প্রদেশ এবং জৌনপুরের সালতানাত নিয়ে গঠিত উত্তর ভারতের অঞ্চলসমূহে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট করেছিল। ১৪৯৪ সালে লোদীরা জৌনপুর থেকে সারকীদের সমূলে উৎখাত করে এবং জৌনপুরের শাসক সুলতান হুসেন শাহ সারকী বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরবর্তীকালে লোহানী আফগানরা দিল্লির লোদী সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বিহারে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। বাংলার সৌভাগ্য যে এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মতো একজন শক্তিশালী শাসক বাংলার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর পূর্বে অর্থাৎ শেষের দিকের ইলিয়াস শাহী শাসকদের পতনের পর এবং হাবশীদের (আবিসিনীয়দের) ক্ষমতা দখলের সময় থেকে প্রায় এক দশক ধরে বাংলা অস্থিতিশীলতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিল। বাংলার ইতিহাসে হাবশী শাসনকাল হচ্ছে খুন ও হত্যার রাজনৈতিক কাহিনি; একের পর এক খুন হওয়ার জন্যই যেন তাদের সিংহাসন বা ক্ষমতা দখল।[১] এই সংঘাতময় সময় দেখেই সম্রাট জহির আল দীন মোহাম্মদ বাবর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিলেন যে

> বাংলার একটা বিস্ময়কর প্রথা হচ্ছে যে এখানে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী শাসন দুর্লভ। রাজকীয় কর্মক্ষেত্রটা স্থায়ী...এ কর্মক্ষেত্রকে বাঙালিরা সম্মানের চোখে দেখে...তারা বলে, আমরা রাজাসনের প্রতি বিশ্বস্ত, যেই এটা দখল করুক আমরা অনুগতের মতো তার অনুসরণ করি।[২]

সারকী রাজ্যের পতনের ফলে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সর্তক হয়ে ওঠেন। সারকী রাজ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহ দিল্লি ও গৌড়ের শাসকদের মধ্যে নিরপেক্ষ অঞ্চল (buffer zone) হিসেবে কাজ করতো। লোদীরা সুলতান হুসেন শাহ সারকীকে শুধু পরাভূত ও ক্ষতাচ্যুতই করেনি; তারা তার রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সুলতান হুসেন শাহ সারকী বাংলার সুলতানের অধীন খালগাঁও (kahlgaon) এ আশ্রয় নেন। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে সারকীদের তাড়া করে লোদীরা বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং বাংলার সার্বভৌমত্ব ও শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে ওঠে। বাংলার শাসক হুসেন শাহ সারকী নামীয় পলাতক সুলতানকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন, সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করেন এবং ভাগলপুর জেলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খলগাঁও (colgong) পরগণার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এখানেই সারকী তার নির্বাসিত সরকার গঠন করেন।[৩] জৌনপুরের ক্ষমতাচ্যুত শাসকের প্রতি বাংলার শাসকের এই বন্ধুত্বকে দিল্লির শাসক সুলতান সিকান্দার শাহ অবজ্ঞা করতে পারেন নি। তিনি বাংলায় একটি অভিযান চালিয়ে এই অবস্থার বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শক্তভাবে তার মোকাবিলা করেন। তিনি বারহ নামক স্থানে দিল্লির সৈন্যদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তার পুত্র দানিয়েল এর অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি সৈন্যদের মুখোমুখি কোনো সংঘর্ষ ঘটার আগেই এই মর্মে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা বন্ধ করা উচিৎ এবং পরস্পরের শত্রুদের রক্ষা করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। এর পরই দিল্লির সুলতান সিকান্দার শাহ লোদী বিহার, তুঘলকপুর ও শরনের গবর্নর মনোনীত করে দিল্লি ফিরে যান।[৪]

সুতরাং এটা মনে হয় যে দিল্লি ও বাংলার মধ্যে বিহার বিভক্ত হয়েছিল। পূর্বাঞ্চল বাংলার দখলেই ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মতো বিচক্ষণ ও শক্তিশালী শাসক তাঁর দেশের পশ্চিম সীমান্তের কৌশলগত গুরুত্ব অবজ্ঞা করতে পারেন না। দক্ষিণ বিহারের বিহার শরীফ, মুঙ্গের ও ভাগলপুরসহ রাজমহল থেকে পাটনা পর্যন্ত, পূর্বে গঙ্গা ও কোসীর সম্মিলন স্থল থেকে পশ্চিমে ঘাঘরা এবং বালিয়া জেলা পর্যন্ত, উত্তরে বিহারের দক্ষিণ বাঁক পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিল্লির ও বাংলার শাসকদের নিকট ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[৫] রাজমহল পর্বতমালার নিকট তেলিয়াগড়ের গিরিপথ এবং মধ্যযুগীয় বাংলার ঐতিহ্যগত সীমানা কোসীর প্রস্তর সমূহ (fords) প্রতিরক্ষার জন্য এই অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত ছিল। কোসী এবং গন্দকের একই প্রস্তর এলাকাসমূহ (fordable points) পাড়ি দিয়ে গঙ্গা নদীর তীর বরাবর পশ্চিম দিক থেকে বাংলায় সেনাবাহিনী অগ্রসর করা যেতে পারতো।

যে প্রধান সড়কটি দক্ষিণ বিহারের উজান দিয়ে লক্ষ্ণৌ এর সাথে দিল্লিকে সংযুক্ত করে তেলিয়াগড়ের সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়েছিল; গাঙ্গেয় সংকীর্ণ প্রবাহ নিয়ে এই গিরিপথটি বাংলার প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানকে শংক্তিশালী ও দুর্জেয় করে তুলেছিল। বখতিয়ার খলজী এবং শের খানের মতো আগ্রাসীরা পশ্চিমের প্রবেশপথের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যতা বুঝতে পেরেই ঝাড়খণ্ড অতিক্রম করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ছাড়িয়ে গাঙ্গেয় গতিপথ বরাবর আরো দূর্গম পথ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুতরাং বিহারের গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর সমতল ভূমি বাংলার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানে পরিণত হয় এবং তা বাংলার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত গাঙ্গেয় উপত্যকার উজানে ত্রিহুতদের বিরুদ্ধে আক্রমণের মূল ভুখণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৬] সুলতান শামস আল দীন সূচিত বাংলার স্বাধীনতা দুই শতক ধরে বহাল ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিকে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত এসে দাঁড়ায় বালিয়া জেলার খারিদ এবং শরন, ত্রিহুত ও হাজীপুর নিয়ে পুরো উত্তর বিহার এবং শরীফ, পাটনা, মুঙ্গের ও ভাগলপুর নিয়ে দক্ষিণ বিহারের একটা অংশ পর্যন্ত।

কিন্তু সুলতান ইব্রাহিম লোদীর শাসনের শেষ দিকে নিজ রাজ্যের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ঢিলেঢালা হয়ে আসে। তাঁর দুর্বলতা এবং রাজ্যের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো ইব্রাহিম লোদীর কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। আফগান শক্তিশালী উপজাতি গোষ্ঠী লোহানী ও ফার্মূলীরা জৌনপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। বিহারের লোদী গভর্নর দারিয়া খান লোহানী সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।[৭] কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান এবং তার পুত্র মুহম্মদ খান লোহানী (বিহার খান লোহানী নামেও পরিচিত) উত্তরাধিকার সুত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান ইব্রাহিম খান লোদীর বিরুদ্ধে সকল আফগান বিদ্রোহীদের তিনি নেতৃত্ব দেন।[৮] ইতিমধ্যে বাংলার সুলতান নাসির আল দীন নুসরাত শাহ উত্তরে ত্রিহুত পর্যন্ত তার অবস্থান সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করেন। তিনি তার দুই শ্যালক (brother in law) আলা-আল-দীন ও মাখদুম-ই-আলম এর অধীনে দ্বারভাঙ্গা ও হাজীপুরকে স্ব স্ব প্রধান কার্যালয় হিসেবে ন্যস্ত করেন।[৯]

> মখদুম ই আলম আজমগড় পর্যন্ত ঘাঘরা নদীর উভয় তীর সংলগ্ন সমগ্র ভূখণ্ডকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। কার্যকর, শক্তিশালী গভর্নর হিসেবে তিনি এ অঞ্চলটি যথাযথভাবে শাসন করেন এবং বিহারের আফগান বিদ্রোহীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন।[১০]

ইতিমধ্যে মুহম্মদ খান লোহানী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে বিহারের সুলতান মুহম্মদ শাহ হিসেবে দাবি করেন। তাঁর নামে খুৎবা পাঠ হয় এবং মুদ্রায় তার নাম অঙ্কিত হয়।[১১] এই বিহার খান লোহানীর একটা নাবালক পুত্র ছিল যার নাম জালাল খান লোহানী। বিহার খান লোহানী তার নাবালক সন্তান ও উত্তরসুরী জালাল খান এর গৃহ শিক্ষক হিসেবে ফরিদ খান সূরকে (পরে শেরশাহ) নিযুক্ত করেন।[১২] ফরিদ খান শুধু জালাল খানের গৃহ শিক্ষকতাই করেননি বরং বিহার খানকে তার রাজ্যের অর্থ-প্রশাসন পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন। সুলতান তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ফরিদ খানকে শের খান উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৩]

এই সময়কালে দিল্লি সাম্রাজ্যেই ঘটনাবহুল এবং যুগান্তকারী এমন সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে যার পরিণতিতে লোদী সাম্রাজ্য মোগলদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ইব্রাহিম লোদীর বিদ্রোহী আফগান প্রধানরা বাবরকে আমন্ত্রণ জানায় নিজেদের সম্রাটের অবিচার ও নিষ্ঠুরতা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য।[১৪] বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন এবং দিল্লি ও আগ্রা থেকে শাসক আফগানদের ক্ষমতাচ্যুত (dislodged) করেন। পরাজিত আফগানরা পশ্চিমে গুজরাট

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং পূর্বে বাংলায় পালিয়ে যায়। সুলতান নুসরাত শাহ বাংলায় পালিয়ে আসা আফগানদের ধাওয়াকারী মোগলদের আক্রোশ থেকে শুধু আশ্রয় দান ও রক্ষাই করেননি বরং তাদেরকে ভূমি ও পেনশন প্রদানের ব্যবস্থাও করেন[১৫] যেমনটি তার বাবা সারকীদের জন্য করেছিলেন। আর এর মধ্য দিয়েই তিনি বাংলার সার্বভৌমত্ব ও নিজের শান্তি বিপন্ন করেন।

বাংলা শাসনাধীন খারিদ অঞ্চল লুটপাট ও তছনছ করার পর ১৫২৭ সালে মোগলরা পলায়মান আফগানদের ধাওয়া করে ঘাঘরা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। তারা এখানেই থেকে যান। লুকিয়ে থাকা আফগানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সম্মতি চেয়ে সম্রাট বাবর তার প্রতিনিধি মোল্লা মুহম্মদ মাধবকে সুলতান নুসরাত শাহ এর নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।[১৬] এক বছরের বেশি সময়কালে সুলতান নুসরাত শাহ বাবরের দূতকে নিজ দরবারে আটকে রাখেন এবং বাবরকে সরাসরি উত্তর দেয়া এড়িয়ে যান। ইতিমধ্যে খাসপুর টান্ডা ও সাসারামের সামান্য এক জায়গিরদার মিয়া খান সূরের পুত্র ফরিদ খান (শের খান) অতিদ্রুতই শক্তিমান হয়ে ওঠেন। সৎ মায়ের সাথে সুসম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ফরিদ খানকে বাবা তার জায়গিরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আর এ দায়িত্ব ফরিদ খান বাবার সন্তুষ্টি অনুযায়ীই পালন করেন। ইতিমধ্যে বিহার এর শাসক বিহার খান লোহানীর সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিহার খান লোহানী তার নাবালক পুত্র জালাল খান এর গৃহশিক্ষক হিসেবে ফরিদ খানকে যে নিযুক্ত করেছিলন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

যাই হোক, মিয়া হাসান সূর এর মৃত্যুর পর জায়গির প্রশাসনে অংশ প্রাপ্তি নিয়ে তার সন্তানদের মধ্যে কলহ বিবাদ শুরু হয়। চৌদ (chaund) এর মুহম্মদ খান সূর এর সশস্ত্র হস্তক্ষেপে শের খানের সৎভাই সোলায়মান তার পিতার জায়গির এর প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন।[১৭] পিতার জায়গির থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফরিদ খান মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও হারানো জায়গির ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের সহযোগিতা করেন। জৌনপুরের মোগল গভর্নর জুনায়েদ বারলা মোগল শত্রুদের বিরুদ্ধে (বাংলার সুলতান নুসরাত শাহও এদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত) ফরিদ খানের স্থানীয় জানাশোনাকে কাজে লাগান, ফরিদ খানকে খাসপুর টান্ডা ও সাসারামের জায়গিরদারীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় এবং শাহাবাদ জেলায় মোগলদের সশস্ত্র ছত্রছায়ায় আরো এলাকা দখল করা হয়। কিন্তু যথাসময়েই তিনি মোগলদের এবং বাংলার সুলতানের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠেন। পরবর্তী ঘটনাক্রম প্রমাণ করে যে, শের খানের বিষয়ে মোগলদের উদ্বেগ অমূলক ছিল না। এই শের খানই শেষ পর্যন্ত বাংলা দখল করেছিলেন এবং দিল্লি থেকে মোগলদের তল্পিতল্পাসহ বিতাড়িত করে ভারতবর্ষে সূর আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে বিহারের সুলতান খান লোহানী মৃত্যুবরণ করেন।[১৮] মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও একটি নাবালক সন্তান রেখে যান। মৃত সুলতানের বিধবা স্ত্রী দুদু বিবি তার নাবালক সন্তানের গৃহশিক্ষক শের খানকে গৃহশিক্ষক-রূপী- প্রশাসক হিসেবে নিশ্চিত করেন। অবশ্য, বিহারের সিংহাসনের দাবিদারও দেখা দেয়। লোদী বংশের শেষ দাবিদার সুলতান সিকান্দার লোদীর পুত্র মাহমুদ লোদীকে চোরাপথে গুজরাট থেকে বাংলায় পাচার করা হয়। তিনি বাংলার শাসনাধীন বিহার জেলার ভাগলপুরে উপস্থিত হন এবং ১৫২৮ সালের ডিসেম্বরে জালাল খান লোহানীর রাজধানী ঘিরে ফেলেন।[১৯] ফতেহ খান সারওয়ানী কর্তৃক তাকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং বিহারকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের একটি পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হয়। বিহার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বালক– রাজা, সুলতান জালাল খান লোহানী, তার মায়ের সাথে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২০] বিরাট সংখ্যক আফগান সংগ্রহ করে মাহমুদ লোদী মোগল বিরোধী যাত্রায় নিজে সম্মুখে অবস্থান নেন। এই যাত্রায় তার সাথে যোগ দেন বায়েজিদ[২১], বিবান[২২], ফতেহ খান[২৩] এবং শের খান যেহেতু এই আফগানদের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত ছিল তাই তারা কোন অভিন্ন স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। মাহমুদ লোদী, জালাল খান লোহানী এবং জালাল সার্কী নিজেদের রাজ্য গঠনে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। শের খান মোগলদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন।[২৪] জালাল সার্কী বাবরের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেকে মোগলদের অধীন ন্যস্ত করেন।[২৫] মাহমুদ লোদীর মোগল বিরোধী অবস্থান পরিণতি ছাড়াই শেষ হয়।[২৬]

ইতোমধ্যে মোগল সম্রাট বাবর কনৌজে আফগান বিদ্রোহ দমনের পর পূর্ব দিকে ঘাঘরা বরাবর অগ্রসর হন। এই যাত্রাকালে তিনি বাংলার শাসকের এলাকাধীন একটি অঞ্চল শরনকে দান করেন এবং শাহ মুহম্মদ ফার্মূলীকে শেখজাদা হিসেবে অভিষিক্ত করেন।[২৭] এটা বাংলার সীমানা ও সার্বভৌমত্বের উপর বাবরের দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ যদিও পূর্বে তার একটি ঘোষণা ছিল যে আফগানদের তাড়া করে তার সৈন্যরা বাংলায় প্রবেশ করলেও তাদের কোন ক্ষতি করবে না। সুলতান নুসরাত শাহের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে তার দীর্ঘ নীরবতার কারনে বাংলার শাসকের বিরুদ্ধে বাবরের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই বাঙালি সম্রাট বাবরকে জানালেন যে তিনি তার পূর্বাঞ্চলীয় নীতির বিষয়ে এক ও অনুগত।[২৮] মাহমুদ লোদী এবং তার সহচরদের তাদের গোপন আস্তানায় বিতাড়িত করার পর বাবর বিহার রাজ্যকে তার সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনায় নিলেন এবং মুহম্মদ জামান মির্জাকে তার শাসক নিযুক্ত করেন। জালাল খান লোহানী এবং তার মা নিজেদের স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে সুলতান নুসরাত শাহের আশ্রয়ে থেকে বাবরকে অনুগত চিঠি লিখতেন।

ফতেহ খান সরওয়ানী কর্তৃক তাঁকে বাংলার সীমানায় বারবার বাবরের অনুপ্রবেশ, ১৫২৭ সালে দক্ষিণ খারিদ দখল, শাহ মুহম্মদ ফার্মুলী সরণ এর শেখজাদা হিসেবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিষিক্তকরণ, শের খানকে তার পৈতৃক জাগিরে পুনর্বাসন এবং মোগলদের প্রতি সেবার প্রতিদান স্বরূপ শাহাবাদ জেলায় আরো কয়েকটি পরগনা দান- এ সকল কারণে সুলতান নুসরাত শাহ পরিস্থিতি ভয়ানক বলে দেখতে পান। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শের খানকে সুলতান জুনায়েদ বারলার সামরিক ছত্রছায়া প্রদান, সরকার চুনার এর গর্ভনর হিসেবে জুনায়েদ বারলার বদলী, বিহার এর গর্ভনর হিসেবে মুহম্মদ জামান মির্জার নিযুক্তি, মাহমুদ লোদীর মোগল বিরোধী অবস্থান ভেঙ্গে পড়া এবং জালাল খান লোহানী ও বাবরের মধ্যে গোপন যোগাযোগ এসব সার্বিক পরিস্থিতে আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, ১৫২৯ সালের প্রথমদিকে মোগলদের স্বার্থে নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুলতান নুসরাত শাহ বাবরের সামরিক ছত্র ছায়ায় স্বায়ত্বশাসনে উচ্চভিলাষী আফগানদের প্রতিহত করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মোগলদের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়েও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন। পরিস্থিতি মোগলদের বিপক্ষে সুচিন্তিত শক্তি প্রদর্শনের দাবি রাখে। সুতরাং বাবরের নিকট জালাল খান লোহানীর উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সুলতান নুসরাত শাহ তাকে হাজীপুর আটকে রাখেন।[২৯]

মোগলদের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি যখন চলমান তখনই জালাল খান লোহানী হাজীপুর থেকে সরে পড়েন এবং বাবরের নিকট উপস্থিত হন।[৩০] বাবর তাকে নিজের জায়গীরদার হিসেবে বিহারে পুনর্বাসন করেন।[৩১] নিজস্ব সম্পদ ও কুটনীতি নিয়ে মোগলদের সম্মুখীন হতে গিয়ে সুলতান নুসরাত শাহ এ ভাবেই একাকী হয়ে পড়েন। যদিও তার দুত ইসমাইল মিতার মাধ্যমে সুলতান নুসরাত শাহ পূর্বেই বাবরকে জানিয়েছিলেন যে পূর্ব বাংলায় আফগানদের প্রতি বাবরের নীতির প্রতি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন এবং এককভাবে অনুগত, তবুও গোপনে গোপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ, কৌশলগত স্থানসমূহে তার সেনা ও নৌ বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেন। হাজীপুরের গর্ভনর মখদুম-ই-আলম গন্দক নদী বরাবর সৈন্য মোতায়েন করেন এবং ১৫২৯ সালের এপ্রিল মাসে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজের সমর্থনপুষ্ট বাংলার একটি সেনাদল ঘাঘরা ও গঙ্গানদীর সন্ধিস্থলে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অপেক্ষায় থাকে।[৩২] উস্কানীর বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দিয়ে বাবর বাংলার দূতকে সুলতান নুসরাত শাহের নিকট ফেরত পাঠান এবং ১৫২৭ সালের প্রথম দিকে সুলতানের দরবারে প্রেরিত তার প্রস্তাবসমূহের শ্রেণি বিন্যস্ত (categorical) উত্তর দাবি করেন।[৩৩] বাংলার সৈন্য চলাচলের বিষয়টিও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা মোকাবিলার জন্য তিনি প্রস্তুতি নেন।

বাংলা এবং মোগলদের মধ্যে শত্রুতা চরমে পৌঁছায় যখন ১৫২৯ সালের ৪ মে উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। ৬ মে বাবর বিজয়ী হয়ে খারিদে প্রবেশ করেন।[৩৪] এই যুদ্ধে বাবরের সফলতা তাকে অনেক সুবিধা এনে দেয়। এর পর থেকে আফগানদের তাড়া করে মোগলরা নদীর উভয় তীরে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারত। বস্তুত বাবর প্রথম থেকেই এই সুবিধা নুসরাত শাহের নিকট থেকে কামনা করেছিলেন যা প্রকারান্তরে তিনি এড়িয়ে যান।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার সৈন্যদের পরাজয় দেখে বাংলার শাসক মুঙ্গের এর শাহজাদা আবুল ফাতাহ এবং লস্কর উজির ওয়াজির হোসেন খান এর মাধ্যমে দ্রুত বাবরের প্রস্তাবের উত্তর দিয়ে পাঠান।[৩৫] ভারতবর্ষে নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করে (যেখানে তার শিকড় তখনও গভীরভাবে প্রোথিত হয় নি) বাবর বাংলার সুলতানের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবকে গ্রহণ করাটা সমীচিন মনে করেন। দেশের আবহাওয়াটাও তিনি বিবেচনায় আনলেন। বর্ষাকাল আগত প্রায়, তাই বাংলার দিকে আর বেশি অগ্রসর হওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অধিকন্তু বাঙালি এবং আফগানদের মধ্যে যে কোনো কোয়ালিশন তার অবস্থানকে শুধু বাংলায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষে বিপদগ্রস্থ করে তুলতে পারে। তাই তিনি বাঙালিদের সেই সামরিক গুনাবলীকে সমীহ করাটা সমীচিন মনে করলেন যা তারা আফগান সমর্থন ছাড়াই প্রদর্শন করেছে। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, বাঙালিদের নয় আফগানদের কঠোরভাবে দমন করাই ছিল তার লক্ষ্য এবং বাংলার শাসকের সাথে তিনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে ফিরে গেলেন।[৩৬] এভাবেই মোগলদের সাথে বাংলার মুখোমুখি হওয়াটা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলো। বাবরের সাথে এই শান্তিচুক্তি সম্পাদন বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি করল যা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সাময়িকভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। মাখদুম-ই-আলম বাংলার স্বার্থকে অগ্রায়িত করে বীর হয়ে উঠলেন এবং এলাকায় লৌহমানব রুপে আবির্ভুত হলেন।

সুতরাং সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এবং তার পুত্র ও উত্তরাধিকার সুলতান নাসির উদ্দিন হুসেন শাহ দুটো বড় রাজ্য দিল্লির লোদী এবং জৌনপুরের সারকী তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখলেন। তারা মোগলদের বিরুদ্ধে আফগান গোষ্ঠী প্রধানদের পরিবর্তনশীল মনের ঐক্য ও অনৈক্য এবং বিহার খান ওরফে সুলতান মুহম্মদ নামে বিহারে একজন স্বাধীন সুলতানের উত্থানও দেখলেন। বস্তুত ইতিহাসে তিনিই বিহারের একমাত্র সুলতান ছিলেন। সুলতান নুসরাত শাহ দিল্লিতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন দেখেছিলেন এবং সাহসিকতা ও সফলতার সাথে মোগলদের বিরুদ্ধে বিপদসমূহ মোকাবিলা করেছিলেন। জৌনপুরের হুসেন শাহ সারকী, বিহারের জালাল খান এবং দিল্লির মসনদের প্রতিদ্বন্দ্বি মাহমুদ লোদী নামক পলাতক রাজাদের আশ্রয়দানের জন্য বাংলার এই দুই সুলতান হুসেন শাহ এবং নুসরাত শাহ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উত্তর ভারতের নৈরাজ্যকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময়ও বাংলার সুলতানের সুনাম বেশ উচ্চই ছিল। সত্যিকার অর্থেই বাবর বাংলার সুলতানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন যখন তিনি সুলতান নুসরাত শাহকে ভারতের মহান শাসকদের একজন বলে অভিহিত করেন।[৩৭] সুলতান নুসরাত শাহের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অধীনে বাংলার এই মহান সালতানাতকে বিভক্তির ভাগ্যবরণ করতে হয়। আততায়ীর হাতে সুলতান নুসরাত শাহের মৃত্যুর সময় বাংলার পশ্চিম সীমান্তের পরিস্থিতি নৈরাজ্যকর ছিল।[৩৮] এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নৈরাজ্যকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তার মতো একজন বিচক্ষণ ও শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার নাবালক সন্তান ফিরোজ তার উত্তরাধিকার হন যাকে তার চাচা মাহমুদ হত্যা করেন। মাহমুদ সিংহাসন দখল করে নিজে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ উপাধি ধারন করেন। সুলতান মাহমুদ শাহ পরিস্থিতি যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন নি এবং পরিণাম হলো এই যে স্বাধীনচেতা আফগানদের হাতে বাংলা বিভক্ত হয়ে পড়লো। সুলতান নুসরাত শাহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে সম্রাট বাবর আগ্রায় ফিরে গেলেন। আর এটাই স্বাধীনচেতা আফগান ও মোগলদের উৎসাহিত করলো পূর্ব বাংলায় তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে। পরিণামে এই অঞ্চলে বাবরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে বিলীন হয়ে গেলো। জৌনপুরের মোগল গর্ভনর মুহম্মদ জামান মির্জা কিছু সৈন্য রেখে তার পদ ছেড়ে দিলেন।[৩৯] ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে সুলতান জুনায়েদ বারলা শের খানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৪০] তাজখান সারংখানী মোগল গর্ভনরের নিকট কখনোই চুনারের দুর্গ সমর্পণ করেননি কিংবা বাবরও কখনো তা করার শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন নি।[৪১]

মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ও জায়গিরদার রাজ্য হিসেবে বিহার বিশাল আর্থিক দায় নিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বিহার রাজ্য শাসনকারী জালাল খান লোহানীর মা মাহমুদ লোদীর ক্ষমতা জবরদখল ও পরবর্তীকালে বাবর কর্তৃক তা দখলের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিজেকে উপর্যুক্ত মনে করলেন না। ১৫২৯ সালের সেপ্টেম্বরে দুদু বিবি সুলতান মুহম্মদের জীবদ্দশায় প্রশাসনিক ভাবে দক্ষ শের খানকে চাকুরিতে ডেকে পাঠান।[৪২] ১৫৩০ সালের প্রথম দিকে দুদু বিবি মারা যান।[৪৩] জালাল খান লোহানীর রাজপ্রতিভু (regent) হিসেবে শের খান বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন। তাঁর শক্তিশালী প্রশাসনের কারণে লোহানীদের একটি অংশ অস্থির হয়ে ওঠে এবং জালাল খান ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েন।[৪৪]

দুদু বিবির মৃত্যুর পর শের খানের প্রতি গোষ্ঠীগত বিরোধিতা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। শের খান তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন; বিহারের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনেন এবং একই সাথে নিজের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন করে তোলেন। তিনি তাজখান সারংখানীর বিধবা স্ত্রী লাদ মালকা[৪৫], গাজীপুরের নাসির খান লোহানীর বিধবা স্ত্রী গাওহার গোসাইন[৪৬] এর মতো উল্লেখযোগ্য ধনাঢ্য আফগান বিধবাদের সাথে বৈবাহিক সুত্রে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দুর্গ, ভাগ্য ও শক্তি অর্জন করেন। ১৫৩০ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুবরণ করেন এবং একই বছরের ৩০ ডিসেম্বর হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুন এমন এক ছায়া রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন যা তার পরিষদ ও বিদ্রোহী আফগানদের চক্রান্তে পরিপূর্ণ ছিল। বাবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাংলায় আত্মগোপনে থাকা মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে মিয়া বিবান ও বায়েজীদ কর্তৃক আফগানদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের হারানো সালতানাত ফিরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য। মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আবারও শের খানকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। ১৫৩১ সালের আগস্ট মাসে গোমতী নদীর তীরে দো-রাহ [একটি মোড়ের নাম] নামক স্থানে মোগল ও আফগান সৈন্যরা জৌনপুরের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[৪৭] যুদ্ধরত অবস্থায় বিবান, বায়েজীদ এবং মিয়া ইব্রাহিম খান ইউসুফ খাইল মারা যান। শের খান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার সৈন্যসহ নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন; যেহেতু পুতুল সুলতান মাহমুদ লোদীর নামে কোয়ালিশন গঠন করা হয়েছিল ভারতবর্ষের পূর্বাংশে প্রভাব বিস্তার এবং আফগান প্রতিপক্ষ লোহানী ও সূরাদের ধ্বংসের লক্ষ্য নিয়ে।[৪৮] মাহমুদ লোদী পরাজিত হন, পলায়ন করেন, সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন, ভট্রা রেওয়ায়[৪৯] বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই ৯৪৯ হিজরি/১৫৪২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৫০]

সুলতান মাহমুদ লোদীর সেনাবাহিনী ধ্বংসের পর হুমায়ুন জৌনপুর থেকে বিহার পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর তার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহম্মদ জামান মির্জাকে বিহারের গর্ভনর হিসেবে পুনর্নিয়োগ ও সুলতান জুনায়েদ বাবলাকে চুনার থেকে জৌনপুরে বদলী করেন এবং হিন্দু বেগকে চুনার দখলের জন্য[৫১] প্রেরণ করেন। লাদ মালকাকে বিয়ে করার পর চুনার শের খানের দখলে ছিল। শের খান দুর্গটি সমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন চুনার পৌঁছালেন এবং দীর্ঘদিন দুর্গটি অবরোধ করে রাখলেন। দীর্ঘ অবরোধ এবং দু'দলের মধ্যে নিয়মিত সংঘর্ষ যখন চলছিল ঠিক তখনই হুমায়ন মালওয়ায় সুলতান বাহাদুর শাহ গুজরাটির বিভিন্ন তৎপরতা এবং আগ্রার প্রতি তার বৈরী উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ পেলেন।[৫২] এই সময় শের খান দুর্গ সমর্পণ না করে তার কনিষ্ঠ পুত্র আবদ আল রশীদ ওরফে কুতুব খানের অধীনে ৫০০ সৈন্যসহ আনুগত্যের প্রস্তাব দিয়ে তার দুত পাঠালেন।[৫৩] যাই হোক, ১৫৩১ সালের ডিসেম্বরে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে সম্রাট চুনার এর দিকে ফিরে যান রাগান্বিত হয়ে ও হতাশায়।[৫৪] কানুনগোর মতানুসারে

> পানিপথের যুদ্ধের পর এটাই প্রথম ঘটনা যেখানে আফগান দুর্গ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাছে মোগলদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ধরাশায়ী আফগানদের নিকট এর নৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।[৫৫]

সম্রাট হুমায়ুনের চুনার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ব প্রদেশে তার গর্ভনরবৃন্দ পারস্পরিক ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। জৌনপুরের সুলতান মির্জা এং বিহারের মুহম্মদ জামান মির্জা শের খানের সাথে একত্রিত হয়ে কনৌজ ও জৌনপুরে খানা তৈরিতে কাজ করেন। অযোধ্যার মোগল গর্ভনরের বিরুদ্ধে মুহম্মদ জামান মির্জা অস্ত্র ধারণ করেন। সুলতান মির্জা এক মোগল অনুগত কর্মকর্তা হাজী মুহাম্মদ খানের বাবাকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে শের খান তার অনুগতদের শক্তিশালী এবং বিরোধীদের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। একই সময়ে হুমায়ুনকে পূর্ব দিকে বিদ্রোহীদের সাথে ব্যস্ত রাখতে সুলতান বাহাদুর শাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুজরাটে মোগল বিদ্রোহীদের মধ্যে তার সম্পদ উদার ভাবে বিতরণ করতে থাকেন এবং শের খানকেও একটা মোটা অংক প্রদান করেন।[৫৬] গঙ্গার গ্রামদেশে শের খান লুটপাট ও ধ্বংসজজ্ঞের জন্য বিভিন্ন অভিযান শুরু করেন।[৫৭] শের খানের সহযোগিতায় বিদ্রোহী মির্জারা জনগণকে ভীত সন্ত্রস্থ করে তাদের জীবনযাপন দুর্বিষহ করে তোলে।[৫৮] স্বচ্ছল ব্যক্তিরা বিশেষত মোগল ও শের খান বিরোধী শান্তিপ্রিয় আফগানরা পরিবার পরিজন ও নিজের অর্থসম্পদ নিয়ে বাংলা বা বান্ডেলখণ্ডের জঙ্গলে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে যেতে শুরু করেন। আত্মবিশ্বাস অর্জনে শের খান তাদের সহায়তা করেন। তাই বিবি ফতেহ মালকা তার পোষ্য ও সম্পদ বিহারের নিকটবর্তী পাহাড়ে সরালেন না। ফারমূলী ও লোহী বংশীয় অন্যান্য আফগানদের ও তার অধীনে চাকুরি করতে শের খান প্রভাবিত করেন। নিঃস্ব ও হতদরিদ্র হয়ে পড়া শান্তিপ্রিয় আফগানদের তাদের জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এনে তার সরকারের অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য করেন। দিল্লি বা গৌড়ের শাসকদের নিকট থেকে যে কোনো বৈরী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনের সময় সামরিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি একই সময়ে সম্রাট হুমায়ুনের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মখদুম-ই-আলমের দৃষ্টিকে বিহার থেকে বাংলার মধ্যে সীমিত রাখতে তিনি তার সাথেও বন্ধুভাব চর্চার মধ্য দিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে বোকা বানান।

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর যাই হোক স্থিতিশীল ছিল না এবং উচ্চাভিলাষী সৈনিকেরা ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে সচেষ্ট ছিলেন। হুমায়ুন দিল্লির সম্রাট ছিলেন কিন্তু তার নিজের গর্ভনরেরা বৈরি পরিকল্পনা অনুসরণ করছিল। প্রকৃতপক্ষে আফগানদের হত্যা করা হচ্ছিল কিন্তু শের খান ছলেবলে ক্ষমতার্জন করে চলেছিলেন। বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বি নুসরাত শাহ তখনও বাংলার মসনদে আসীন ছিলেন। যদিও রাজ্যের দাঙ্গা-ফাসাদ বাহ্যত নিয়ন্ত্রণে ছিলো কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে রাজ্য তার কার্যক্ষমতা হারাচ্ছিল। বাবরের বিরুদ্ধে বাঙালিদের সামরিক শৌর্য প্রদর্শণের পর মাখদুম-ই-আলম খ্যাতি অর্জন করেন। আর এটা তাকেও উচ্চভিলাষী করে তোলে। তিনি মোগলদের বাংলা ও বিহারের অদ্বিতীয় শত্রু হিসেবে দেখলেন। সুতরাং ব্যাহত মোগলদের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে এবং তলে তলে তার নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অগ্রায়িত করার অভিপ্রায়ে তিনি শের খানের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[৫৯]

হাজীপুরের গর্ভনর (যিনি তার শ্যালক/ ভগ্নিপতি ছিলেন) এর কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে এবং মোগল আগ্রাসনের ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে সুলতান নুসরাত শাহ' নৈতিক স্খলন, আমোদ-প্রমোদ ও প্রজা নিপীড়নের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেন।[৬০] দয়ালু এবং প্রজাবৎসল রাজা তার জীবনের শেষ দিকে এসে পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিলেন বলেই গোলাম হোসেন সেলিম মনে করেন। তার রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা রাজ্যে কেন্দ্রমুখী প্রবণতাকেই সমর্থন দেয়। সুলতানের পক্ষে দূর দূরান্তর অঞ্চলগুলো শাসনকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অমাত্যবৃন্দ তাদের কার্যক্রমে প্রায় স্বশাসিত হয়ে ওঠেন। আসাম সীমান্তে যুদ্ধরত তার বাহিনীতে তিনি নতুন কোনো সেনা যোগান দিতে পারেন নি। বাংলার অভ্যন্তরে এবং বাংলার বাইরে উদ্ভূত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং হুমায়ুনের কথিত পূর্ব অভিযানের সংবাদের ভিত্তিতে এটা মনে হয় যে মাখদুম-ই-আলম মোগল বাধাকে বাংলা ও বিহারের জন্য একই স্বার্থ হিসেবে দেখে নিজের উদ্যোগেই শের খানের সাথে আঁতাতে প্রবৃত্ত হন। অবশ্য সুলতান নুসরাত শাহ বাংলার স্বার্থের প্রতি সুলতান বাহাদুর শাহের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে তার দূতকে গুজরাটে পাঠিয়েছিলেন।[৬১] কিন্তু মাখদুম-ই-আলম ও শের খান পারস্পরিক রাজনৈতিক অভিপ্রায় অর্জনের লক্ষ্যে পারস্পরিক সৈন্যদের একত্রিত করেন আপাত মোগলদের বাধা দূর করতে।

উত্তর পূর্ব বিহারে বাংলার সুলতানের আরো একজন গর্ভনর ছিলেন কুতুব খান। গঙ্গা নদীর দক্ষিণে মুঙ্গেরে তার সদর দপ্তর ছিল। খুব সম্ভবত মাখদুম-ই-আলম যখন গঙ্গার উত্তরে বালিয়া থেকে ত্রিহুত পর্যন্ত তার ক্ষমতা ও অবস্থানকে শক্তিশালী করেন এবং নিজেই এই অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন দ্বারভাঙ্গার গর্ভনরের সদর দপ্তর গঙ্গার দক্ষিণ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।[৬২]

পর্তুগিজ সূত্রানুসারে চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুজন গর্ভনর দেশটি তাদের অধীনে পরিচালনা করতেন এবং স্বায়ওশাসিত প্রধান হিসেবে কাজ করছিলেন। খোদা বখশ খান ছিলেন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে থেকে মাতামুহুরী নদী পর্যন্ত দক্ষিণ চট্রগামের গর্ভনর এবং কর্ণফুলী নদীর উত্তর দিক উত্তর চট্টগ্রাম ছিল হামজা খানের অধীন।[৬৩] জোয়াও দ্য বারোস এর (joao de barros) এর মানচিত্র অনুসারে এদের দুজনের মধ্যে খোদা বখশ খান নিজেকে বাংলার পূর্বাঞ্চলের শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রধানদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৬৪] উপর্যুক্ত মানচিত্রে Estado Codavascam নামে চিহ্নিত কর্ণফুলী নদী থেকে আরাকান পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত তিনি তার আধিপত্য বিস্তৃত রাখেন।[৬৫]

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এর ১৮ সন্তানের একজন এবং সুলতান নুসরাত শাহের শক্তিধর উচ্চভিলাষী ভাই মাহমুদ শাহও স্বার্থপরের মতো কাজ করছিলেন। ভাই সুলতান নুসরাত শাহ এর ভাইসরয় হিসেবে মাহমুদ 'বঙ্গে' নিয়োজিত ছিলেন এবং পূর্ব বাংলা শাসন করছিলেন।

৯৯৩ হি:/১৫২৬ খ্রি. থেকে সুলতান নুসরাত শাহের পাশাপাশি মাহমুদ শাহ ও মুদ্রা প্রবর্তন করেন।[৬৬] তার 'বদরশাহী' মুদ্রার আবিস্কার রাজ্যে তার অবস্থান নিয়ে বির্তক সৃষ্টি করেছে। মাহমুদ শাহ এর নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তনকে নুসরাত শাহ আপত্তি করেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি শুধু তার গর্ভনরদের প্রতিই নয়, তার ভাইয়ের প্রতিও মহানুভব ছিলেন।[৬৭] তরফদার এবং ড. করিম মনে করেন যে সুলতান নুসরাত শাহের জীবদ্দশায় মাহমুদের নামে মুদ্রার প্রবর্তন রাজ্যে সার্বভৌমত্বের বিষয়ে তার দাবির নীরব সমর্থনই বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুলতানের নাবালক সন্তানের উপস্থিতি এবং মাহমুদের নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু শাসক হিসেবে নুসরাত শাহ মহানুভব ছিলেন এবং যেহেতু তিনি তার ভাইয়ের প্রতিও সদয় ছিলেন, তাই তিনি মাহমুদের প্রশাসনিক অবস্থানের বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারী ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা ঝুলিয়ে রাখেন। আর যেহেতু তিনি তার নাবালক সন্তান বা ভাইয়ের অনুকূলে উত্তরাধিকারের কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি; তাই বিষয়টি রাজ্যের ক্ষমতাধর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমাত্যদের মধ্যে বিতর্কিতই থেকে যায়। 'বিদ্যাসুন্দর'[৬৮] এর লেখক সুলতান নুসরাত এর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজকে (ক্রাউন প্রিন্স) যুবরাজ উল্লেখ করায় সিংহাসনে মাহমুদের উত্তরাধিকার বিষয়টি সন্দেহজনক থেকে যায়। তাই রাজদরবারে এই দুই ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা ছিল। সুলতানের ক্রম রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা, অনর্থক তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ ও ছোটোখাটো নির্যাতনের কারণে তার আমাত্যবর্গ দেশের বিনিময়ে তুচ্ছ স্বার্থান্বেষী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[৬৯] পূর্ব বাংলা অভিযানকালে দখলীকৃত এবং শেখজাদা মারুফ ফার্মুলীকে দানকৃত খারিদ ও শরন উদ্ধারে মখদুম-ই-আলম কোনো মনোযোগই দিলেন না। আসাম ফ্রন্টে সামরিক বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে এবং একের পর এক কুচবিহার, কামতা ও কামরূপ হাতছাড়া হয়ে যায়। বাংলার শাসকের আমাত্যদের পারস্পরিক শত্রুতা উড়িষ্যার শাসক প্রতাপ রুদ্রকে সক্রিয় হতে উৎসাহ যোগায় এবং বাংলার দক্ষিণ সীমান্তের বিনিময়ে তার সীমান্তকে সম্প্রসারিত করেন।[৭০] পারস্যের এক বড় ব্যবসায়ী এবং বাংলার শাসক পরিবারের আত্মীয় খাজা মাল দীন বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য করছিলেন। তিনি সুলতান নুসরাত শাহের সাথে সৃষ্ট কিছু সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং পর্তুগিজ জাহাজে চড়ে হরমুজে পালিয়ে যেতে পর্তুগিজদের সহযোগিতা চাইলেন।[৭১] এই পর্তুগিজ সূত্রের প্রমাণই প্রকাশ করে সুলতান নুসরাত শাহ কতটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন যে একজন বিদেশি ব্যবসায়ীও তার চোখে আঙুল ঢোকাতে চেষ্টা করে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে হয় যে, সুলতান নুসরাত শাহ তার শাসনের শেষে রাজনৈতিকভাবে স্থবির, নিষ্ক্রিয় এবং উদ্ধত হয়ে ওঠেন। তিনি রাজদরবারের পরিস্থিতি কিংবা সীমান্তের পরিস্থিতি কোনো দিকেই উপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারেন নি। তার পারিষদবর্গ বেশি শক্তিধর হয়ে ওঠে এবং সালতানাত এর স্বার্থ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। ৯৩৩ হি:/১৫৩২ খ্রি. সুলতান নুসরাত শাহ তার দরবারের প্রহরী কর্তৃক নিহত হওয়ার সময় এই ছিল বাংলার সামগ্রিক অবস্থা। তাঁর মৃত্যুর পর পারিষদবর্গ তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজকে বাংলার সিংহাসনে বসান। তিনি প্রায় এক বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং তার চাচা মাহমুদ তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন।[৭২] তিনি নিজেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ বলে ঘোষণা দেন। তিনিই শের খান সূরের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেন এবং তার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সময়েই বাংলা তার সার্বভৌম ক্ষমতা হারায়। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা আফগানদের হাতে চলে যায়।

পাদটীকা ও সূত্রসমূহ

১. জে,এন সরকার (সম্পাদিত) হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, ঢাকা। পুনর্মুদ্রণ- ১৯৭৪ এইচ বি-২য় খণ্ড। আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল (বাংলা) ১৯৭৭। পৃ. ৩৩৭-৩৫৭। এর পর থেকে সুলতানী আমল হিসেবে উল্লেখিত

২. বাবুর নামা, এ, এস, বেভারিজকৃত ইংরেজি অনুবাদ পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি-১৯৭৯ পৃ. ৪৮২-৪৮৩

৩. রিয়াদ আল সালাতিন গোলাম হোসাইন সেলিম; ইংরেজি অনুবাদ আব্দুস সালাম। পুনঃ মুদ্রণ, দিল্লি-১৯৭৫ পৃ. ১৩৩। এইচ বি-২য়, পৃ. ১৪৫

সুলতানী আমল, পৃ. ৩৭০-৩৭১। জার্নাল অব দি বিহার রিসার্চ সোসাইটি- ৫ম খণ্ড, ১৯৫৫, পৃ. ৮৫৮-৮৫৯। এইচ,এন, রাইট, ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামঃ ২য় খণ্ড পৃ. ২০৭, ২১৮-২১৯। নিজাম আল দীন বখশী তবাকাত ই-আকবরী ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯ এবং ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭

৪. এইচ বি-২য় পৃ. ১৪৫-১৪৬। সুলতানী আমল পৃ. ৩৭০। নিজাম আল দীন বখশী তবাকাত ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০। বাদাউনী মুনতাখাব আল তাওয়ারিখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬-৩১৭

৫. ৯৩৩ হিজরি /১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে শিলালিপিটি বিহারের সিকান্দার পুরের একটি মসজিদে পাওয়া যায়। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে খান ই আজম মুক্তীয়ার খান (সার ই লস্কর) খরীদ অঞ্চলের সেনা প্রধান ছিলেন এবং সুলতান নুসরাত শাহ এর আমলে তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। দেখুন জেএ এসবি, ১১ খণ্ড, ১৯৭৩ পৃ. ২৯৬-২৯৭। ইনস্ক্রিপসন্স ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১

৬. চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলার স্বাধীনতা শুরুর দিকে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস দিল্লির শাসক মুহম্মদ বিন তুঘলকের জীবদ্দশায় ত্রিহুত জয় করেন। ধীরে ধীরে অঞ্চলটি উত্তরে নেপালের তেরাই থেকে দক্ষিণে বেগু সারাই পর্যন্ত সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। দ্বারভাঙ্গা (দ্বার-ই-বঙ্গ বা বাংলার প্রবেশ পথ) তার প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল। তরফদার তার বইয়ের পৃ. ৮ এর পাদটীকা ১ ও ২ এ মুল্লা তাকিয়ার বায়াজ (কবিতা সংকলন) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ পরবর্তীকালে হাজীপুরে শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। (এবং কিছুদিন পর সেখানে একটি দুর্গও নির্মাণ করেন)। এটা ছিল গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে। লক্ষ্য ছিল গঙ্গা ও গন্দক নদী দ্বয়ের স্রোতপথ পর্যবেক্ষণ করা এবং পশ্চিমে আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

৭. হালিম হিষ্ট্রি অব দি লোদী সুলতানস অব দিল্লি এন্ড আগরা; ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ১৫৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮. নিমাত আল্লাঃ পৃ. ২৫২,২৫৩। ফার্সি ভাষার উদ্বৃতি ও ইংরেজি অনুবাদ আছে।" কিছুক্ষণ পর দারিয়া খান নুহানী মারা গেলেন এবং তার পুত্র বাহার খান বাবার উত্তরাধীকারি হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধবাদী ওমারাওবৃন্দ (অমাত্যবৃন্দ) একই কারণে তার সাথে যোগ দেন। দেখুন ডর্নঃ হিষ্ট্রি অব দি আফগানস, পৃ. ৭৬-৭৭

৯. রিয়াজ : পৃ. ১৩৪, তরফদার, পৃ. ৭-৮

১০. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড পৃ. ৬০। এখানে ফার্সি উদ্বৃতি ও ইংরেজি অনুবাদ আছে। অনু: ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪ "যেহেতু মসনদে আলা দারিয়া খান, সুলতান মুহম্মদের পিতা ও আপনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আছেন"। এইচ বি-২য় খণ্ড পৃ. ১৫৩

১১. নিমাত আল্লা ১ম খণ্ড পৃ. ২৫২,২৫৩।এখানে ফার্সি ভাষার উদ্বৃতি ও ইংরেজি অনুবাদ আছে। "তিনি সুলতান মুহম্মদ উপাধি ধারণ করেন এবং মুদ্রাখচিত করেন এবং নিজের নামে খুতবা পাঠ করান।" ডর্ন, পৃ. ৭৬-৭৭; হালিম, হিষ্ট্রি অব দি লোদী সুলতানস অব দিল্লি এন্ড আগ্রা, ঢাকা ১৯৬১, পৃ. ১৬১। যদিও ঐতিহাসিকদ্বয় মত প্রকাশ করেছেন যে সুলতান মুহম্মদ শাহ নিজ নামে মুদ্রা খচিত করেছেন কিন্তু অদ্যবধি এই সুলতানের কোনো মুদ্রা আবিস্কৃত হয়নি

১২. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড পৃ- ৪৭, নিমাত আল্লাঃ ১ম খণ্ড পৃ. ২৫২,২৫৩

১৩. কানুনগো : পৃ. ৭১-৭৫, দেখুন পরিশিষ্ট-১। তরফদার পৃ. ৭৮, রিয়াজ : পৃ. ১৩৪-১৩৫

১৪. ডর্ন পৃ. ৭৭। তিনি লেখেন "দৌলত খান লোদী পাঞ্জাবের গাজী খান লোদী ও অন্যান্য অমাত্যদের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলেন। সুলতান ইব্রাহিম এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আলেম খানের মাধ্যমে সম্রাটকে কাবুলে আমন্ত্রণ জানালেন...।" আরো দেখুন হালিম হিষ্ট্রি অব দি লোদী সুলতানস অব দি দিল্লি এন্ড আগ্রা ঢাকা ১৯৬১,পৃ ১৬২

১৫. তিনি লেখেন যখন সম্রাট বাবর সুলতান সিকান্দার লোদীর পুত্র সুলতান ইব্রাহিমকে হত্যা করে হিন্দুস্থানের মহান রাজ্য জয় করেন, অনেক আফগান অমাত্য পালিয়ে গিয়ে নুসরত শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে সুলতান ইব্রাহিমের ভাই সুলতান মাহমুদ তার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়ে বাংলায় আগমন করেন। নুসরত শাহ তাদের সকলের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকের পদমর্যাদা ও অবস্থা বিবেচনা করে পরগনাসমূহ ও গ্রাম সমূহের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজ্যের তরফ থেকে আর্থিক অনুদান দেন। তিনি বাংলায় আগত সুলতান ইব্রাহিম এর কন্যাকে বিবাহ করেন

১৬. বাবুর নামা : এ,এস বেভারিজ এর ইংরেজি অনুবাদঃ পৃ. ৬৩৭

১৭. সারওয়ানী, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৮-৫২। কানুনগোঃ পৃ. ৮৮-৮৯, হালিমঃ পৃ. ২০৬

১৮. সারওয়ানী, ১ম খণ্ড পৃ. ৫৯। এখানে ফার্সি উদ্বৃতি আছে

সুলতান মুহম্মদের মৃত্যুতে জালাল খানকে সিংহাসনে বসানো হলো...যেহেতু জালাল খান নাবালক ছিলেন দুদু প্রশাসন চালাতেন এবং শের খানের পদ ও কার্যকাল নিশ্চিত করেন

১৯. কানুনগো, পৃ. ৯০। সারওয়ানীঃ ১ম খণ্ড পৃ. ৮৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২০. কানুনগো, পৃ. ৯০। বাবুর নামা এ,এস বেভারিজ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, দিল্লি , পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৯, পৃ. ৬৬৪

২১. সুলতান সেকেন্দার লোদীর অমাত্যদের একজন ছিলেন বায়েজিদ। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানি পথের যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পক্ষে যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোগলদের পক্ষ ত্যাগ করে সুলতান মাহমুদ লোদীর পক্ষে হুমায়নের বিরুদ্ধে ১৫৩১ সালে দোরায় যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন

২২. বিবানও সুলতান সিকান্দার লোদীর দীর্ঘ দিনের চৌকষ অমাত্য ছিলেন। তিনিও পানি পথের যুদ্ধের পর বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনিও বায়েজীদের সাথেই বাবরের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং মোগলদের বিরোধিতা করেন। সুলতান মাহমুদ লোদীর স্বার্থে তিনি ১৫৩১ সালে দোরায় সম্রাট হুমায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যান। শের খান (পরবর্তীকালে শেরশাহ) এই সব বৃদ্ধ অমাত্যদের নেতৃত্ব পছন্দ করতেন না। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে দোরার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের সৈন্যদল সহ সরে পড়েন। দেখুন কানুনগোঃ পৃ. ৯৮-১১২

২৩. ফতেহ খান (সারওয়ানী) ছিলেন আযম হুমায়ন সারওয়ানীর পুত্র। আযম সারওয়ানী ১৫২৬ সালে পানি পথের যুদ্ধের পর বাবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বাবর তাকে আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করেন এবং তাকে অন্যান্য জমির সাথে তার বাবার পরগনাও দান করেন। এখান থেকে প্রতি বছর ১ কোটি ষাট লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হতো। বাবর তাকে আযম হুমায়নের পদবী থেকে সরিয়ে খান ই জাহান উপাধিতে ভূষিত করেন। (বাবুর নামা বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ দিল্লিঃ পুনর্মুদ্রণঃ ১৯৭৯, পৃ. ৫৩৭) কিন্তু তিনিও বাবরের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং সম্রাট হুমায়নের বিপক্ষে সুলতান মাহমুদের জন্য যুদ্ধ করেন।

২৪. বাবর নামা : পৃ. ৬৫২ -৬৫৯

২৫. উপরোল্লিখিতঃ পৃ. ৬৫১-৬৫২, ৬৬৩, ৬৬৯। জালাল সারকী বাবরের পক্ষে নুসরাত শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন

২৬. উপরোল্লিখিতঃ পৃ. ৬৬২

২৭. ঐ, পৃ. ৬০৩,৬৭৫

২৮. ঐ, পৃ. ৬৩৭

২৯. ঐ, পৃ. ৬৬৪

৩০. ঐ, পৃ. ৬৭৬

৩১. ঐ পৃ. ৬৭৬

৩২. ঐ, পৃ. ৬৬৩-৬৬৫

৩৩. ঐ, পৃ. ৬৭১-৬

৩৪. ঐ, পৃ. ৬৭৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৫. ঐ, পৃ. ৬৭৬-৬৭৭। বাবর লিখেছেন গুলামে ই- আলী নামে খলিফার এক উকিল যিনি আবুল ফাত্তা নামে মুঙ্গের এর শাহজাদার উকিলের সাথে ঐ তিনটি শর্ত জানানোর জন্য ইসমাইল মিতার চেয়েও আগে গিয়েছিলেন; তারা এখন প্রত্যাবর্তন করেন। আবার আবুল ফাত্তার সাথে একত্রিত হয়ে শাহজাদা এবং লস্কর উজির এর লেখা চিঠিগুলোতে ঐ তিনটি শর্তে সম্মতি দেন। নুসরাত শাহের পক্ষে তারা নিজেরাই দায়িত্ব পালন করেন এবং শান্তির জন্য একটি শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেন।

৩৬. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৬৭৬-৬৭৭

৩৭. ঐ পৃ. ৪৮২-৪৮৩। বাবুর লেখেন উপরে উল্লিখিত এই পাঁচজন (যদিও তিনি মাহমুদ শাহ, মুজাফ্ফর শাহ, আলা-আল-দীন হুসেন শাহ এবং নুসরাত শাহ এই চারজনের নাম উল্লেখ করেছেন) ছিলেন মহান মুসলমান শাসক যাদের ভারতবর্ষে অনেক নামী দামী ব্যক্তি এবং জমিদাররা সম্মান করতেন।

৩৮. রিয়াজ পৃ. ১৩৫-১৩৬

৩৯. কানুনগো : পৃ. ৯৪

৪০. উপরোল্লিখিত পৃ. ৯৪,৯৫,৯৬। বাবুর নামা এ এস, বেভারিজকৃত ইংরেজি অনুবাদ দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৯, পৃ : ৬৮২

৪১. কানুনগো : পৃ. ৯৪

৪২. বাবুর নামা পৃ. ৬৬৪। বাবুর লেখেন দুদু বিবি ১৫২৯ সালের এপ্রিল মাসে বাবুর কে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। শের খান, যিনি দুদুবিবির স্বামীর জীবদ্দশায় উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তাকে আবার চাকুরিতে ডেকে পাঠান এবং দুদুবিবি সম্ভবত তিন থেকে চার মাস পরে ১৫২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাকে তার নায়েব বানালেন। কানুনগো : পৃ. ৯১

৪৩. কানুনগো : পৃ. ৯১

৪৪. ঐ, পৃ. ৯২

৪৫. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড পৃ. ৮০-৮৫

৪৬. ঐ, পৃ. ৮০-৮৫

৪৭. সারওয়ানী পৃ. ৬৫। তিনি এটাকে লক্ষ্ণৌ এর যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ নিমাত আল্লা (১ম খণ্ড পৃ. ২৮৮) হুমায়নের বিজয়কে 'জৌনপুরের বিজয়' বলে চিহ্নিত করেছেন। কানুনগো (পৃ. ১০৬-১০৮) স্থানটিকে দোরা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দোরা গোমতী নদীর তীরে জৌনপুর থেকে ৪৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। আরও দেখুন জওহর আফতাবচীর 'তাজ কিরাতুল ওয়াকিয়াত'। ইংরেজি অনুবাদ চার্লস ষ্টুয়াট, পুনর্মুদ্রণ: লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৪, পৃ. ১

৪৮. উপরোল্লিখিত খণ্ড-১ পৃ-৯১। নিমাত আল্লা ১ম খণ্ড -পৃ. ২৮৬-২৮৭। এখানে ফার্সি উদ্বৃতি আছে। কানুনগো : পৃ. ১০৮-১১০

৪৯. উত্তর প্রদেশের বুন্ডেল খণ্ড জেলায় ভাট্টা রেওয়া অবস্থিত। এখানে বন্দোগড় নামক একটি প্রাচীন দূর্গ সাগর সমতল থেকে ২৬৬৪ ফুট উচ্চতায় একটি পাহাড়ে ২৩.৪৩ ডিগ্রি উত্তর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং ৮১.৩ ডিগ্রি পূর্ব এবং রিওয়া শহর থেকে ৬০ মাইল দুরে অবস্থিত। দেখুনঃ ইমপেরিয়াল গেজেট অব ইন্ডিয়া : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৩৫৯।

লোদী বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ লোদী যুদ্ধে পরাজয়ের পর অবসর জীবনে বুন্ডেল খণ্ড জেলায় কাটিয়েছিলেন বলে একটি মতান্তর আছে। দেখুনঃ কানুনগো পৃ. ১০৬। কিন্তু হালিম মত পোষণ করেন যে মাহমুদ লোদী ৯৮৯ হিঃ/১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যায় নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করেন। আরো দেখুন হালিম,' দি হিষ্টি অব লোদী সুলতানস অব দিল্লি', ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ২০৮-২০৯।

৫০. সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৯১-৯২। নিমাত অল্লা পৃ. ২৮৮। সুলতান মাহমুদ লোদীর মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতান্তর আছে। কানুনগো বিশ্বাস করেন যে তিনি ৯৮৯ হিজরি/১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আমি তার মতকেই সমর্থন করি। কানুনগোঃ পৃ. ১০৬

৫১. সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৯২-৯৩। (এখানে ফার্সি উদ্বৃতি আছে।) অনুবাদঃ ২য় খণ্ড পৃ. ৬৬-৬৭

তিনি লেখেন সুলতান সিকান্দারের পুত্র সুলতান মাহমুদকে পরাস্ত এবং ব্যাপক হারে শত্রুদের হত্যার পর হুমায়ুন বাদশাহ হিন্দু বেগকে চুনারে প্রেরণ করেন শের খানের সাথে মল্ল যুদ্ধ (wrestle) করতে।

ডর্ন লেখেন বিজয়ের অব্যবহিত পরেই হুমায়ুন যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য সহযোগে হিন্দু বেগকে শের খানের নিকট থেকে চুনারের দখল নিতে প্রেরন করেন। ডর্নঃ পৃ. ১০৩। কানুনগো : পৃ. ১১০

৫২. নিমাত আল্লা : ১ম খণ্ড পৃ. ২৮৯। সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৯৪। ডর্নঃ পৃ. ১০৩

৫৩. উপরোল্লিখিত

৫৪. কানুনগো : পৃ. ১১১। সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৯৫। ডর্নঃ পৃ. ১০৩

৫৫. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১১১-১১২

৫৬. আকবর নামাঃ ১ম খণ্ডঃ পৃ. ৩২৮। আবুল ফজল লেখেনঃ বাহাদুর শাহ ব্যবসায়ীদের হাতে কিছু অর্থ সাহায্য দেন এবং শের খানকে নিজের পক্ষে ডেকে পাঠান। ফরিদ খান (শের খান) ষড়যন্ত্রের জন্য অর্থ সাহায্যকে মূলধনে রুপান্তর করেন এবং না যাওয়ার জন্য অজুহাত তৈরি করেন

৫৭. তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত চার্লস ষ্টুয়ার্ট কৃত ইংরেজি অনুবাদ পৃ. ৫। ডর্নঃ পৃ. ৯৩। ঈশ্বরী প্রসাদ দি লাইফ এন্ড টাইমস অব হুমায়ন কলকাতা ১৯৫৬, পৃ. ১১৪। সুজন রায় বাটলভী খুলাশাত আল তাওয়ারিখ, লাহোর, ১৯৬৬ পৃ. ৩৯৬। নিমাত আল্লা পৃ. ২৮৪

৫৮. কানুনগো পৃ. ১১২

৫৯. উপরোল্লিখিত পৃ. ১১২। তিনি লেখেন ১৫৩১ সালে হুমায়নের পুর্ব অভিযানের ফলশ্রুতিতে মোগল আধিপত্যের পুনরাবির্ভাবের ফলে ঘাঘরা অতিক্রম করে মাখদুম ই-আলমের পেছন থেকে একটা সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এটা বিহারে শের খানের জন্যও স্থায়ী সতর্কতা হয়ে ওঠে। এই দুই উচ্চভিলাষী মানুষ যারা উভয়েই তাদের দুর্বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রভুদের ভৃত্য ছিল, পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং পরস্পরের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে একে অপরকে সাহায্যের জন্য সেনাদের একত্রিত করে। সুলতান নুসরাত শাহ কি দুর্বল প্রভু ছিলেন? রিয়াজ উত্তর দিয়েছেন

৬০. রিয়াজ পৃ. ১৩৬

৬১. বাবুর নামা : বেভারিজকৃত ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ৫৫৪-৬৭৭

১৫২৯ সালে ঘাঘরা যুদ্ধের পর এবং এর প্রাক্কালে বাংলার গভর্নরদের সক্রিয় কার্যালয় হিসেবে হাজীপুর ও মুঙ্গের এর নাম উল্লেখ করেছেন। সে সময়ে যদি দ্বারভাঙ্গায় বাংলার কোনো গর্ভনরের কার্যালয় থাকতো তাহলে তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন না এবং বাবরের দৃষ্টি ও এড়াতে পারতেন না। তাই এটা যুক্তিসংগতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে দ্বারভাঙ্গা বাংলার গর্ভনরের কার্যালয় হিসেবে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বাংলার সুলতান নুসরাত শাহের শ্যালক আলা আল দীন, যিনি দ্বারভাঙ্গার গর্ভনর ছিলেন তারও কোনো উল্লেখ বাবুর নামা বা অন্য কোনো সুত্রে পাওয়া যায় না

৬২. ক্যাম্পোস পৃ. ৪২। ইতিহাস পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। ইতিহাস বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পৃ. ৬২, তরফদার : পৃ. ৬২

৬৩. ক্যাম্পোস পৃ. ৪২ তরফদার পৃ. ৬২। ৬২ পৃষ্ঠার বিপরীতে তরফদার দ্য বা-রোস এর একটি মানচিত্র সংযুক্ত করেছেন

৬৪. তরফদার পৃ. ৬২। সুলতানী আমল : পৃ. ৪৫৩

৬৫. কানুনগো :পৃ. ১১৩

৬৬. তরফদার : পৃ. ৩৫৩। সুলতানী আমল পৃ. ৪২৭-৪২৮

৬৭. রিয়াজ পৃ. ১৩৪

৬৮. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২-২৪

সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮২। সুলতানী আমল পৃ. ৪২৮-৪৩৫

৬৯. কানুনগো পৃ. ১১৩-১১৪। রিয়াদ পৃ. ১৩৬-১৩৮। তরফদার পৃ. ৭৮-৭৯

৭০. তরফদার : পৃ. ৭৭-৭৮

৭১. ক্যাম্পোস পৃ. ৩৩

৭২. এইচ বি ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯। কানুনগো পৃ. ১১৪-১১৫

করিম 'কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল', ঢাকা, ১৯৬০; পৃ. ১২৭-১২৯ রিয়াজ : পৃ. ১৩৭। সুলতানী আমল পৃ. ৪২৯। জে এ এস পিঃ ১৯৫৯; ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ১৭৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

শের খান সূরের বঙ্গ বিজয়

সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তিনি সৈয়দ বংশ কিংবা হুসেন শাহী বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহের ভাই ও সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এবং সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহের রাজত্বকালে বাংলার স্বাধীন সুলতানাত তার সাফল্যের শীর্ষে উঠেছিল। এই দুই সুলতানই ছিলেন মোগল সম্রাট বাবর এবং দিল্লির সুলতানদের সফল প্রতিপক্ষ। মোগল সম্রাট বাবর বাংলায় তার সমসাময়িক শাসক নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।[১] কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, তাদের উত্তরাধিকারীদের একজনের শাসনকালে এবং সুলতান নুসরাত শাহের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই মহান শাসকদের বংশ শুধু ধ্বংসই হয়নি, বাংলাকে তার স্বাধীনতাও হারাতে হয়েছে এবং দিল্লির সুলতানাতের একটি প্রদেশে পরিণত হতে হয়েছে।

বাংলার সুলতানাতের এই বিপর্যয়ের কারণ অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের মধ্যেই নিহিত। সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ পূর্ববর্তী শাসকের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ছিলেন না এবং তার সিংহাসন আরোহণও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তার সিংহাসন আরোহণের মধ্যেই তার পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার সিংহাসন আরোহণের ঘটনাবলি সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে

সুলতান মাহমুদ শাহ তার পিতা সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ১৮ জন সন্তানের একজন।[২] সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর সুলতান নুসরাত শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাইকে কারারুদ্ধ করার পরিবর্তে তিনি বাবা প্রদত্ত পদের জন্য সহায়তাকে দ্বিগুণ করে দেন।[৩] কিন্তু ভাইয়ের জন্য সুলতান নুসরাত শাহের অনুরাগ তার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মুদ্রা সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ তার ভাইয়ের শাসনকালীন সময়েই নিজের নামে পূর্ণ রাজকীয় উপাধিসহ স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রচলন করেন।[৪] আধুনিক ইতিহাস বেত্তারা এই প্রামাণিক সূত্রকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো কারো মতে মাহমুদ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।[৫] বস্তুত এটাই সবচেয়ে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা। কারণ খুৎবা (জুমার নামাজের বক্তৃতা) এবং সিক্কাকে (মুদ্রার পৃষ্ঠাংকন) সার্বভৌম কর্তৃত্বের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু সুলতান নুসরাত শাহের শাসনকালের ঘটনাবলি, বিশেষত তার সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃতকরণ এবং শক্তিশালী মোগল সম্রাট

~ www.amarboi.com ~

বাবরের সাথে সফল কূটনীতি, এ ধরনের মতামতের ন্যায্যতা প্রমাণ করে না। সুলতান নুসরাত শাহ যদি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হতেন তাহলে তার শাসনকাল এতটা সফল হতো না। কোনো কোনো পণ্ডিত এজন্য এমন মত পোষণ করেন যে সুলতান নুসরাত শাহ তার ভাইকে প্রশাসনে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬] কারণ যাই হোক এবং যে বিবেচনাতেই সুলতান নুসরাত শাহকে তার ভাইয়ের নামে স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রচলনে অনুমতি দান করা বিষয়টি প্ররোচিত করুক না কেন, এটা ভয়ানক পরিণতির বিপদে পরিপূর্ণ ছিল যেমনটা তার মৃত্যুর পর প্রকৃতই ঘটেছিল।

সুলতান নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি প্রায় এক বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৭] কিন্তু তিনি তার চাচা মাহমুদ, যার সাথে সুলতান নুসরাত শাহ এত স্নেহের আচরণ করেছিলেন, কর্তৃক নিহত হন। গোলাম হোসাইন সেলিম বলেন,

> আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ এর শাসনকালে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ১৮ সন্তানের একজন সুলতান মাহমুদ বাঙালি, যাকে সুলতান নুসরাত শাহ অমাত্য মর্যাদায় উন্নীত করে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যিনি নুসরাতের জীবদ্দশায় রাজকীয় হালে (ameer) জীবন চলাতেন, একদিন সুযোগ বুঝে ফিরোজ শাহকে হত্যা করেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৮]

এভাবেই সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ কেবল নিজের উপকারীর সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করেননি বরং রাজদরবারে সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ এবং তার মৃত পিতার সমর্থকদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেন।[৯] বস্তুত, গোলাম হোসাইন সেলিম স্পষ্টতই লিখেছেন :

> মাহমুদ শাহ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তার শ্যালক হাজীপুরের গর্ভনর মাখদুম-ই-আলম বিদ্রোহের তীব্রতা বাড়িয়ে দেন এবং বিহার উপত্যকায় অবস্থানরত শের খানের সাথে ষড়যন্ত্র ও সন্ধিতে আবদ্ধ হন। সুতরাং সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই তার সমস্যা শুরু হয়ে যায়। তিনি শুধু তার বিদ্রোহী গর্ভনরদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েননি বরং তাদের মাধ্যমে শের খানের সাথেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শেরশাহ পরিশেষে তার কাছ থেকে রাজ্য ও রাজমুকুট উভয়ই ছিনিয়ে নেন। প্রসঙ্গত মন্তব্য করতে গিয়ে এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ লিখেছেন, "ভাতিজার স্থলাভিষিক্ত দিতে গিয়ে মাহমুদ শত্রু সৃষ্টি করলেন যে শত্রুর সাথে তিনি শুধু সমঝোতা করতেই ব্যর্থ হননি বরং কৌশলবিহীন ভাবে খোলামেলা বিরোধিতায় চলে যান। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হাজীপুরের গর্ভনর তার সিংহাসন আরোহণ অস্বীকার করলেন। তিনি ফিরোজের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহার এই অজুহাতে নিজেই বিহারের উপ-শাসকের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন।[১০]

পরিস্থিতি সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। মখদুম-ই-আলম ও শের খান উভয়ই তার কর্তৃত্বের উপর শক্তিশালী বিপদ ছিল। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শের খানের মধ্যে সেই ধরনের বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন যেমনটি দেখেছিলেন মাখদুম-ই-আলমের মধ্যে। কারণ সারকী রাজ্যের (পূর্বাঞ্চলীয়) বিলুপ্তির পর বিহার মধ্যবর্তী এলাকা (buffer zone) হিসেবে বাংলা এবং দিল্লির মধ্যে আর কার্যকর ছিল না। তাই আব্বাস সারওয়ানী মনে করেন, আফগানদের নিকট থেকে বিহার জয়ের লক্ষ্যে মাহমুদ শাহ এক বিশাল বাহিনী দিয়ে কুতুব খানকে পাঠালেন।[১১] কিন্তু শের খানের শক্তি সামর্থ্য যাই থাকুক না কেন মাখদুম-ই-আলম তার কর্তৃত্বের উপর কম বিপদজনক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী এবং এমন এক অঞ্চলের শক্তিশালী গর্ভনর যে অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের উপর দিল্লি ও গৌড় উভয় শাসকেরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাহমুদ শাহ কী শেরখানের মিত্র তার বিদ্রোহী গর্ভনরদের হাতে অঞ্চলটি ছেড়ে দিতে পারেন? এমনকি এ ধরনের শক্তিশালী বিদ্রোহীকে শায়েস্তা না করে আগে বিহার অধিকারের চেষ্টা করতে পারেন? ভাই সুলতান নুসরাত শাহের জীবদ্দশাতে এবং সম্ভবত তার বাবা হুসেন শাহের সময়েও দেশের প্রশাসনের সাথে জড়িত মাহমুদ শাহ এমন মারাত্মক ভুল করতে পারেন না। পরিস্থিতির ভালো পর্যবেক্ষণ পাওয়া যাবে নিমাত আল্লার লেখায়। তিনি লিখেছেন,

> বাংলার শাসক নাসির শাহের গোমস্তাদের একজন মখদুম-ই-আলম হাজীপুরের গর্ভনর ছিলেন। তিনি শের খানের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং উদ্দেশ্যের ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তুলেছিলেন। সুলতান নাসির শাহ এই সম্পর্কের কথা অবহিত হয়ে ব্যথিত হন। কারণ তিনিই তার বয়োজ্যেষ্ঠ অমাত্যদের একজন কুতুব খানকে বিহার অধিকার এবং মাখদুম-ই-আলমকে অপসারণের জন্য নিযুক্ত করেন।[১২]

তার মতে, কুতুব খানকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তার নিকটেই মাখদুম-ই-আলমকে অপসারণ ও বিহার অধিকার কামনা করা হয়েছিল। কিন্তু নিমাত আল্লা স্পষ্টতই ভুল করলেন যখন তিনি লিখলেন যে নাসির শাহ (অর্থাৎ সুলতান নুসরাত শাহ) অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। অন্য সকল সূত্রই এটা নিশ্চিত করেছে যে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহই অভিযানটি পাঠিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত কানুনগো লিখেছেন :

> ১৫৩৩ খ্রি. জানুয়ারি থেকে মে মাসের কোনো এক সময়ে মাখদুম-ই-আলম উত্তরবঙ্গের বর্তমান দিনাজপুর জেলার একডালা গ্রামের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সুলতান মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেন। তিন মাসের শাসনের পর চাচা মাহমুদ শাহ কর্তৃক ফিরোজ নিহত হয় বলে জানা যায় এবং সম্ভবত ঘটনাটি ঘটে মাখদুম-ই-আলমের পরাজয় ও মৃত্যুর পর।[১৩]

তাই কানুনগো বিশ্বাস করেন যে, সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করা হয় মাখদুম-ই-আলমের পরাজয় ও মৃত্যুর পর। এই মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে মাখদুম-ই-আলমের বিরুদ্ধে কুতুব খানকে কে পাঠিয়েছিলেন—সুলতান আলাউদ্দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিরোজ শাহ নাকি সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ? ফিরোজ ছিলেন মাখদুম-ই-আলমের পছন্দের আর মাখদুম-ই-আলম ছিলেন ফিরোজের গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং কেন ফিরোজ তাঁর নিজ সমর্থকের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ তার বিদ্রোহী গর্ভনরদের নির্মূল করতে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি এটা করতে পারেননি। সুতরাং সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজের হত্যা মাখদুম-ই-আলমের হত্যাকাণ্ডের পূর্বেই ঘটেছিল। তাই মনে হয়, প্রথমে ঘর গুছিয়ে নেওয়ার উদ্দ্যেশ্যে সুলতান মাহমুদ শাহ তার শক্তিশালী গর্ভনর হাজীপুরের মাখদুম-ই-আলমের বিরুদ্ধে কুতুব খানকে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন; শের খানের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠাননি।[১৪] কিন্তু মাহমুদের বাহিনী মাখদুম-ই-আলমকে অলস বসে থাকতে দেখেনি। বিদ্রোহী হওয়ায় তিনি তার বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদ শাহ কর্তৃক অভিযানের আশঙ্কা করেছিলেন এবং এজন্য সব ধরনের সর্তকতামূলক প্রস্তুতি তার ছিল। তিনি শের খানের সক্রিয় সাহায্য চেয়েছিলন। কিন্তু শের খান, সম্ভবত বাংলার শাসকের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে, লোহানীদের সাথে শত্রুতার অজুহাতে, সে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন।[১৫]

শের খানের কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থায় লোহানীদের মধ্যে কানাঘুষা চলছিল এবং তাদের মধ্যে শের খানের বিরুদ্ধে এক ধরনের গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক ঘৃণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু লোহানীদের বিরোধিতা মোগলদের ও বাঙালিদের মতে (যাদের আশ্রয় থেকে জালাল খান লোহানী ১৫২৯ সালে পালিয়ে গিয়েছিলেন) দৃশ্যত আসন্ন বিপদের ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল। নিমাত আল্লার মতানুসারে মাখদুম-ই-আলম তার সম্পদ শের খানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে 'যদি বিজয়ী হই তবে এগুলো ফিরিয়ে নেব, তবে এখন এগুলো আপনার হেফাজতে ভালো থাকবে।'[১৬]

মখদুম-ই-আলমের সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত রাখার এহেন প্রলোভন শের খানকে উৎসাহিত করলো মখদুমকে সাহায্যের জন্য মিয়া হানসূর নেতৃত্বে ছোটো একটি সেনাদল প্রেরণ করতে।[১৭] কিন্তু যেমনটি দেখা গেল, মখদুম-ই-আলমকে সাহায্য করার চেয়ে হানসু তার সম্পদগুলো গঙ্গা নদী পার করতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।[১৮] সুলতান মাহমুদ লোদী, মিঁয়া বিবান, এবং বায়েজীদ এর মতো ব্যক্তিত্বের অপসারণ এবং এবং অন্যান্য আফগান প্রধানদের সুনাম রাহুগ্রস্থ হওয়া শের খানের জন্য স্বস্তির বার্তা বহন করে। এ সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সন্দেহজনক মনে হয় যখন মাহমুদ শাহ মাখদুমকে আক্রমণ করেন,তখন তিনি তার রাজনৈতিক মিত্র মাখদুম-ই-আলমের সাফল্য এবং জীবিত থাকা কামনা করেছিলেন। কানুনগোর দাবি অনুযায়ী 'এক ডালার নিকটস্থ কোথাও' বরং নিজ সীমানায় মাখদুম-ই-আলমকে পরাস্ত ও হত্যা করেন মুঙ্গের এর গর্ভনর ও সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের যৌথবাহিনী প্রধান কুতুব খান।[১৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মখদুমের নিহত হওয়ার পর মিয়া হানসূর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এবং হাজীপুরের সম্পদের বণ্টনের বিষয়ে মিয়া হানসু ও শের খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মখদুম-ই-আলমের স্বার্থ বিষয়ে শের খানের সততা ও নিষ্ঠার উপর সন্দেহের রেখাপাত করে। সুতরাং সুলতান মাহমুদ শাহ একজন শক্তিশালী গভর্নর ও তার কর্তৃত্বের উপর সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিকে নির্মূল করতে পেরেছিলেন। কারণ বিশাল এক রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। এভাবেই 'বাংলার প্রবেশ পথ' এর রক্ষক অপসারিত হলেন। এটা ১৫৩৩ সালে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই ঘটে।[২০]

বিদ্রোহী গর্ভনরের নির্মূল হওয়া মাহমুদ শাহের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করলেও তিনি সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, শের খানই এখন তার সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ শের খানই এখন বিহারের রাজনীতির নিয়ন্তা। বিহার ক্ষমতাচ্যুত আফগান গোষ্ঠী প্রধানদের আশ্রায়স্থলে পরিণত হয়ে উঠেছিল। তারা নিজেদের রাজ্য গঠনের কর্মে তৎপর ছিলেন। বাংলার দ্বারপ্রান্তে মোগলদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন এবং বাংলার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকির একটা কারণ হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং বিহার দখলের উদ্দেশ্যে আর একটি অভিযান পরিচালনার জন্য সুলতান মাহমুদ শাহ কুতুব খানকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এভাবেই মাখদুম-ই-আলমের সাথে শের খানের মিত্রতা লোহানী অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ কর্তৃক আগ্রাসন ডেকে আনে যা তার সিংহাসনে আরোহণের পর পরই সংঘটিত হয়। এটা সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দ্বিতীয় অভিযান। আর যুদ্ধ এভাবেই শুরু হয়ে যায় যা যথাসময়ে মোগল ও পর্তুগিজ উভয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করে। এটা ছিল বস্তুত মাহমুদ শাহ ও শের খানের মধ্যে ধারাবাহিক যুদ্ধ সমূহের সূত্রপাত যা আক্রমণাত্বক ও আত্মরক্ষামূলক উভয়ই ছিল। যুদ্ধ কয়েক বছর ধরে চলে এবং বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের চূড়ান্ত পরাজয় ও শের খান সূরের গৌড় বিজয়ের মধ্যে যার পরিণতি রচিত হয়।

মুঙ্গের-এর গর্ভনর কুতুব খান বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করেন। শের খানের জন্য পরিস্থিতিটা খুবই বিব্রতকর ছিল। তিনি কূটনীতির মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করেন। আব্বাস সারওয়ানী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> শের খান শান্তির চেষ্টা করেন এই বলে যে আমি একজন মুসলমান এবং আমি কখনো সীমা অতিক্রম করি নাই। যেহেতু সুলতান মাহমুদের পিতা মসনদে আলী দরিয়া খান ও তার বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তার পুত্র জালাল খান তখনও নাবালক, তাই দেশ অধিকার করা আপনাকে মানায় না। অবশ্য তিনি যতই বিধিমত বিরোধিতা করেন না কেন কুতুব খান তাতে কোনো কর্ণপাত করেননি।[২১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখন পর্যবেক্ষণে বলা যেতে পারে যে, কুতুব খানকে প্রতারণা করার জন্য শের খানের এটা একটা কূটনীতি ছিল মাত্র। একদিকে তিনি দেখালেন যে তিনি শান্তির পক্ষে অপরদিকে সমস্যাটি মোকাবেলার প্রস্তুতিও নিলেন।

লোহানীর রাজধানী রক্ষার্থে শের খান নিজেকে কুতুব খানের কাছে সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন। আব্দ আল্লার মতে 'উন্মুক্ত প্রান্তরে নিয়মিত সংঘর্ষে শক্তিশালী ও অসংখ্য শত্রুর সম্মুখীন না হওয়ার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নেন। তারা কুতুব খানকে লাঞ্ছিত করে ও তার বাহিনীর উপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চালিয়ে চরম দুরাবস্থার সৃষ্টি করে। কুতুব খানের বাহিনী যে দিকেই অগ্রসর হতে উদ্যত হয় সেদিকেই তারা শের খানের অশ্বারোহীদের সদা সর্তক অবস্থায় দেখতে পায়। একদিন শের খান নিজেই অগ্রসর হন, তবে নিজেকে আড়ালে রেখে কুতুব খানের দৃষ্টিসীমার মধ্যে তার বাহিনীকে এগিয়ে যেতে বলেন। আর এভাবেই কয়েকদিন কেটে যায়।[২২]

শের খানের এই প্রতারণামূলক কৌশল কুতুব খানকে বুঝতে বাধ্য করে যে শের খানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে উন্মুক্ত রণাঙ্গণে মোকাবেলা করা সমীচিন না। সুতরাং তাকে বিহার থেকে বিতাড়িত করাটাই শ্রেয়। তাই আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি শের খানের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। শের খান একবার পিছু হটলে তিনি আর একবার এগিয়ে যান। এভাবে যখন শের খান দেখলেন যে কুতুব খান তার রাজ্য সীমার দিকে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন, তখন তিনি তার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য বিন্যাস্ত করলেন এবং কুতুব খানের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। সারওয়ানীর মতে, দুই বাহিনীর মধ্যে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাংলার সেনারা পরাজিত হলো। হাবীব খান কাঁকর কুতুব খানের দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। ঘোড়া থেকে পড়ে কুতুব খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৩] সর্বাধিনায়কের মৃত্যু সেনাবাহিনীকে তীব্র সন্ত্রস্ত করার একটা সংকেত ছিল, তারা ভয়ে তাদের কামান, হাতি এবং অন্যান্য সম্পদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই হাতি, ঘোড়া এবং সম্পদ তিনি বিতরণ করে দেন। কানুনগো বলেন,[২৪] যে সকল পরিত্যক্ত সম্পদ শের খান পেলেন তার মধ্যে গোলা, কামান এবং হাতি ছাড়া সবই তার সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন কিন্তু কোনো অংশই নুহানীদের দেননি। সুবিধাগুলো হাতিয়ে নিয়ে মুঙ্গের এর নিকট সুরুজ গড়ের আশপাশ পর্যন্ত দখল করে নেন। এই দখলীকৃত জমি তার সৈন্যদের মধ্যে ও নতুন অনুসারীদের মধ্যে উদারভাবে ভাগ করে দেন। সুতরাং বলা যায়, শের খান বাংলার দখলীকৃত নতুন এলাকা, জমি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে লোহানীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। তাই লোহানীরা মনে মনে জ্বলছিল আর জালাল খান নিজেও শের খানের অধীনতা থেকে মুক্তি কামনা করছিলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে শত্রুতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে লোহানীরা গোপনে শের খানকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু শের খান তার লোহানী ভক্তদের নিকট থেকে বিষয়টি অনুমান করে ফেলেন। গোপনে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়াটা জালাল খান ও তার মিত্রদের হতাশ করে এবং তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবস্থানকেও দুর্বল করে ফেলে। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের আর একটি অভিযান, বিহারে আফগান শক্তির শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা ও শের খানের উচ্চাভিলাষকে দমন করার উদ্দেশ্যে সম্রাট হুমায়ুনের পূর্ব দিকে অভিযানে আসার গুজবে, জালাল খানের লোহানী গোষ্ঠীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কীভাবে নিজেদেরকে মোগলদের হিংসা, শের খানের থাবা এবং বাঙালিদের থেকে বাঁচানো যায় তা নিয়ে তারা বিস্তারিত আলাপ আলোচনায় বসেন।[২৫]

সারওয়ানীর ভাষ্য মতে, বিহার রক্ষা করতে হলে তাদের যে সমস্যা ভোগ করতে হবে, বাংলার রাজার নিকট বিহার হস্তান্তর করে তাদের সেই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে তারা জালাল খানকে পরামর্শ দেন।[২৬] সুতরাং শের খানকে তার জায়গীর সাসারামে পাঠিয়ে, বাংলা আক্রমণের অজুহাতে সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি মাহমুদ শাহের অমাত্যগিরি গ্রহণ করেন।[২৭] এটাই শের খান চেয়েছিলেন; কারণ বাংলার শাসকের নিকট জালাল খানের পক্ষ ত্যাগের কথা জানার সাথে সাথে তিনি আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন "বিহার রাজ্যটি এখন আমার হস্তগত।"[২৮] এভাবেই জালাল খান এবং তার লোহানী গোষ্ঠীরা বিহারে শের খানের জন্য ক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

এদিকে সম্রাট হুমায়ুন সফলভাবেই মির্জাদের দমন করে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি শের খানের কার্যকলাপকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেননি। কানুনগোর ভাষ্য মতে, আপাতত এই ক্ষেত্রে তিনি শের খানের বর্ণাঢ্য উপহার, রাজানুগত্যের প্রতিবাদ এবং সম্রাটের প্রতি কয়েকজন দূতের মাধ্যমে সেবা প্রদানের মধ্যে দিয়ে প্রতারণার শিকার হন। আর এভাবেই মোগল রণধ্বণি বেজে ওঠার মধ্য দিয়ে শের খানের জন্য পশ্চিম দিগন্ত উন্মুক্ত হলো।[২৯] স্বপক্ষে ঘটনার এমন পরিবর্তনে শের খান আনন্দিত হলেন।

বিহার সীমান্তে সামরিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলায় আগুন জ্বলে ওঠে। শের খান কর্তৃক তার সৈন্যদের পরাজয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তিনি আরো বড় আকারে যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দেন এবং লোকবল ও উপকরণের যাচাই করেন। নিহত জেনারেল কুতুব খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে তিনি যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য নিয়োগ করেন এবং পাইক, হাতি, ঘোড়া, গোলন্দাজ ও নৌসেনা দিয়ে তাকে সজ্জিত করেন। অভিযানের মূল ঘাঁটি হিসেবে মুঙ্গের এর দুর্গকে প্রস্তুত করা হয়। এবং গৌড় থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত সমগ্র পথটি যুদ্ধধ্বণিতে প্রকম্পিত হতে থাকে। সুলতানের বাহিনী গৌড় থেকে বিহার পর্যন্ত রাজপথ ধরে চলাচল করছিল।

এই পথটি সুতি, উদুয়ানালা, রাজমহল, খালগাঁও ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, মুঙ্গের হয়ে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি সুরুজগড় পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। যেহেতু মুঙ্গের এর দুর্গকে অভিযান পরিচালনার মূল ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করা হয়,তাই আগ্রাসী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি ও ঘাত উপযোগিতা বুঝতে এলাকাটির ভৌগোলিক বিবরণ সাহয্য করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কানুনগোর ভাষ্য মতে, মুঙ্গের জেলার চার পঞ্চমাংশ পাহাড়বেষ্টিত এবং অসমতল। এর সীমারেখার মধ্যে খড়গপুর ও গিধোরের পাহাড়ী অঞ্চল রয়েছে। কিউল নদীর মোহনা থেকে সুরুজগড় পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে ছয়মাইল; সুরুজগড় থেকে ১৮ মাইল পূর্ব মুঙ্গের অবস্থিত আর রাজমহল পাহাড়ের মধ্যে তেলিগড়ি মুঙ্গের থেকে আরো ৬৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত। সুরুজগড়ের সমতল অংশটির প্রশস্ততা প্রায় ৬ মাইল এবং মুঙ্গেরে তা সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ যেখানে এই প্রশস্ততা মাত্র ২.৫ মাইল। গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর দিয়ে স্বাভাবিক সড়ক পথে মুঙ্গের থেকে সুরুজগড় পর্যন্ত এই ১৮ মাইল পশ্চিম দিক থেকে যে কোনো আক্রমণকারীর জন্য বেশ কষ্টসাধ্য। রাস্তার এই অংশটি দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে খড়গপুর পাহাড় বেষ্টিত। মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গা নদীকে এটা প্রায় স্পর্শ করার মত। পূর্বদিকে তখন পর্যন্ত অজেয় মুঙ্গের দুর্গ অবস্থিত যা গঙ্গা নদীর উপর অভূতপুর্ব নিয়ন্ত্রণ এবং ভারী গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থন ছাড়া শত্রুর যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে।[৩০] আক্রমণ পরিচালনা এবং প্রতিহত করা উভয় কাজের জন্য মুঙ্গের ছিল বাংলার সেনাদের জন্য উপযুক্ত স্থান। যুদ্ধের সকল প্রস্তুতিসহ ইব্রাহিম খান যখন প্রতিশোধ স্পৃহায় তৃষ্ণার্ত, ঠিক তখন সুলতান জালাল খান লোহনী ও তার লোহানী উপদলগুলো বাংলার শাসকের পক্ষে স্বপক্ষ ত্যাগ করেন। সুলতান মাহমুদ শাহ তাদের স্বাগতম জানান। বিশাল যুদ্ধাভিযানের সেনাদল, এর সম্পদ ও এর সমরাস্ত্রের প্রেক্ষিতে তিনি আবারও তার প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে দেখলেন এবং বিহারের অন্তরদ্বন্দ্বকে নিজের পক্ষে গোছাতে ব্যর্থ হলেন। যাই হোক, সুলতান জালাল খান লোহানীকে সাথে নিয়ে ইব্রাহিম খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাদল শের খানকে নিশ্চিহ্ন করতে মুঙ্গের থেকে যাত্রা করল। অপরদিকে শের খানও অলস বসে ছিলেন না। তিনি ছিলেন তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন সৈনিক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা থেকে আর একটি অভিযান অত্যাসন্ন। তাই শত্রুর মোকাবিলায় তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। লভ্য সকল সম্পদই তিনি সংগ্রহ করেন। তার সেনাদলে ছিল অশ্বারোহী, কিছু হাতি, (match-lock men) এবং কয়েকটি গোলন্দাজ ইউনিট।তাই সৈন্যদলে সংখ্যামানের ঘাটতি লুকাতে শের খান আধা সামরিক কৃষকদের ডেকে পাঠালেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিকল্পনা করেন এবং সুলতান মাহমুদের সেনাদল মুঙ্গের থেকে যাত্রার লক্ষণ পাওয়ার আগেই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকলেন। সুলতান জালাল খানের প্রতি গোপনে সহানুভূতিশীল দোদুল্যমানদের নিকট থেকে কোনো বাধা এলে তা প্রতিহত করতে এবং বিহারে তাদের প্রবেশ প্রতিরোধে তিনি নিজেই বিহারের বাইরে চলে এলেন। বিহারকে পেছনে রেখে একটি সুবিধাজনক স্থানে তিনি ছাউনি স্থাপন করেন যেখান থেকে আক্রমণকারী সেনাদলের প্রতি তিনি আঘাত করতে পারেন এবং কোনোরূপ সম্ভাব্য দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে বিহার অথবা চুনারের দিকে পিছু হটে যেতে পারেন। সারওয়ানীর মতে, "পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বিহারকে পেছনে রেখে তিনি বাংলার সেনাদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আত্মরক্ষার্থে মাটির দুর্গে অবস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেন। পরিখার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দৈনন্দিন ভাবে ছোটোখাটো যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। ইব্রাহিম খানের সেনাদল যতই চেষ্টা করুক না কেন তারা শের খানের সেনাদলের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ শের খানের সেনারা মাটির পরিখার মধ্যে ছিল।[৩১] সংখ্যার দিক থেকে অগ্রজ, গোলন্দাজ ও হস্তিদ্বারা সুসজ্জিত একটি বাহিনীকে শের খান এমন এক জায়গায় উল্লেখযোগ্য সময় ধরে আটকে রাখলেন যা এড়ানোও যায় না আবার সুপরিকল্পিত কোনো আক্রমণেও বাধ্য করা যায় না। সারওয়ানী আরো জানান যে, শের খান এমন এক জায়গায় ইব্রাহিম খানকে আটকালেন যেখানে তার গোলন্দাজ, হস্তীসেনাদল এবং অশ্বারোহী বাহিনী কোনো কাজেই এলো না। আবুল ফজল সুরুজগড়কে সেই স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি লিখেছেন "শের খান বাংলার শাসকের সীমানা প্রাচীর সুরুজগড়ে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভও করেন।"[৩২] কানুনগো জায়গাটি আরো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে লিখেছেন তিনি কিউল নদীর পশ্চিম তীর বরাবর ঘাটি স্থাপন করেন এবং তার পিছু হটার পথ উন্মুক্ত রাখেন...।[৩৩] সুতরাং শের খান ও ইব্রাহিম খানের সেনাদলের অবস্থান এমনই ছিল যে হঠাৎ এবং চমকপ্রদ কোনো আক্রমণ উভয়দলের জন্য অসম্ভব ছিল। ইব্রাহিম খান ও কিউল নদী অতিক্রম করে আফগানদের পরিখার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়। তার বাহিনী দ্বারা আফগানদের পরিখাসমূহ ভেদ করে প্রবেশ করার ব্যর্থতা তাকে দীর্ঘস্থায়ী এবং নিত্য সংঘর্ষের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিজের দুর্বলতা বুঝতে বাধ্য করে। সারওয়ানী বলেন, ইব্রাহিম খান অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরনের জন্য সুলতান মাহমুদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন কারণ, তার মতে, "শের খান নিজেকে দুর্গের মধ্যে নিরাপদ রেখেছেন এবং এই বাহিনী নিয়ে আমি তাকে উৎখাত করতে পারছি না"।[৩৪] শের খান গোপন সূত্রে সংবাদটি পেয়ে ভাবতে থাকলেন (এবং ভাবনাটি যথার্থই) যে শত্রুকে আঘাত করার এখনই উপযুক্ত সময়। তিনি তার অনুসারি আফগানদের ডেকে তাৎক্ষণিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। শের খানের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে সারওয়ানী লিখেছেন যে তিনি তার বাহিনী প্রধানদের সম্বোধন করে বলেন, শত্রুর বাহিনীতে অনেক হাতি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং পদাতিক সৈন্য আছে। তাদের সাথে আমাদের তাই এমনভাবে লড়াই করা উচিৎ যে তারা যেন তাদের পরিকল্পিত শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারে, বাঙালি সৈন্যরা তাদের গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনী ত্যাগ করে আর হাতিরা ঘোড়ার সাথে মিশে যায়। এভাবেই যেন সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।[৩৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই শুরু হওয়ার আগে বাঙালি সৈনিকদের বিন্যাস এমন সুপরিকল্পিত ছিল যে তাদের পদাতিক, হস্তীরোহীদল, অশ্বারোহীদল এবং গোলন্দাজরা একই রেখায় অবস্থান নেয়। শের খান এক ডিভিশন সেনাকে আফগান বাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসেবে বাংলার সেনাদের মুখোমুখি মোতায়েন করেন। আর এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেন যুদ্ধক্ষেত্রে আফগান অগ্রবর্তী দলের সহায়তাকারী হিসেবে। সব শেষে অন্ধকারের মধ্যে পাঁচশত সৈন্যের একটি বহর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পূর্ব দিকে তিনি প্রত্যাহার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেন। বাঙালিদের দৃষ্টি এড়াতে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি একটা পাহাড়ের পিছনে অবস্থান নেন।

পরিকল্পনামতই শের খানের সৈন্যবহর ইব্রাহিম খানের সৈন্যবহরের দিকে অগ্রসর হয় এবং বেশ কিছু তীর নিক্ষেপের পর পালিয়ে আসার ভান করে পশ্চাদপসরণ করে। আফগান সৈন্যবহর পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে ইব্রাহিম খানের অশ্বারোহীদল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী পিছনে ফেলে আফগান সৈন্যবহরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতায় ঝাপিয়ে পড়ে। এর ফলে বাংলার সেনাদের হাতিগুলো পদাতিক বাহিনীর সাথে মিশে যায় এবং শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। শের খান যখন দেখলেন যে, ইব্রাহিম খানের অশ্বারোহী দল তাদের পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী পিছনে ফেলে অনেক দুর এগিয়ে এসেছে তিনি তৎক্ষণাৎ তার বাছাইকৃত সেনাদের সম্মুখে এসে বাংলার অশ্বারোহীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন।[৩৬] সারওয়ানীর ভাষ্য মতে "বাঙালিরা হতভম্ব হয়ে যায়। যে সব আফগানরা পালাচ্ছিল তারা ফিরে এলো এবং অতর্কিত গোপন আক্রমণের জন্য সংরক্ষিত আফগান সেনাদের সাথে যোগ দিল। তারা আফগান নিয়মানুযায়ী যৌথভাবে বাঙালিদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। অবশ্য বাঙালিরাও সমবেত হয় এবং শক্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়।

পরিণতিতে দুটো শক্তিশালী সেনাদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে খ্যাতিমান যোদ্ধাদের হতাহতের পর পূর্ব দিগন্তে শের খানের বিজয় সূর্য উদিত হয় আর বাঙালি সৈন্যদের পরাজয় বরণ করতে হয়"।[৩৭] রণক্ষেত্রে ইব্রাহিম খান নিহত হন। সুলতান জালাল খান বাংলার রাজার কাছে পালিয়ে যান। শের খান কার্যত বিহারের বৃহদাংশের শাসক হয়ে উঠলেন। কানুনগোর ভাষ্য মতে সুরুজগড়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৩৪ খ্রি. জুন মাসে।[৩৮] এক বছর আগে কুতুব খানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাথে এই যুদ্ধের একটা বড় তুলনার বিষয় রয়েছে। বিহারের যুদ্ধে শের খান যে কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন এখানেও ঠিক তাই করলেন। বিহারের যুদ্ধ ছিল অস্ত্রের ঝনঝনানী, সামরিক বাহিনীর সাধারণ কর্মকাণ্ড কিন্তু সুরুজগড়ের যুদ্ধে সুলতান মাহমুদের মান সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। বাংলার শাসকদের উপর শের খানের শ্রেষ্ঠত্ব এই যুদ্ধের সফলতার পর সুদৃঢ় হয় এবং এর পরে সুলতান মাহমুদ শাহকে শের খান সূরের বিরুদ্ধে আর কোনো আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় নি।

সুরুজগড়ের পরাজয় শের খানকে বিপুল পরিমাণ গোলন্দাজ, অসংখ্যা হাতি এবং ঘোড়া পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই প্রাপ্তি তার সেনাদের দীর্ঘদিনের অভাব থেকে মুক্ত করে এবং বাংলার শাসক কর্তৃক ভবিষ্যতে বিহার জয় করার যে কোনো চেষ্টা থেকে বিহারকে নিরাপদ করে। পরাজয়টি পূর্বে কিউল নদী থেকে পশ্চিমে কর্মনাশা নদী পর্যন্ত বিহারে শের খানের শাসনের বৈধতা সৃষ্টি করে। অঞ্চলটি শের খান ও সুলতান মাহমুদ শাহের মধ্যে রাজ্য সীমানা হিসেবেও কাজ করে। শের খান এখন আফগানদের মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং হযরত-ই-আলা উপাধি ধারণ করেন।[৩৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরপর দুটি যুদ্ধে শের খানের নিকট বাংলার সৈন্যদের পরাজয় সুলতান মাহমুদ শাহকে বাংলার রুগ্ন মানুষ হিসেবে পরিগণিত করে। জনবল, সম্পদ এবং রাজ্য হারিয়ে মাহমুদ মারাত্মক চিন্তায় ছিলেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কানুনগো যথার্থই লিখেছেন "সামরিক সাফল্য হিসেবে সুরুজগড়ের যুদ্ধ শের খানের নিকট যতটা বড় ছিল তার চেয়েও বেশি বড়ছিল এর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিণতি। সুলতান মাহমুদের দ্বিতীয় ও শেষ সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা এবং সুরুজগড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম খানের নিহত হওয়া এবং এক বছরের মধ্যে কুতুব খানের একই ভাগ্যবরণ, মধ্যযুগের বাংলায় সৈয়দ বংশের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শোনার মত। কিন্তু সুরুজগড়ের বিজয় ছাড়া যে সাসারামের অখ্যাত জায়গীরদার পুত্রের রাজমুকুটের সন্ধানে অস্পষ্টতা থেকে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব হতো না।[৪০]

শের খানের হাতে পরপর পরাজয়ের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সুলতান মাহমুদ বেশি দেরি করেননি যদিও শের খান জয়ের সুবিধা সুরুজগড়ের বাইরে অগ্রায়িত করেননি। কারণ মুঙ্গের এর অজেয় দুর্গটি তার সামনেই ছিল এবং বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত হয়ে বাংলার সেনাদল কিউল নদীর পূর্ব দিকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গে প্রত্যাবর্তন করে। বিহারে এবং এ পর্যন্ত দখলীকৃত বাংলার সীমানায় শের খান তার কর্তৃত্ব শক্তিশালী করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মাখদুম-ই-আলম, কুতুব খান এবং ইব্রাহিম খান কর্তৃক শাসিত গঙ্গা নদীর উভয় তীর তিনি তার নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় থাকেন। সফলতার পরও শের খানের সংযম এবং বাহ্যিক আনুগত্যের লেবাস হুমায়ুনকে নিরস্ত্র করে। কানুনগো বলেন, "তৃতীয়ভাবে তিনি সম্রাটের জায়গীরদার ছিলেন, সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করতেন এবং স্বাভাবিক সামরিক সেবার পাশাপাশি চুনার ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।[৪১]

সুলতান মাহমুদ এবার আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হন। পরপর দুটো পরাজয়ের গ্লানি মুছতে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সুরুজগড় থেকে ফেরান্দাজ[৪২] পর্যন্ত দুর্গায়ন ও এর পুনর্গঠনের কাজে এবং লব্ধ সম্পদের দ্বারা সেনাছাউনির কাজ এবং রাজধানীকে শের খানের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মোগল ও পর্তুগিজদের সাহায্যে প্রার্থনা করেন। জনবল, সম্পদ এবং রাজ্যের এলাকা হারানোর পর তার মানসিক চাপ ও সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য তিনি সম্ভবত তার দূতকে সম্রাট হুমায়ুনের কাছে প্রেরণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনকে তিনি এটা বোঝাতে সম্ভবত সক্ষম হয়েছিলেন যে শের খানকে প্রতিরোধ করতে হলে তাকে পূর্বে দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাই ১৫৩৪ সালে অক্টোবরের প্রথমদিকে[৪৩] আবুল ফজল মনে করেন[৪৪] সুলতান মাহমুদের দূত কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন তার অভিপ্রায়ের লাগাম পূর্ব দিকে এবং বঙ্গ বিজয় পর্যন্ত টেনে ধরেন। সুলতান মাহমুদ আশা করেছিলেন যে এই প্রক্রিয়ায় শের খানের বিনাশ হবে। কিন্তু হুমায়ুন আগ্রা ত্যাগ করে কালপি পৌঁছামাত্রই সুলতান আলা আল দীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলম খান লোহানীর[৪৫] পুত্র তাতার খান লোদী আগ্রা এবং তার পার্শ্ববর্তী বায়ানা পর্যন্ত তছনছ করে ফেলেন। এই সংবাদ সম্রাট হুমায়ুনকে বিচলিত করে। তিনি বাড়ির কাছের বিষয়গুলোকে ঠিকঠাক করতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শের খান সংবাদটি শুনে মহাস্বস্তি বোধ করলেন। সুযোগ বুঝে পুরো বছর নিয়ে মান্দাসর[৪৬]-এর মোগল ছাউনি থেকে হুমায়ুনের চাকুরি ছেড়ে চলে আসার জন্য নিজের পুত্র কুতুব খানকে পরামর্শ দিলেন।[৪৭] এভাবেই শের খান ১৫৩৫ সালের শুরুর দিকে সুসংহত মানসিকতা নিয়ে আরো পুর্বে মুঙ্গের এবং ভাগলপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সারওয়ানী বলেন, বিবি ফতেহ মালেকার স্বর্ণের অর্থ দিয়ে তিনি সৈন্যদলকে সজ্জিত করে বাংলা রাজ্যকে অধিকারের কাজ শুরু করেন এবং গারহী পর্যন্ত জেলার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।[৪৮]

শের খানের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদ শাহের আক্রমণ বিষয়ে সারওয়ানীর বর্ণনা বিস্তারিত হলেও গোলমেলে, কিন্তু সুলতান মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে শের খানের আক্রমণ বিষয়ে তার বর্ণনা এমনভাবে লিখিত যেন শের খান গৌড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বাংলায় ওয়াক-ওভার (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিবতায় জয়লাভ করা) পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। "রিয়াদ আল সালাতিন" এর তথ্য প্রমাণ এবং মোগল সূত্রসমুহের দ্বারা সমর্থিত পর্তুগিজ সূত্রসমূহের বিবরণ, সুলতান মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে শের খানের আক্রমণ এবং এর পরিণতিতে শের খানের বঙ্গবিজয় সম্পর্কে ইতিহাস পুনর্গঠনে আমাদের সাহায়তা করে। রিয়াজ এর মতে, 'তেলিয়াগড় এবং শিকরিগলির গিরিপথ সমূহ একমাস যাবৎ পাহারারত বাংলার অমাত্যবৃন্দ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে এই দুই অঞ্চলের গিরিপথসমূহ দখল করা হলো।'[৪৯]

গৌড় রক্ষায় পর্তুগিজরা শের খানের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ১৫৩৫ সালে শের খানের প্রথম প্রচারাভিযান এবং পরের বছর তেলিয়াগড়ের গিরিপথ দখলের মধ্যে একটা বিরতি ছিল। তিনি সুরুজগড়ের দুর্গ প্রথম দখল করেন কারণ আগের বছরে তার বিজয়ের পর তিনি কিউল নদীর আরো পূর্ব দিক পর্যন্ত অগ্রসর হননি। পূর্ব দিক দিয়ে কিউল নদী সুরুজগড়ের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। সুলতান মাহমুদ শাহ জিব্রালটার এর কঠিন পাথরের মতো দণ্ডায়মান অজেয় মুঙ্গের দুর্গসহ সমগ্র এলাকায় তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করেন। কিউল নদীর মাথা থেকে সুরুজগড়ের দূরত্ব ছয় মাইল এবং মুঙ্গের সুরুজগড়ের আঠারো মাইল পুর্বে অবস্থিত। তাই কানুনগোর মতে,[৫০] স্বাভাবিক রাস্তায় পশ্চিম দিক থেকে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর ১৮ মাইল দীর্ঘ সুরুজগড় থেকে মুঙ্গের কোনো আক্রমণকারীর জন্য বেশ কষ্টসাধ্যপথ। তাই মাহমুদ গৌড় অভিমুখে শের খানের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে এখানে তার সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন এবং দুর্গায়নের কাজ শক্তিশালী করেন। শের খান সুরুজগড়ের যুদ্ধে সেই সমস্ত স্থান জয় করেছিলেন যেখানে আগের বছর বাঙালিদের দ্বারা নির্মিত দুর্গগুলোতে কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয় নি। স্পষ্টতই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি অধিক শক্তিশালী দুর্গ সুরুজগড়ের উপর আক্রমণ দিয়েই তার অভিযান শুরু করেন। কানুনগো লক্ষ্য করেন যে,[৫১] কোনো প্রাজ্ঞ এবং সাবধানী সেনাধ্যক্ষ নিজেকে এ ধরনের বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলবেন না, শের খানের এধরনের ভুল করা সম্ভব ছিল না। আর যদি তিনি তা করতেন তাহলে বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ দিয়ে মুঙ্গের দুর্গ রক্ষায় হুমায়ুন যেমন চুনারে মূল্য দিয়োছিলেন, তাকে তার চেয়েও বেশি মূল্য দিতে হতো। তাই শের খানকে বাঙালিদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তিনি সম্ভবত তার সৈন্যদলের একটি অংশ সুরুজগড় আক্রমণ প্রদর্শনের জন্য রেখে যান এবং নিজে কিউল থেকে আনুমানিক ২৫ মাইল দূরে অর্থাৎ গঙ্গার সাথে সম্মিলন স্থলের সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে এবং মুলিপুরের (বর্তমানে মুলিঞ্চপুরের) অল্প কিছু দক্ষিণে খড়গপুর রেঞ্জের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হন। মুলিচপুর এবং গিধোর শহরের মাঝে একটি উন্মুক্ত উচু নিচু ঢেউ খেলানো দশ মাইল দীর্ঘ সমতল ভূমি আছে। স্পষ্টতই শের খান এই সমতল ভূমি ভ্রমণ করেছেন এবং মুঙ্গের থেকে কয়েকমাইল ভাটিতে গঙ্গা অতিক্রম করার জন্য উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

সুতরাং সামনে ও পেছনে শত্রুর অবস্থান থাকায় বাঙালিরা শুধুমাত্র নৌকা যোগে গঙ্গার অপর পাড়ে পালানোর আশা করতে পারে। শের খান ১৫৩৫ সালে বাঙালিদের প্রতারণা করে এবং তাদের সামনে পেছনে উভয়দিক থেকে আক্রমণ করে কিউল নদী ছাড়িয়ে সুরুজগড় ও মুঙ্গের পর্যন্ত দখল করে নেন। বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় শের খান এখানেই তার অগ্রযাত্রার বিরতি দেন। এরপর তিনি সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে অভিযানে মুঙ্গেরকে মূল ভূখণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেন। শের খানের পেছন থেকে মোগল সমর্থন/সহযোগিতা পাওয়া সুদুরপরাহত বুঝতে পেরে সুলতান মাহমুদ শাহ তেলিয়াগড় ও শিকরিগলির গিরিপথ সমূহের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদকে দ্রুত কাজে লাগাতে চাইলেন কারণ আফগান আগ্রাসন অত্যাসন্ন বলেই তার কাছে মনে হয়। তিনি পর্তুগিজদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ক্যাম্পোস লিখেছেন :

> ...শেরশাহের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। ১৫৩৬ সালে গোরজী দুর্গের দিকে অগ্রসরমান শেরশাহ তেলিয়াগড় ও শিকরিগলি গিরিপথের ভিতর দিয়ে গৌড়ে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলার প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত এই গিরিপথসমূহ রক্ষার্থে জোয়াও দ্য ভিলালোবস এবং জোয়াও কোরীর নেতৃত্বে দুই জাহাজ সৈন্য প্রেরণ করা হয়। পর্তুগিজরা মরণপন প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং শেরশাহকে গৌড় নগরীর কুড়ি লীগ দূরে ফেরান্দাজ নগরীর দখল নিতে প্রতিহত করে।[৫২]

পর্তুগিজ বিবরণ, রিয়াজ এর সূত্র এবং তারিখ-ই-দাউদীর দলিল শের খানের তেলিয়াগড় ও শিকরিগলি গিরিপথ সমূহ দখলের বিবরণ পূর্ণগঠনে ও গৌড়ের উপর চূড়ান্ত চাপ প্রয়োগের ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে। রিয়াজ-এর বিবরণ মতে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তেলিয়াগড় ও শিকরিগলি গিরিপথ সমূহের পাহারায় নিয়োজিত অমাত্যবৃন্দ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তা দখল করা হলো এবং শের খান বাংলায় প্রবেশ করলেন। সুলতান মাহমুদ শাহ তার সেনাদের গুটিয়ে এনে তাকে মোকারেলা করেন এবং বিরাট এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে তিনি নিজে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় নেন।"[৫৩]

পর্তুগিজ বিবরণ[৫৪] মতে, তেলিয়াগড় ও শিকরিগলি গিরিপথসমূহ এবং সিটি অব ফেরান্দাজ পয়েন্টে শের খানকে পর্তুগিজদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু শের খান কম সুরক্ষিত পথে ৪০,০০০ আশ্বারোহী, ১৫০০ হাতি, ২ লক্ষ সৈন্য এবং ৩০০টি নৌকার এক বহর নিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করেন। কম সুরক্ষিত পথে শের খানের গৌড়ে প্রবেশের বিবরণ 'তারিখ-ই-দাউদী'তেও পাওয়া যায়।[৫৫]

সুতরাং শের খান সুরক্ষিত তেলিয়াগড় আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। আবদ আল্লার মতে,' তার দ্বিতীয় পুত্র জালাল খানের নেতৃত্বে অল্প কিছু সৈন্যের উপর আক্রমণের দায়িত্ব রেখে শের খান নিজে আশ্বারোহী দলের বিরাট অংশ নিয়ে রাজমহল পর্বতমালার সমতল উপ অঞ্চল বরাবর সোজা দক্ষিণ দিকে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তদানীন্তন ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত দক্ষিণ পশ্চিমের পাহাড়ী এলাকায় শের খান ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৫৬] বিহারের দিকে শের খানের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত আবুল ফজল[৫৭]-এর সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ কারণ তা গৌড় অভিযানের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরিপূর্ণ। একই সময়ে তার দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান হুমায়ুনের বিরুদ্ধে গরহী রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তার পুত্রকে নির্দেশনা দেন যে শের খান গরহী ত্যাগ করে শেরপুরে যান, তখন জালালের তার সাথে যোগ দেওয়া উচিৎ ছিল।

কানুনগো লিখেছেন,[৫৮] "স্পষ্টতই শের খান বিহার থেকে বাংলায় আসতে শেরপুর (বাংলার সীমান্তের একটি চৌকি যা তার নামানুসারে পরিচিত) হয়ে এসেছিলেন। তাই তেলিয়াগড়কে এড়িয়ে শের খান যে পথ অনুসরণ করেন, কানুনগোর ভাষ্য মতে, তা হচ্ছে এই যে তিনি সম্ভবত তেলিয়াগড়ের ২০ মাইল পশ্চিমে চেরীনুল্লার শুষ্ক পথ ধরে দাররা বা আধুনিক ধারণা (যা নুনির ১০ মাইল সোজা উত্তরে অবস্থিত) পৌঁছান এবং ধারণা থেকে আরো ২০ মাইল সামনে গিয়ে ভাটির পথ ধরে আধুনিক শহর দুমকায় পৌঁছান। দুমকা থেকে দশ মাইল পুর্বে দোয়ারকা নদীর উজানের তীর ঘেষে শেরপুর অবস্থিত। যদি শের খানের সৈন্যবহর প্রায় ৭ মাইল সোজা এগিয়ে থাকে বা প্রকৃত অর্থে প্রতিদিন ১০/১২ মাইল এগিয়ে থাকে তাহলে তারা প্রায় ২৪ দিনে মূল সমতল ভূমিতে উপস্থিত হতে পারে। উত্তর পূর্ব দিকে শেরপুর থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরত্বে গঙ্গা নদী অবস্থিত যা ভগবানগোলা থেকে মাত্র কয়েকমাইল দূরে। খুব বেশি হলে আশ্বারোহীদলের জন্য এটা ২/৩ দিনের পথ...। তেলিয়াগড়ের নিকট আশি মাইল উজানে শৈলান্তরিপে মাহমুদ শাহের নৌবহরকে বাঙালিরা সর্তক করার আগেই গঙ্গা নদী পাড়ি দিয়ে আফগান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাহিনীর যাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল। গঙ্গা নদী অতিক্রমের পর শের খানের সেনাদল শৈলান্তরীপ থেকে গঙ্গার শাখা মহানন্দা নদীর ৬০ মাইল উত্তরে গৌড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শের খানের কিছু ক্ষতি হয়েছিল বলে বলা হয়। এমন প্রধান সংঘর্ষটি ঘটে পর্তুগিজ প্রতিরক্ষা বাহিণীর কাছ থেকে ফারান্দাজ নগরীর দখলের লড়াইয়ে; কারণ সম্মুখের এই গুরুত্বপূর্ণ চৌকির দখল না নিয়ে শের খান নিরাপদে গৌড়ের পথ অনুসরণ করতে পারেননি। শের খানের চমৎকার কৌশল ফলদায়ক হয়। বাংলার সেনাদল রাজধানী রক্ষার্থে তেলিয়াগড়ের দিকে ছুটে যায় এবং জালাল খান (রিয়াজের বর্ণনা মতে শের খান নয়) এক মাসপর শের খানের প্রধান সেনাদলকে বিহারে মূল ঘাঁটির সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসরমান সেনাদ্‌লের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫৯]

এভাবেই তেলিয়াগড় এবং শিকরিগলির গিরিপথসমূহ পাশ কাটিয়ে শের খান ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করেন ও গৌড়ে উপস্থিত হন। দশ মাইল জুড়ে শক্তিশালী দুর্গায়নে গৌড় দাঁড়িয়েছিল। শের খানের অশ্বারোহী বাহিনী নিকট থেকে কোনো আক্রমণ চালাতে পারছিল না। দশগজের কম গভীরতা নয় এমন সব এককেন্দ্রিক পরিখা ও গড়ের সামনে তার পদাতিক বাহিনীকে পিঁপড়ার মতো মনে হচ্ছিল। সুলতান মাহমুদকে দুর্গের বাইরে আনতে তাই তার সময় লেগেছিল। ইত্যবসরে বিহারে জমিদারদের একাংশের বিদ্রোহের খবর শের খানকে বিচলিত করে। ঠিক এই সময়েই শের খানের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে শাসন দৃঢ় করার লক্ষ্যে তার আধা ডজন যুদ্ধংদেহী উচ্চাভিলাষী সন্তানদের নিয়ে মহম্মদ সুলতান মির্জা পূর্ব দিকের প্রদেশ সমূহে উপস্থিতি ঘোষণা করলেন। তিনি বিলগ্রামকে তার শক্তির কেন্দ্র তৈরি করলেন। শের খান গৌড়ে থাকাকালেই এ সংবাদ পান। শের খান মাহমুদ শাহের নিকট থেকে কিছু সুবিধা আদায়ে এবং সম্ভাব্য প্রথম সুযোগেই বিহারে ফিরে যাওয়া মনস্থির করলেন।

পর্তুগিজ নৌসেনাধ্যক্ষ মার্টিম এফোনসো দ্য মেলো সুলতান মাহমুদকে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন কিন্তু সুলতান মাহমুদ সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বিপদ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন; তিনি মার্টিমের কথায় কর্নপাত করলেন না। সুলতান মাহমুদ শের খানের নিকট থেকে ১৩ লাখ স্বর্ণমুদ্রা বা ৫,২৫০০০ পারদোর (১ পারদো = ৪৬.৬ ডলার) বিনিময়ে শান্তি কিনে নিলেন। কানুনগোর ভাষ্য মতে সুলতান মাহমুদ শের খানের সাথে বিশাল অংকের যুদ্ধ ক্ষতিপুরণ দিয়ে শান্তি কিনেছিলেন এবং গরহীর (তেলিয়াগড়ের) অধিকার ছেড়ে দিয়ে মাহমুদ শাহ বাংলার চাবি শের খানের হাতে হস্তান্তর করেন। মাহমুদের রাজ্যকে পণের অধীনে রেখে বা তার মাথা থেকে রাজমুকুট ছিনিয়ে নিয়ে শের খান এখন গরহীর প্রবেশ দ্বার দিয়ে যেমন খুশি আসা যাওয়া করতে পারেন।[৬০] সারওয়ানী বলেন, 'শের খান এই অর্থ দিয়ে তার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করে বাংলা রাজ্য দখল করেন এবং গরহী পর্যন্ত সব এলাকাই অধিকার করে নেন।'[৬১] সম্প্রতি আবিস্কৃত প্রস্তর লিপির সাথে এই দুই বর্ণনা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের ৯৪৩ হি./১৫৩৬-৩৭ সালের পুর্নিয়া নগরীর প্রস্তর লিপি[৬২] সারওয়ানী ও কানুনগোর ঢালাও মন্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। সুতরাং বলা যায় যে, বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিলেও সুলতান মাহমুদ শাহ এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও ছেড়ে দেননি, গরহী ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা। আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য তার সম্পদ যেহেতু উল্লেখযোগ্য হারে অপচয় হয়ে যাচ্ছিল, তিনি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হন। বিহার থেকে গৌড় পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটিই ১৫২৭ সালে বাবর কর্তৃক খারিদ দখলের অবস্থার মতো হয়ে গিয়েছিল। এই কারনেই আমরা হঠাৎ করেই শের খানের সহযোগিদের ১৫৩৭ সালের শেষ দিকে গৌড়ে দেখতে পাই এবং সুলতান মাহমুদের নিকট বার্ষিক অনুদান চাইতে দেখি যা তিনি কখনোই দিতে সম্মত হননি।

যাই হোক, শের খানকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে সুলতান মাহমুদ শাহ সম্রাট হুমায়ুন[৬৩]-এর কাছে সাহায্যের জন্য তাগাদা পাঠালেন। পর্তুগিজ গর্ভনরের নিকট থেকে একই ধরনের আশায় তিনি মার্টিম এফোনসোর সদিচ্ছাকেও কাজে লাগান। তিনি তাদের সহযোগিতার প্রত্যাশায় থাকলেও তা এতটাই বিলম্ব হতে থাকল যে তিনি হতাশায় প্রায় মুমূর্ষুই হয়ে পড়লেন।[৬৪] তার প্রাণ বায়ু নির্গত হওয়ার মতো উপক্রম হয় আর কি। তিনি রাজধানীর বাইরে থাকা তার সম্পদগুলো গুছিয়ে রাজধানীর প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করলেন। আর এর ফলে রাজধানীর সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। কিন্তু সম্রাট হুমায়ুনকে শের খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে নড়াচড়া করানো গেল না। বাহাদুর শাহ গুজরাটির ছদ্ম-অবাধ্যতা এবং মোগল বিদ্রোহীদের সাথে বিশেষত মির্জাদের সাথে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডই এর কারণ। পূর্ব দিকে শের খান একই কাজ করলেন। তিনি একদিকে হুমায়ুনের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং অন্যদিকে তার গর্ভনর জুনায়েদ বারলা এবং পরবর্তীতে হিন্দু বেগকে ঘুষ দিলেন তার পক্ষে সুপারিশসহ চিঠি লিখতে। বাংলার অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে সুলতান মাহমুদের প্রতিবদন গৌড় অভিমুখে শের খানের অগ্রযাত্রার প্রেক্ষাপটে সুলতান বাহাদুর শাহ গুজরাটির ষড়যন্ত্রের মতো তেমন বিপজ্জনক ছিল না। তাই কানুনগোর[৬৫] ভাষ্য মতে, বাহাদুর শাহকে আরব সাগরের দিকে তাড়ানোর পরও হুমায়ুন শের খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে অনড় ছিলেন। তিনি ১৫৩৬ সালের আগস্ট থেকে ১৫৩৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ে আগ্রায় অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে সাগরে ডুবে বাহাদুর শাহ মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬] সম্রাট হুমায়ুনের নিষ্ক্রিয়তা শের খানকে সাহসী করে তোলে। তিনি চর্তুদিকের পরিস্থিতি সর্ম্পকে সর্তক দৃষ্টি রাখছিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যু, সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য সম্রাট হুমায়ুনকে সুলতান মাহমুদ শাহের রাজি করানো, এবং গোয়ার পর্তুগিজ গর্ভনর নুনো দ্য কুনহার নিকট থেকে সাহায্য প্রাপ্তিতে সুলতান মাহমুদের প্রচেষ্টা শের খানকে তার কার্যক্রম গ্রহণে আন্দোলিত করে। সম্রাট হুমায়ুনের পূর্ব দিকে যাত্রা এবং সুলতান মাহমুদের নিকট পর্তুগিজ সাহায্য পৌঁছার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগেই বাংলায় তার সাফল্যের সুক্ষতা দেওয়ার জন্য শেরখান সূর তার পুত্র জালাল খান ও সেনাধ্যক্ষ খোয়াশ খানকে সুলতান মাহমুদের উপর দ্রুত ও চূড়ান্ত আঘাত হানার নির্দেশ দেন।

শের খান বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন মর্মে সম্রাট হুমায়ুনের নিকট সংবাদ এলে তিনি বাংলা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণে আদেশ জারি করেন।[৬৭] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে শের খানকে পরাজিত করে বাংলার সীমান্তকে তার অধীণে আনতে হবে। চুনার নাকি গৌড় কোথায় প্রথম আক্রমণ করা হবে—এই দ্যেদুল্যমানতায় হুমায়ুন একটি যুদ্ধ পরামর্শ সভা ডাকলেন যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রথমে গৌড় আক্রমণের পক্ষে এবং কনিষ্ঠরা প্রথমে চুনার আক্রমণের পক্ষে মতামত দেন। তিনি আগেও বাংলা এবং গুজরাটের ক্ষেত্রে এমন দোদুল্যমানতায় পড়েছিলেন। সম্রাট অবশ্য কনিষ্ঠদের মতামত সমর্থন করেন। গোপন সূত্রে এই সংবাদ পেয়ে শের খান দ্রুতই চুনার দুর্গ থেকে নারী ও শিশুদের অন্যত্র সরিয়ে নিলেন। যদি মোগলরা দুর্গ দখল করতে আসে তবে পুরুষদের তা দখলে রাখতেও নির্দেশ দেন। তার পুত্র জালাল খান তেলিয়াগড় এবং শিকরিগলি গিরিপথসমূহে প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করেন।[৬৮] শের খান বার্ষিক কর আদায়ের অজুহাতে গৌড় দখলের উদ্দেশ্যে একটি সেনাদল পাঠালেন যদিও গৌড়ের শাসকের সাথে এ ধরনের কোনো চুক্তি ছিল না। দাবিকৃত করের অংক দিতে অস্বীকার করায় শের খান গৌড় অবরোধ করে রাখেন।[৬৯] তাই সুলতান মাহমুদের কাছে কোনো জায়গা থেকে কোনো ধরনের সাহায্য পৌছার আগেই গৌড় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

গৌড় দুর্গের সীমানা প্রাচীর টপকে পার হওয়ার সময় খোয়াশ খান গর্তে পড়ে যান এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। খোয়াশ খানের মৃত্যুর খবর এবং সম্রাট হুমায়ুনের নিকট চুনার দুর্গের পতনের খবর শের খানের কাছে এক সাথে পৌছায়। তৎক্ষণাৎ তিনি খোয়াশ খানের ভাই সাহিব খানকে তার স্থলাভিষিক্ত করে তাকে খোয়াশ খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গৌড় বিজয় ত্বরান্বিত করতে তাকে প্রেরণ করেন। খোয়াশ খান গৌড় দুর্গ অবরোধ করতে ব্যক্তিগত সাহস ও মনোভাব দেখিয়েছিলেন। অবরোধটা ছিল দীর্ঘ। কানুনগোর মতে, শের খান ১৫৩৭ সালের অক্টোবরে বাংলা অভিযান শুরু করেন, ১৫৩৭ সালের ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহে গৌড় দুর্গ অবরোধ করেন যা সেলিমের মতে ১৫৩৮ সালের ৬ এপ্রিল পতন হয়। এত দ্রুত কীভাবে তিনি দুর্গ দখল করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। রিয়াজ বলেন, রক্ষীসেনাদলকে সংকীর্ণ করা হয় এবং নগরীতে খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে।[৭০] যেহেতু সুলতান মাহমুদ শাহ গৌড়ের আশপাশের এলাকার প্রতিরক্ষায় অবহেলা দেখিয়েছিলেন, এই দীর্ঘ অবরোধ এলাকায় খাদ্যশস্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে কারণ খাদ্য শস্যের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করা ছিল। সুতরাং সম্ভবত খাদ্য শস্যের অভাবই সুলতান মাহমুদকে দুর্গটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। সুতরাং বাংলায় ৬ এপ্রিল/১৫৩৮ সাল বা ৬ জিলকদ/৯৪৪ হিজরিতে আফগানদের হাতে গৌড় দুর্গের পতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল।[৭১] দুর্গে প্রবেশ করে জালাল খান ও খোয়াশ খান গণহত্যা, লুটতরাজ ও সেনাদের বন্দি করার কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। বন্দিদের মধ্যে জালাল খানের দুই পুত্রও ছিলেন। শের খানের গৌড় আগমনের পূর্বে সেখানে জালাল খানের সীমাহীন কর্তৃত্ব চলছিল। সুলতান মাহমুদ শাহ পালিয়ে গেলেন। হাজীপুরের দিক পালানোর সময় সম্রাট হুমায়ুনের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় ও প্রচেষ্টায় তিনি শের খান কর্তৃক পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হন। পরাজিত হয়ে আহত অবস্থায় সুলতান মাহমুদ হাজীপুরে পালিয়ে যান এবং তার দূতকে আবারো হুমায়ুনর কাছে প্রেরণ করেন।[৭২] ইতিমধ্যে সম্রাট হুমায়ুন এবং শের খান একটি সমঝোতায় উপনীত হন যে, মোগল জায়গীরদার হিসেবে শের খানের সেবার বিনিময়ে বাংলায় তাকে বিপত্তিহীনভাবে শাসন পরিচালনার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।[৭৩] কিন্তু মানের নামক স্থানে এ সাক্ষাতের সময় সুলতান মাহমুদ শাহ সম্রাট হুমায়ুনকে শের খানের বিরুদ্ধে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হতে রাজি করাতে সক্ষম হন। সম্রাট হুমায়ুনের সাথে গৌড় অভিমুখে যাত্রাকালে খালগাঁওয়ে তিনি তার দুই পুত্রকে আফগানদের দ্বারা হত্যার কথা জানতে পারেন।[৭৪] নিজে আহত হয়ে এবং দুই বন্দিপুত্রের মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। মোগলরা তাকে খালগাঁওয়ে সমাহিত করে।[৭৫]

শের খান বনাম হুমায়ুন

চুনার অধিকারের পর হুমায়ুন বেনারসের দিকে অগ্রসর হন এবং সারনাথে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি শের খানের হাতে গৌড় দুর্গের পতনের কথা জানতে পারেন। জওহর এর ভাষ্য মতে, 'সেখানেই আফগানদের সমবেত হওয়া রোধ করতে হুমায়ুন রোহতাস এর দুর্গ দখলে যান।'[৭৬] রাজকীয় বাহিনী ভারকুণ্ডা দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছালে রাজা ফজল হোসেন তুর্কমান কে হুমায়ুন নিজের দূত হিসেবে শের খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে তাকে তৎক্ষণাৎ বাংলার সম্পদ, মসনদ এবং ছাতা রাজার নিকট দিয়ে রোহতাস দুর্গ ত্যাগ করতে হবে যে সমস্ত এলাকা দখলে নিয়েছে তা ছেড়ে দিতে হবে।[৭৭] শের খান এবং সম্রাট হুমায়ুনের মধ্যে আলাপ আলোচনাকালে গুলবাদন বেগম[৭৮] জানালেন যে গৌড়-বাংলার রাজা আহত ও ফেরারী অবস্থায় এস রাজাকে তেলিয়াগড়ের দিকে অগ্রসর হতে অনুরোধ করেছেন। সম্রাট হুমায়ুন সম্মত হন এবং এখান থেকেই ধাপে ধাপে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। এখান থেকেই সম্রাট হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগ এবং আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে তেলিয়াগড় দখলের জন্য প্রেরণ করেন। এই পরিস্থিতিতে কানুনগোর ভাষ্য হলো, প্রথম বাংলার দিকে হুমায়ুনের অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে তার ও শের খানের মধ্যে সংঘর্ষ ভিন্ন চরিত্র লাভ করে। আনুগত্য প্রর্দশন সত্ত্বেও বাংলা থেকে শের খানকে বহিস্কার করার হুমায়ুনের সংকল্প এবং তার অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে শের খানের পূর্ণ বিনাশ ছাড়া সম্রাটের আর কোনো লক্ষ্য ছিল না।'[৭৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শের খান অনেক আগেই গৌড়ে পৌঁছে যান এবং তার পুত্র জালাল খান, হাজী খান বটনী ও আরো কয়েকজন অমাত্যকে তেলিয়াগড়ের গিরিপথ রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মোগলদের অগ্রবর্তী দল লক্ষ্য করেন যে জালাল খান শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যেই গৌড় দখল করে আছেন। গিরিপথের সামনে মোগলরা ঘাঁটি স্থাপন করে। জালাল খান ঘাঁটিকে শক্তভাবে দুর্গায়িত করেন এবং মোগল বাহিনীকে পিছু হটাতে সচল হন। এই সুযোগে শের খান গৌড় থেকে সম্পদ সরিয়ে ফেলার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন। কানুনগো লিখেছেন, 'শের খান গৌড়ের রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত জিনিষপত্র ও লুটের মালামাল গুছিয়ে সময়মত হুমায়ুনের অলক্ষ্যে সটকে পড়েন। হুমায়ুন গৌড়ে তা সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।'[৮০] পিতার কাছ থেকে তার সাথে শেরপুরে যোগদানের নির্দেশ পেয়ে এক রাত্রে জালাল খান তাঁর বাহিনীসহ গরহী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাবার সাথে শেরপুরে যোগদান করেন। শের খান নিজেকে ঝাড়খণ্ড থেকে রোহতাসে প্রত্যাহার করে নেন এবং সেখানেই (রোহতাসেই) বাংলা থেকে সংগৃহিত লুটের সম্পদ তিনি গচ্ছিত রাখেন।

সম্রাট হুমায়ুন তেলিয়াগড়ের গিরিপথসমূহ মুক্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তা অধিকার করার নির্দেশনা দান করেন। তেলিয়াগড় থেকে মোগলরা ধীরে ধীরে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং চারদিনের মধ্যেই ১৫৩৮ সালের মধ্য-জুলাইয়ে বিজয়ীর বেশে গৌড়ে প্রবেশ করেন। এভাবেই সম্রাট হুমায়ুন শের খানকে বাংলা ছাড়তে বাধ্য করেন। গৌড়ে প্রবেশ করে তিনি জালাল খান কর্তৃক ধ্বংস করা ও পোড়ানো নগরী মেরামত ও পরিচ্ছন্ন করেন। তিনি নগরীর পরিকল্পনায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং নগরীটিকে ' জান্নাতাবাদ' নামকরণ করেন[৮১] এবং প্রদেশটিকে তার অমাত্যদের মধ্যে বিভক্ত করে দেন।

তবে বাংলায় নয় মাস অবস্থানকালে তিনি এমন অলসতায় নিমগ্ন হন এবং আনন্দ ফূর্তিতে মেতে ওঠেন যে একমাসের মধ্যে তাকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। জওহর এর বর্ণনা মতে,[৮২] 'তিনি দায়িত্বহীনভাবে নিজেকে বেশ অনেক সময় ধরে হারেমে আবদ্ধ রেখেছিলেন এবং সব ধরনের আমোদ-প্রমোদে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তাই জুলাই ১৫৩৮ সাল থেকে ১৫৩৯ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত হুমায়ুন গৌড়ে সময়কে অপচয় করেছেন।

১৫৩৮ সালের বর্ষাকালের পর শের খান সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র করতে থাকেন। সমগ্র বিহার উদ্ধার করতে তিনি খোয়াশ খানকে প্রেরণ করেন। সম্রাট হুমায়ুন যাতে শের খানের অজান্তে আক্রমণা না করে বসেন সেজন্য তিনি খোয়াশ খানকে সম্রাটের চলাচলের উপর নজরদারী রাখতে নির্দেশনা দেন। গিরিপথসমূহ পুনঃদখলে, গৌড় ও আগ্রার মধ্যে সব ধরনের যোগাযোগ বিপন্ন করতে এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের লক্ষ্যে শের খান তার সম্পদসমূহ একত্রিত করতে নিজেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিয়োজিত রাখেন। আফগানরা বেনারস অবরোধ করে রাজকীয় গর্ভনরকে হত্যা করে। হৈবত খান, জালাল খান বিন জাল্লু এবং সারমস্ত খান সারওয়ানীরা মোগলদের বাহরাইচ এর বাইরে তাড়িয়ে দেয় এবং কনৌজ থেকে বাহরাইচ ও সম্বল পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি শের খানের দখলে চলে আসে।[৮৩] তিনি শুধু মোগল গর্ভনরদের পরাভূত এবং বহিস্কৃত করেননি বরং সমগ্র এলাকা দখলে এনে রাজস্বও সংগ্রহ করেছিলেন।[৮৪] এছাড়া শের খান জৌনপুরকে খুব কাছাকাছি থেকে ঘিরে ফেলেছিলেন এবং রাজকীয় অতিরিক্ত বাহিনী যারা ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাদেরও পরাজিত করেন।[৮৫] গৌড়ে সম্রাট হুমায়ুনের কাছে কোনো সরবরাহ, কোনো সেনাদল এমনকি কোনো সংবাদ পৌঁছালো না। এখন শের খানকে তার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শেরশাহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো।[৮৬] ১৫৩৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে শের খানের বিজয় সম্পর্কে জানতে গোয়েন্দারা কোনো প্রকারে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয় যা সম্রাট হুমায়ুনের নীরবতা বিঘ্ন করে।

১৫৩৯ সালের প্রথমদিকে সম্রাট বাংলা ত্যাগ করার মনস্থির করেন। জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে তিনি গৌড়ের গর্ভনর নিযুক্ত করেন এবং পাঁচ হাজার সৈন্য রেখে বাংলা ত্যাগ করেন। মানের এলাকা থেকে আগ্রা এবং বক্সারের দিকে যাওয়ার সময় শের খান সম্রাট হুমায়ুনের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেন। ১৫৩৯ সালের বসন্তে হুমায়ুন চৌসার দিকে অগ্রসর হন। আর এখানেই শুরু হয় সম্রাট হুমায়ুন এবং শের খানের মধ্যে বুদ্ধি ও অস্ত্রের যুদ্ধ। উভয়ের মধ্যে চুনার দুর্গ নিয়ে শান্তির আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণে শের খান হঠাৎই মোগল ঘাঁটিতে আক্রমণ করে বসেন। কানুনগো প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন' ১৫৩৯ সালের ২৬ জুন সকালের আনন্দদায়ক ঠান্ডায় মোগল সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠিত হওয়ার জন্য কোনো সময় না দিয়ে শের খান আক্রমণ করে বসেন,[৮৭] পলায়নরত প্রত্যেকেই নিরাপত্তা চাচ্ছিলেন।

কিন্তু চমকটি পরিপূর্ণ ছিল। সম্রাট হুমায়ুন পানিতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।[৮৮] কানুনগোর পর্যবেক্ষণ হলো, 'এই এক আঘাতেই শের খান জয়ী হলেন এবং বাংলা, বিহার রাজ্যছাড়াও জৌনপুরের সারকী রাজ্যও স্বাধীন সার্বভৌম হয় এবং আইনগত ভাবেই তিনি সম্রাটের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন।'[৮৯] চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয়ের সংবাদ বাংলায় পৌঁছালে গৌড়ের মোগল গর্ভনর জাহাঙ্গীর কুলী বেগ তল্পিতল্পাসহ নগরী ত্যাগ করেন এবং আগ্রা যাত্রার উদ্দেশ্যে সেনাদল সহ গারহী আগমন করেন। হাজী খান বটনী এবং জালাল খান বিন জাল্লু তাকে গৌড়ে ঘিরে ফেলেন। নিমাত আল্লার মতে, 'যেহেতু তিনি নিজেকে শক্তভাবে মাটির পরিখায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, আফগানরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়।'[৯০]

সারওয়ানী বলেন, 'শের খান বাঙলার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে ঘিরে রেখেছিলেন। বারবার সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে জাহাঙ্গীর কুলী বেগ যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যান।[৯১] কিন্তু আবুল ফজলের মতে, শের খান ছয় হাজার মোগলদের সাথে জাহাঙ্গীর কুলী বেগকেও হত্যা করেছিলেন। মিথ্যা চুক্তি ও কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা গ্রহণের কথাবলে এই মোগলদের আনা হয়েছিল।[৯২] এভাবেই জাহাঙ্গীর কুলী বেগ যুদ্ধরত অবস্থায় গরহীতে তার সৈন্যদের সাথে মৃত্যুবরণ করেন।

আগে যেমনটা বলা হয়েছে, সম্রাট হুমায়ুনের বাংলা অভিযাত্রার কারণেই শের খানকে গৌড় ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। চৌসার যুদ্ধের পর তাই শের খানের প্রথম উদ্বেগই ছিল মোগলদের নিকট থেকে এটা উদ্ধার করা। কারণ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের নিকট থেকে এটা জয় করতে তাকে যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থশক্তি ব্যয় করতে হয়েছিল। তাই তিনি জালাল খান বিন জাল্লু ও হাজী খান বটনীর মতো দলীয় প্রধানদের অধীনে জাহাঙ্গীর কুলী বেগের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠিয়েছিলেন এবং মুঙ্গের দুর্গ দখলে রাখা খান ই খানান দিলওয়ার খান লোদীর বিরুদ্ধে খোয়াশ খানকে পাঠিয়েছিলেন। মোগলদের সহায়তা করার অপরাধে দিলওয়ার খান লোদীকে হত্যা করার জন্য শের খান নির্দেশ দেন।[৯৩]

শের খান মোগলদের নিকট থেকে ১৫৩৯ সাল/৯৪৬ হিজরিতে পুনরায় বাংলা বিজয় করেন। তিনি খিদির খান সূরকে (সারওয়ানী) বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত করেন। এখন তিনি বাংলা থেকে কনৌজ পর্যন্ত দেশটির মালিক হয়ে গেলেন।

পাদটীকা ও সূত্রসমূহ

১. বাবুর নামা ইংরেজি অনুবাদ এ. এস. বেভারিজ। পুনর্মুদ্রণ দিল্লি ১৯৭৯, পৃ. ৪৮২-৪৮৩

২. রিয়াজ পৃ. ১৩৪

৩. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৩৪

৪. ৯৩৩ হিজরির পর সুলতান নুসরাত শাহের আর কোনো মুদ্রা আবিস্কৃত হয় নাই। এটাই তার মুদ্রার সর্বশেষ তারিখ। সুলতান উপাধি সহ মাহমুদ শাহের ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫ এবং ৯৩৮ হিজরির মুদ্রা পাওয়া যায়। জে.এ.এস.বি-১৮৯৫। পৃ.২১৪-২১৫। ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-ভলিউম-২ পৃ. ১৭৯-১৯০ নম্বর: ২২৩-২২৭। এইচ,বি-২ পৃ. ১৫৯। করিম: ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম-১৯৭৯ পৃ. ৬১ - ৬৪। ভট,শালী বেঙ্গল চিফস স্ট্রাগল ফর ইনডিপেন্ডেন্স, বিপিপি, ৩৮ তম সংখ্যা, ১৯২৯, পৃ.১৭। করিম কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল, ১৯৬০ পৃ. ১৩০-১৩৩। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী, মনোগ্রাফ নং - ৬ পৃ. ১৮

৫. সুলতানী আমল পৃ. ৪২৭

৬. করিম ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম উদ্ধৃত ১৯৭৯ পৃ. ৪৫। করিম কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল, পৃ. ১৩০-১৩৩ তরফদার পরিশিষ্ট- এ পৃ. ৩৫৫

৭. সুলতান নুসরাত শাহের পুত্র সুলতান আলা আল দীন ফিরোজ শাহের মসনদে আরোহণের ব্যাপারে সমসাময়িক ইতিহাসে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু গোলাম হোসেন সেলিম লিখেছেন যে পুত্র বাবার স্থলভিষিক্ত হন এবং তিন বছর রাজত্ব

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছেন। (গোলাম হোসেন সেলিমের রিয়াদ আল সালাতিন ইংরেজি অনুবাদকৃত এ, সালাম, দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৫ পৃ. ১৩৭) রিয়াজ এর উপর ভিত্তি করে লেখা ইতিহাসের লেখক স্টুয়ার্ট বলেন ফিরোজ তিন বছর রাজত্ব করেছেন। সূত্রের স্বল্পতা বা অভাবের কারণে সুলতান আলা আল দীন ফিরোজ শাহ এর রাজত্ব কালের ব্যাপ্তি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কানুনগোর মতে: তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন নুসরাত শাহের হত্যা,তার পুত্র আলা আল দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল এবং নুসরাত শাহের ভ্রাতা গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহেরর মসনদে আরোহণ- এ সব কিছুই ৯৩৯ হিজরিতে সংঘটিত হয়। সূত্র : এ পর্যন্ত আবিস্কৃত মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য। দেখুন : কানুনগো : পৃ. ১১৪-১১৫

সুলতান আল আল দীন ফিরোজ শাহ কর্তৃক ৯৩৮ হিজরিতে জারিকৃত দুইটি মুদ্রা ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এর উপর ভিত্তি করে মমতাজুর রহমান তরফদার ফিরোজের রাজত্বকাল ও সুলতান নুসরাত শাহের মৃত্যুর তারিখ সর্ম্পকে মতভেদ কমিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। (দেখুন তরফদার পৃ. ৮০-৮২। জেএএসপি ৪র্থ খণ্ড ১৯৫৯ পৃ. ১৭৮-১৮০) তার মতে আলা-আল দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল ৯৩৮ এবং ৯৩৯ হিজরি মোতাবেক ১৫৩১ ১৫৩২ এবং ১৫৩২-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পড়ে। যেহেতু হিজরি ৯৩৮ সাল শুরু হয় ১৫৩১ সালের আগষ্টে এবং ১৫৩২ সালের আগষ্টে শেষ হয় এবং যেহেতু ফিরোজের কালনা শিলালিপির তারিখ ১লা রমজান ৯৩৯ হিজরি মোতাবেক ২৭ মার্চ ১৫৩৩ খ্রি. তাই ফিরোজ ৯৩৮ হিজরিতে মুদ্রাটি জারি করেন এবং ৯৩৯ হিজরিতে নয় মাস রাজ্য শাসন করেন যদিও তিনি ৯৩৯ হিজরির শেষ মাসে মসনদে আরোহণ করেন বলে ধরে নেওয়া যায়। এই মতামতের সমর্থন পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিল্টনের পাণ্ডুয়া পাণ্ডুলিপিতে যেখানে তিনি বলেছেন, নুসরাতের ছেলে ফিরোজ শাহ নয় মাস রাজ্য শাসন কালে তার চাচা মাহমুদ শাহ কর্তৃক নিহত হন। (জে.এ.এস.পি, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৫৯, পৃ. ১৭৯- ১৮০)

৮. রিয়াজ আঃ সালাম কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ পৃ. ১৩৭

৯. পূর্বোল্লিখিত পৃ. ১৩৮

১০. এইচ বি ২য় খণ্ড পৃ. ১৫৯- ১৬০

১১. সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৫৯-৬০। ফার্সী উদ্ধৃতি...

১২. নিমাত আল্লা : ১ম খণ্ড পৃ. ১৭৬-১৭৭। ফারসি উদ্ধৃতি

সারওয়ানী উল্লেখ করেছেন যে বিহার দখলের জন্য এবং শের খানের হাতে ১ম যুদ্ধাভিযানে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যে জেনারেলদের প্রেরণ করেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাখদুম ই আলমকে দমনের জন্য বাংলার যে সৈন্যদল প্রেরণ করা হয় তা কার নেতৃত্বে পাঠানো হয় তা উল্লেখ করা হয় নি। তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে বাংলার রাজা মখদুম ই আলমের বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠিয়েছিলেন। সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৬১। দাউদী : পৃ. ১১৬। তিনি লিখেছেন ফার্সি উদ্ধৃতি...

১৩. কানুনগো পৃ. ১১৪- ১১৫। যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুলতান আলা আল দীন ফিরোজ শাহ অন্তত নয় মাস রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। সুতরাং ফিরোজ মাত্র তিন মাস রাজ্য শাসন করেছিলেন মর্মে কানুনগোর উক্তি স্পষ্টতই ভুল

হুসাইনাবাদ টাঁকশাল থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের নামে জারিকৃত ৯৩৯ হি/ ১৫৩২ - ১৫৩৩ খ্রি: এর টাকার উপর ভিত্তি করে কানুনগো উপসংহার টেনেছেন যে নুসরাত শাহের বাবা হুসান্ শাহের সময় থেকেই হুসেইনাবাদ বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টাকশাল নগরী। হুসেন শাহ রাজদরবার গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তর করেন। একডালা মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া থেকে ২৩ মাইল উত্তরে এবং গৌড় থেকে ৪২ মাইল উত্তরে উত্তর-বাংলার দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। সম্ভবত সুলতান আল আল দিন হুসেন শাহ একডালার নুতন নাম হুসেইনাবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং মাখদুম-ই আলম যে যুদ্ধে নিহত হন তা এরই নিকটে কোথাও ঘটেছিল। কানুনগো : পৃ. ১১৩ পাদটীকা। ফার্সি ঐতিহাসিক নিমাত আল্লা (১ম খণ্ড পৃ. ১৭৬-১৭৭) এবং দাউদি (পৃ. ১১৬) উভয়ই মত প্রকাশ করেছেন যে বাংলার রাজা মাখদুম ই আলমকে হত্যা করে বিহার দখলের জন্য কুতুব খানকে নিযুক্ত করেন কিন্তু সারওয়ানীর মতে (১ম খণ্ড পৃ. ৬১-৬২) বিহারে বাংলার সেনাদলের পরাজয়ের পর তিনি মাখদুম ই আলমের বিরুদ্ধে একটা অভিযান প্রেরণ করেন। রিয়াজ এর মতে, সুলতান নুসরাত শাহ নিহত হওয়ার পর আলা-আল দীন ফিরোজ শাহকে মসনদে বসানো হয়েছিল অমাত্যদের পরামর্শ অনুযায়ী। তার পর তিনি লিখেছেন সুলতান মাহমুদ সুযোগ পেয়ে ফিরোজ শাহকে হত্যা করে এবং বাবার উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হাজীপুরের গভর্নর এবং তার ভায়ের শ্যালক মাখদুম ই আলম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিহারে শের খানের সঙ্গে সমঝোতা গড়ে তোলেন। মুঙ্গের এর শাসক কুতুব খানকে সুলতান মাহমুদ শাহ নিযুক্ত করেন বিহার জয় এবং মাখদুম ই আলমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। (রিয়াজ: পৃ. ১৩৭- ১৩৮) এ সকল তথ্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে সুলতান নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর ১. অমাত্যরা সিংহাসনে আরোহণ প্রশ্নে বিস্তারিত মত বিনিময় করেন। ২. তাদের মতে তারা বিভক্ত ছিলেন ৩. মখদুম ই আলম সকল মতের উদ্ধে উঠে প্রয়াত সুলতানের পুত্র আল-আল দীন ফিরোজকে সিংহাসনে বসান। পরে মাখদুম তার প্রশাসনিক সদর দপ্তরে ফিরে যান। ৪. মাহমুদ শাহ রাজদরবার থেকে দুরে সম্ভবত বাংলায় ছিলেন যেখান থেকে তিনি সুলতান নুসরাত শাহের সাথে একই সময়ে মুদ্রা জারি করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনের প্রত্যাশী ছিলেন। যখন ফিরোজকে সিংহাসনে বসানো হয় তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। রাজদরবারের রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন বলে মনে হয়। যখন ফিরোজ একডালায় একা ছিলেন এবং মাখদুম তার সদর দপ্তর হাজীপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, তখন একবার একটা সুযোগ পেয়ে মাহমুদ হুসেইনাবাদ (একডালা) ছুটে যান, আলা-আল দীন ফিরোজকে হত্যা করেন এবং উত্তরাধিকারী অধিকারে সিংহাসন আরোহণ করেন। মুঙ্গের এর সেনাধ্যক্ষের তার প্রতি সমর্থন ছিল। সুলতান মাহমুদ শাহকে সার্বভৌম রাজা হিসেবে মেনে নিতে মাখদুম ই আলম অস্বীকৃতি জানালে তিনি মুঙ্গের এর সেনাধ্যক্ষ কুতুব খানকে মাখদুম ই আলম হত্যার জন্য এবং বিহার জয়ের জন্য নিযুক্ত করলেন। সুতরাং বলা যায় কুতুব খান মাখদুম ই আলমকে হাজীপুরেই দমন ও হত্যা করেন ; একডালায় নয়। কানুনগো তেমনটিই মনে করেন

১৩. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড - পৃ. ৬১-৬২। ফার্সি উদ্ধৃতি...

১৬. উপরোল্লিখিত পৃ. ৬১-৬২। পাদটীকা ১ ও ৪। ফার্সি উদ্ধৃতি...। ইমামুদ্দিন কর্তৃক সারওয়ানীর তারিখ ই শেরশাহী গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ২য় খণ্ড। পৃ. ৬১ পাদটীকা ৪, পৃ ৬২, পাদটীকা-১। আমি ১৯৬০ সালে ঢাকাতে প্রকাশিত ইমামুদ্দিন সম্পাদিত নিমাত আল্লার তারিখে খানজাহানী ওয়া মাখজানে আফগানী, গ্রন্থে উপরোক্ত উদ্ধৃতি পাইনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭. বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে লুটতরাজ, বিবাহ বন্ধন এবং সুলতান বাহাদুর শাহ গুজরাটির নিকট থেকে যেভাবে শের খান তার সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তাতে এটার সম্ভাবনাই বেশি যে মখদুম ই আলম তার অর্থের লোভ দিয়ে শের খানকে তার সাথে সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দেখুন কানুনগো, পৃ-১১৪

১৮. সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৬২। কানুনগো-পৃ. ১১৪। ঈশ্বরী প্রসাদ এর দি লাইফ এন্ড টাইমস অব হুমায়ুন কোলকাতা -১৯৫৬, পৃ. ১০৯-১১৮

১৯. কানুনগো পৃ. ১১৪। পাদটীকা ২, পৃ. ১১৩ দেখুন

২০. কানুনগো পৃ. ১১৫। রিয়াজ পৃ. ১৩৮। তরফদার পৃ. ৭৯-৮০ জেএএসপি ৪র্থ খণ্ড, ১৯৫৯: পৃ. ১৭৮-১৮০

২১. সারওয়ানী ১ম খণ্ড পৃ. ৬০

২২. দাউদী পৃ. ১১৬। ফার্সি উদ্ধৃতি...

২৩. সারওয়ানী : ২য় খণ্ড পৃ. ৪৫

২৪. কানুনগো পৃ. ১১৬। লোহানী ও নুহানী সমার্থক শব্দ হওয়ায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা শব্দটি ইচ্ছামত ব্যবহার করেছেন

২৫. উপরোল্লিখিত পৃ. ১১৮

২৬. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ৫২

২৭. উপরোল্লিখিত পৃ. ৫২

২৮. উপরোল্লিখিত পৃ. ৫২

২৯. কানুনগো পৃ. ১৩৫-১৩৬

৩০. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৫১

৩১. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ৫৩

৩২. বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজি অনূদিত আকবর নামা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮

৩৩. কানুনগো পৃ. ১৩৮-১৩৯, পাদটীকা-২

৩৪. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ৫৪

৩৫. উপরোল্লিখিত ২য় খণ্ড পৃ. ৫৬

৩৬. উপরোল্লিখিত ২য় খণ্ড পৃ. ৫৬

৩৭. উপরোল্লিখিত ২য় খণ্ড পৃ. ১৪২

৩৮ কানুনগো পৃ. ১৪৪, ১৭০, ১৭১

৩৯. সারওয়ানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬। ২য় খণ্ড পৃ.৬৯। ফার্সি উদ্ধৃতি...। এবং অন্য সকল উচ্চ পদস্থ আফগান কর্মকর্তারা তার সাথে যোগদেন এবং তিনি হযরত-ই-আলা উপাধি ধারণ করেন

৪০. কানুনগো পৃ. ১৪২

৪১. উপরোল্লিখিত : পৃ. ১৪৪

৪২. উপরোল্লিখিত : পৃ. ১৫৮-১৫৯। কানুনগো চিহ্নিত করেন রেনেল এর মানচিত্র পয়েন্টিসহ ফেরান্দাজ নগরী। গরহী বা তেলিয়াগড় থেকে নদীর অপর পারে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর দশ মাইল উত্তরে নগরীটি অবস্থিত। পয়েন্টি গৌড় থেকে ৫০ মাইল দূরে দক্ষিণে অবস্থিত এবং তখনকার সময়ে রাজপথ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংযুক্ত ছিল। আর তাই, মুঙ্গের শহর, ভাগলপুর এবং খালগাঁও অতিক্রম করে বিহার থেকে বাংলায় আসার সংক্ষিপ্ততম ও সুবিধাজনক পথটি গরহীর গিরিকন্দরে প্রবেশ করে যা তখনকার সময়ে বিহারের অংশে তেলিয়াগড়ের ব্যাপক দুর্গায়ন দ্বারা সুরক্ষিত। পথটি আবার পশ্চিম বঙ্গের সংকীর্ণ গলির, যা শিকারগলি নামে পরিচিত, সমতলে এসে আবির্ভুত হয়েছে। শিকরিগলি থেকে রাস্তাটি গঙ্গা নদীর প্রবাহ অনুসরণে পূর্ব থেকে সরাসরি দক্ষিণ কোনো বরাবর্র এবং তার পর পশ্চিম তীর বরাবর চলেছে। পশ্চিম দিকে তেলিয়াগড়ের দুর্গটি–যার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃশ্যমান–রাস্তাটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে গিরিকন্দরের মুখে দণ্ডায়মান। একদিকে রাজমহল বনাঞ্চলের ছোটো ছোটো দূর্ভেদ্য পর্বতমালা যা সানখান প্রদেশ অভিমুখে ৮০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত এবং বাংলার বীরভূম জেলার উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু পার্বত্য গিরিকন্দরের ঠিক নীচেই তেলিয়াগড়ের উত্তর দিকের চক্রাকার খানার মতো গঙ্গা নদী আবারও পূর্ব দিকে দ্রুত চক্রাকার পরিখার মতো প্রবহমান। বাংলার শাসক গরহীর পুরো গিরিকন্দর বরাবর গঙ্গা নদীর অপর পাড়ে দুর্গায়ণ করেছিলেন যা পয়েন্টিতে এসে মিশেছে। তখনকার দিনে পয়েন্টি থেকে গৌড় অভিমুখে একটি রাজকীয় পথ ছিল। গরহী ছিল একটি অবস্থান যা ঝড়ের বেগে ধ্বংস করা যায় না আবার কাছ থেকে ঘেরাও করাও যায় না বিশেষত সেই সময়ে যখন আক্রমণের উপাদান সমূহ থেকে প্রতিরক্ষার উপাদান সমূহ শক্তিশালী।

৪৩. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৪৭

৪৪. আকবর নামা ১ম খণ্ড পৃ. ৩২৮

৪৫. আলম খান নিজেই সুলতান আলা আল দীন আলম খান লোদী উপাধি ধারণ করেন। তিনি ছিলেন সুলতান সিকান্দার লোদীর ভাই। বাবর তাতার খান লোদীকে বাদাখশানের কিলা-ই-জাফর দুর্গে বন্দি করে রাখেন কিন্তু তাতার খান বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যান। সুলতান বাহাদুর শাহের অধীনে যখন গুজরাটের রাজদরবার মোগল বিরোধিদের আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়, তখন তাতার খান লোদী সুলতানের কাছে সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হস্তক্ষেপ কামনা করেন। যাই হোক, ১৫৩৪ খ্রি. মান্দরাইলে তাতার খানকে মোগলরা হত্যা করে। মান্দরাইল আগ্রা জেলার কারনাল থেকে ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ঈশ্বরী প্রসাদ দি লাইফ এন্ড টাইমস অব হুমায়ুন। কোলকতা-১৯৫৬ পৃ-৬৬-৬৯ কানুনগো পৃ. ১৪৭

৪৬. ঈশ্বরী প্রসাদ দি লাইফ এন্ড টাইমস অব হুমায়ুন, কোলকাতা-১৯৫৬, পৃ.৭২ পাদটীকা-২। ভারত বর্ষের প্রাক্তন গোয়ালিয়র রাজ্যের সিপরা নদীর তীরে মালওয়ার উত্তর পশ্চিমে মান্দাসর অবস্থিত

৪৭. সম্রাট হুমায়ুন এবং সুলতান বাহাদুর শাহের পরস্পর বৈরী সামরিক বাহিনী ১৫৩৫ সালের মার্চে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কানুনগোর মতে, তখন শেরশাহ বাংলার বিরুদ্ধে ১৫৩৫ সালের মে মাসে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সূচনা করেন। সুতরাং ১৫৩৫ সালের মে মাসের আগেই কুতুব খান হুমায়ুনের পক্ষ ত্যাগ করেন। সম্রাট হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে তিনি ঐ পলায়নের কথা ভুলে যান বলেই মনে হয়। কানুনগো পৃ. ১৫০

৪৮.সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৯. রিয়াজ আব্দুস সালাম কৃত ইংরেজি অনুবাদ। পৃ. ১৩৮। রিয়াজ কোনো তারিখের উল্লেখ নেই

৫০. কানুনগো পৃ. ১৫১

৫১. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৫১

৫২. ক্যাম্পোস পৃ. ৩৮। কানুনগোর মতে, সুলতান মাহমুদের নিকট একটা কোনো অস্বাভাবিক শক্তির বৃদ্ধি ছিল না। কারণ পর্তুগিজরা যদিও বিশ্বাসভঙ্গকারী এবং উচ্ছৃঙ্খল তথাপিও তখনকার সময়ে তারাই সবচেয়ে ভাল বরকন্দাজ (বন্দুক চালক) এবং বীর যোদ্ধা। কানুনগো পৃ. ৫৬

৫৩. রিয়াজ পৃ. ১৩৮-১৩৯

৫৪. ক্যাম্পোাস পৃ. ৩৮

৫৫. দাউদি পৃ. ১১৮-১১৯। ফার্সি উদ্ধৃতি

৫৬. নদীয়া অভিযানে মাহমুদ বখতিয়ার খলজি এই পথ অনুসরণ করেন। এইচ,বি-২য় খণ্ড পৃ. ৬ পাদটীকা : ১ জেএএসবিডি-১৯৭৯-১৯৮১-২৪-২৬ খণ্ড, পৃ. ১- ১০
একই ভাবে ১৬৫৯ সালে শিবগঞ্জের নিকট গুজার বাহিনীকে উৎখাত করতে মীর জুমলা এই জঙ্গলের পথ অনুসরণ করেছিলেন। এইচবি-২য় খণ্ড, পৃ. ৬ ও ৩৩৯

৫৭. আকবর নামা ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪

৫৮. কানুনগো পৃ. ১৬০

৫৯. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৬১-১৬২

৬০. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৬২

৬১. সারওয়ানী ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩

৬২. কেয়ামুদ্দিন আহমদ কর্পাস অব দি এরাবিক এন্ড পার্সিয়ান ইনস্ক্রিপশনস অব বিহার, পাটনা, ১৯৭৩ পৃ. ১১৬-১১৮। শিলালিপিটি একটি মসজিদের আঙ্গিনা থেকে পাওয়া যায়। মসজিদটি পূর্নিয়া নগরীর কেওনলাপুর মহল্লার মীর নায়ের আলীর বাসা সংলগ্ন।

৬৩. আকবর নামা ১ম খণ্ড পৃ. ৩২৮

৬৪. ক্যাম্পোস পৃ. ৩৬-৪০

৬৫. কানুনগো পৃ. ১৬৯

৬৬. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৬৯

৬৭. আকবর নামা ১ম খণ্ড পৃ. ৩২৬

৬৮. কানুনগো পৃ. ১৭৩। যদিও সারওয়ানী বলেন যে শের খান বঙ্গ বিজয়েরর জন্য তার পুত্র জালাল খান, জ্যৈষ্ঠ খোয়াশ খান এবং অন্যান্য অমাত্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন কিন্তু কানুনগো বিশ্বাস করেন যে শের খান ব্যক্তিগতভাবে নিজেই গৌড় দখলে সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তিনি (শের খান) জালাল খান এবং খোয়াশ খানের সেনাদলকে গৌড় অভিযানে সম্মিলিত হওয়ার নির্দেশনা দেন। সম্ভবত ১৫৩৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গৌড় অবরোধ শুরু হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই শের খান অবরোধের কার্যক্রমটি জালাল খান এবং খোয়াশ খানের যৌথ কমান্ডের উপর ছেড়ে নিজে চুনারে আগমন করেন।

৬৯. ক্যাম্পোস পৃ. ৪০

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭০. রিয়াজ পৃ. ১৩৯

৭১. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৩৯-১৪০

৭২. ক্যাম্পোস পৃ. ৪১। জওহর: তাজকিরাতুল ওয়াকিয়া, চার্লস স্টুয়ার্ট কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৪, পৃ. ১১। সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ৮০-৮১

৭৩. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ৮০-৮১

৭৪. রিয়াজ পৃ. ১৪১-১৪২, ক্যাম্পোস পৃ. ৪১

৭৫. উপরোল্লিখিত : পৃ. ১৪১ -১৪২

৭৬. জওহর তাজকিরাতুল ওয়াকিয়া, ইংরেজি অনুবাদ, চার্লস স্টুয়ার্ট, পুনর্মুদ্রণ, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৪, পৃ. ১০

৭৭. উপরোল্লিখিত : পৃ. ১০

৭৮. গুলবাদান বেগম হুমায়ুন নামা, বেভারিজ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি ১৯৭২, পৃ. ১৩৩। তিনি বলেন, মহামান্য সম্রাট যখন এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন তখন গৌড় বাংলার রাজা তার নিকট আহত ও পলাতক অবস্থায় উপস্থিত হন। এজন্য তিনি (শের খানের প্রতি) কোনো মনোযোগ দিতে পারেননি এবং গৌড় বাঙ্গালার দিকে যাত্রা করেন। (শের খানের প্রতি) জানতেন যে মহামান্য সম্রাট সেখানে গিয়েছিলেন এবং নিজেও বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সেখানে পুত্র জালাল খান এবং তার চাকর খোয়াশ খানের সাথে মিলিত হন। উভয়ে আসলেন এবং গরহী দখল করেন।

৭৯. কানুনগো পৃ. ১৮৪-১৮৫

৮০. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৮৯

৮১. গুলবাদান বেগম হুমায়ুন নামা ইংরেজি অনুবাদ বেভারিজ। পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৭২, পৃ. ১৩৪

লক্ষণাবতীকে জান্নাতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবুল ফজলের মতে মোগল সম্রাট হুমায়ুন লক্ষ্মণাবতীকে জান্নাতাবাদ নামকরণ করেছেন। কিন্তু সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের জান্নাতাবাদ টাঁকশাল থেকে জারিকৃত মুদ্রা আবুল ফজলের মতকে ভুল প্রমাণিত করে। আগের রুটিন আল দীন বারবাক শাহের একটি মুদ্রায় লেনপুলের জান্নাতবাদ নামটি উদ্ধার সমগ্র বিষয়কে সন্দেহের আর্বতে ফেলে দিয়েছে। দেখুন করিম কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল বইটি, ঢাকা-১৯৬০,পৃ. ১৬১

৮২. জওহর তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত চার্লস ষ্টুয়াট কৃত ইংরেজি অনুবাদ, লক্ষ্ণৌ ১৯৭৪ পৃ. ১২। কানুনগো বলেন বলা হয়ে থাকে যে গৌড়ের রাজপ্রসাদকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর অবস্থায় রেখে শেরশাহ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। প্রাসাদকে তিনি আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করেন সুলতান মাহমুদের হারেম থেকে ১০০০০ (দশ হাজার) সুন্দরী নারী জড়ো করে। এই নারীরা সম্ভবত সম্রাটের জন্য রাজকীয় উপহারের এক পঞ্চমাংশ হিসেবে প্রাপ্ত। অর্থাৎ মশা ও মহামারীর আক্রমণ সত্ত্বেও মোগলরা গৌড়ের স্বর্গের বিভিন্ন উপকরণ ভোগ করার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। কানুনগো পৃ. ১৮৯

৮৩. উপরোল্লিখিত পৃ. ১২

৮৪. সারওয়ানী ২য় খণ্ড। পৃ. ৮৮-৯০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮৫. ঈশ্বরী প্রসাদ দি লাইফ এন্ড টাইমস অব হুমায়ুন, কোলকাতা ১৯৫৬, পৃ. ১২২।

৮৬. জওহর: তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত চার্লস স্টুয়ার্ট কৃত ইংরেজি অনুবাদ, লক্ষৌ, ১৯৭৪ পৃ. ১৪। উলসলে হেগের দি ক্যাম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি ১৯৭৩ ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩১ পরিশিষ্ট দেখুন

৮৭. কানুনগো : পৃ ২০৪

৮৮. জওহর তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত চার্লস স্টুয়ার্ট কৃত ইংরেজি অনুবাদ, লক্ষৌ ১৯৭৪ পৃ. ১৭

৮৯. কানুনগো : পৃ ২০৫

৯০. নিমাত আল্লা ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫। তিনি বলেন, "ফার্সি উদ্ধৃতি"

৯১. সারওয়ানী : ২য় খণ্ড , পৃ. ১০৪

৯২. আকবর নামা ১ম খণ্ড ,পৃ. ৩৪৫

৯৩. কানুনগো : পৃ. ২১৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

শেরশাহ সূরের বংশ

৬ এপ্রিল ১৫৩৮ খ্রি./ ৯৪৪-৪৫ হিজরিতে[১] শেরশাহ গৌড় বিজয় করেন কিন্তু একই বছর জুলাই এর মাঝামাঝি সময়ে মোগল সম্রাট হুমায়ুন তাকে গৌড় ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন।[২] অবশ্য ১৫৩৯ খ্রি./ ৯৪৬ হিজরি[৩]-তে শেরশাহ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে গৌড় পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন। তিনি ১৫৪০ খ্রি./৯৪৭ হিজরি[৪]-তে আবারো হুমায়ুনকে বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং দিল্লিতে সূর আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার উপর শেরশাহের কর্তৃত্বের সুসংহতকরণ বিষয়টি সমসাময়িক এবং আধুনিক কোনো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিই তেমন আকর্ষণ করেনি। তারা এই বিষয়টির উপর প্রায় কিছুই লেখেননি বরং ভারতের প্রেক্ষাপটে শেরশাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা সবাই এটা নিশ্চিতভাবে ধরেই নিয়েছেন যে গৌড়ের রাজধানী নগরী দখলের মধ্য দিয়ে পুরো বাংলাই শেরশাহের প্রকৃত (lpso facto) নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। উদাহরণস্বরূপ, নিমাত আল্লার কথায় "তিনি (শেরশাহ) পুরো বাংলাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়ে আসেন এবং তার কর্তৃত্ব সুসংহত করেন।"[৫] আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কানুনগোর মতে বাংলার উপর নতুন করে নিজ শাসন ক্ষমতা ঘোষণার জন্য শেরশাহ ১৫৩৯ খ্রি./৯৪৬ হিজরিতে চৌসার যুদ্ধের পর গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুরো প্রদেশের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য খুব বেশি সময়ও দেননি। এমনকি তিনি বাংলা দখলের জন্য বড় একটা সেনাদলও রেখে যাননি। অথচ পর্তুগিজদের কার্যকরভাবে দেশ থেকে বিতাড়ণের লক্ষ্যে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর এবং সাতগাঁও (পশ্চিমবঙ্গ) এর উপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেন।[৬]

নীরোদ ভূষণ রায় (এন.বি.রায়) বিশ্বাস করেন যে, শেরশাহ চৌসার যুদ্ধের পর মোগল ভট্টরায় এর সাথে আলোচনার জন্য বাংলার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তার মতে, গৌড়ের পতন ও জাহাঙ্গীর কুলির হত্যাকাণ্ডের পরপর দেশের বিভিন্ন অংশে মোগল সেনাঘাঁটির পতন ঘটেছিল। তখনও পর্তুগিজদের গোপন সম্মিলনস্থল চট্টগ্রাম বন্দর সৈয়দ মাহমুদ শাহ, খুদা বক্স খান এবং আর্মীর্জা(?) খানদের কর্মকর্তাদের দখলে ছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নোগাজিল (নওয়াজিশ) নামে শেরশাহের একজন সহচর স্থানটি দখল করে নেন। কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন চট্টগ্রামে পর্তুগিজ উপনিবেশ প্রধান নুনো ফার্নান্দেজ ফ্রেইরের বন্দি। নোগাজিল পরবর্তীকালে পালাতে সক্ষম হন এবং শীতের শেষে পর্তুগিজ এডমিরাল সাম্পায়োকে পেগুতে প্রত্যাহারের পর

~ www.amarboi.com ~

আবার বন্দরটি অধিকার করেন। এভাবেই চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, ফরিদাবাদ এবং গৌড় নিয়ে গঠিত শেরশাহের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৭]

উপরোল্লিখিত পণ্ডিতবর্গ বাংলার উপর শেরশাহের কর্তৃত্বের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য করতে ইতস্তত বোধ করেছেন। মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচয়িতারা মনে করেন যে গৌড় দখলের সাথে সাথে পুরো বাংলা শেরশাহের কাছে ধরাশায়ী হয়ে যায় এবং কোনো মহল থেকেই কোনো বাধা আসেনি। কানুনগো এবং নীরোদ ভূষণ রায়ের মতো আধুনিক পণ্ডিতেরা এ ধরনের অযাচাইকৃত মন্তব্য করেননি। একইভাবে তারা বাংলার দূরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলসমূহের জয়ের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কেও তেমন কোনো মন্তব্য করেননি। সেজন্যই কানুনগো মন্তব্য করেছেন যে পুরো প্রদেশে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শেরশাহ সময় অথবা বিশাল বাহিনী কোনোটিই ব্যবহার করেননি। কিন্তু এই মন্তব্যে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং সাথে সাথে বলেছেন 'পর্তুগিজদের কার্যকরভাবে দেশ থেকে বিতাড়ণের লক্ষ্যে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর ও সাতগাঁও (পশ্চিমবঙ্গ) এর উপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেন। নীরোদ ভূষণ রায় ও একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাই চট্টগ্রামের অবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। চট্টগ্রামের অবস্থা সম্পর্কে পর্তুগিজ বিবরণীতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

পণ্ডিতবৃন্দের লেখার মধ্যে এই শূন্যতার কারণ হিসেবে উৎস ও উপাদানের শূন্যতা মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলায় শেরশাহের শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করার বিষয়ে উৎস উপাদানের মোটেই ঘাটতি ছিল না। এমন কি এগুলো কানুনগো ও এন.বি.রায়ের সময়েও প্রাপ্য ছিল। যে কোনো কারণেই হোক পণ্ডিতেরা এগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। যে সকল উৎস উপাদান বাংলার শেরশাহের শাসন সুসংহত করার ইতিহাস পুনঃনির্মাণে সহায়তা করতে পারে সেগুলো হচ্ছে :

ক.. সুলতান বারবাক আল দুনিয়া ওয়াল দিন বিন হুমায়ুন শাহ নামে জনৈক সুলতানের ৯৪৯ হিজরি তারিখ সম্বলিত মুদ্রা

খ. ফজল গাজীর কামানের গায়ে উৎকীর্ণ ৯৪৯ হিজরি তারিখ লিপি

গ. শেরশাহের চট্টগ্রাম অভিযান বিষয়ে পর্তুগিজ বিবরণী

ঘ. সৈয়দ বংশীয় মৃত সুলতান মাহমুদ শাহের এক কন্যার সাথে খিদির খানের বিবাহ এবং তার বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড

ঙ. সুলতান মাহমুদ শাহের আর এক জামাতার অবস্থান

চ. শেরশাহের টাকশাল নগরী

ছ. সোনারগাঁ কে লাহোরের সাথে সংযোগকারী শেরশাহের গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড

জ. শেরশাহের নামানুসারে বাংলার বিভিন্ন স্থানের নামকরণ

ঞ. আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত বাংলার ১৯টি সরকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেরশাহ ৯৪৫-৯৫২ হিজরি/১৫৩৮-১৫৪৫ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এই হিসেবে তাঁর সিংহাসন আরোহণ তার প্রথম গৌড় বিজয়ের পর ৯৪৪-৪৫ হিজরি/এপ্রিল ১৫৩৮ সাল হতে পারে বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু ৯৪৭ হিজরি/১৫৪০ সালের পূর্বে তিনি বাংলার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করতে পারেননি। এই বছরেই তিনি সম্রাট হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন এবং সমগ্র দিল্লি সাম্রাজ্যে তার প্রশাসনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তভাবে কাজ করা শুরু করেন। প্রায় দু'বছরের (১৫৩৮-১৫৪০) মধ্যবর্তী সময়ে ১৫৩৮ সালের জুলাই মাসে হুমায়ুন কর্তৃক শেরশাহকে বাংলা থেকে বিতাড়ণ এবং ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধের পর শেরশাহ কর্তৃক গৌড় পুনঃদখলের ইতিহাস পাওয়া যায়। মহা উৎকণ্ঠার মধ্যবর্তী এই দুই বছরে তিনি বাংলার প্রশাসনকে সুদৃঢ় করতে দৃষ্টি দিতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে; যদিও এটা সত্য যে চৌসার যুদ্ধের পর এবং দ্বিতীয়বার গৌড় বিজয়ের পর তিনি খিদির খানের মাধ্যমে বাংলাকে শাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যতি তাই হয়ে থাকে তাহলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না যে ৯৪৭ হিজরি থেকে অর্থাৎ সম্রাট হুমায়ুনের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর বাংলার প্রকৃত প্রশাসনিক সুদৃঢ়করণ শুরু হয়েছিল।

এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ (Outlying parts) নিশ্চুপ ছিল না। নদীনালা বেষ্টিত, অশ্বারোহীদের জন্য অনুপযুক্ত এবং দুইশত বছরের স্বাধীনতা ভোগকারী বিশাল এক দেশ বাংলা এত সহজে আফগান বিজেতার, যিনি তার সাফল্যের ফসল কর্তনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাংলায় অবস্থান করেন না, কাছে পরাভব মানার নয়। এই ঘটনাবলী বাংলার উপর শেরশাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করে এবং এই ঘটনাবলী নির্ভূলভাবে প্রমাণ করে যে যদিও শেরশাহ পরিশেষে সমগ্র বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাকে সেজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

যাই হোক, খিদির খান সুর্ককে হাকিম (প্রশাসক) নিযুক্ত করার মধ্যদিয়ে শেরশাহ বাংলায় তার শাসনকার্যের সুচনা করেন। চৌসার যুদ্ধের পর শেরশাহ দ্রুত গৌড় ফিরে যান এবং এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শেরশাহ নাকি সম্রাট হুমায়ুন কে কার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে সে ব্যাপারে যদিও অবস্থা তখন অননুমেয় ছিল, তথাপিও তাঁকে তার পশ্চাৎপদ অবস্থান থেকে শত্রুদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল এবং এটাও নিশ্চত করতে হয়েছিল যে ভবিষ্যতে যে কোনো মোকাবিলায় বাংলা থেকে কেউ যেন তার বিরুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে সমর্থন দিতে না পারে। সুতরাং শেরশাহের বাংলায় ছুটে আসা, গৌড় গমনাগমনের সমগ্র পথকে শত্রুমুক্ত করা ও দখলে রাখা এবং রাজকীয় উপাধি শাহ আলম ধারণ করার সম্ভাবনা খুবই বেশি। পশ্চিম দিক যাওয়ার পথে তিনি খিদির খান সুর্ককে গৌড়ে তার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খিদিরখান সুর্ক এর নিযুক্তির পর বাংলায় শেরশাহের কর্তৃত্ব ভালভাবে শুরু হয়। বাংলার টাকশাল থেকে জারিকৃত এবং অদ্যবধি আবিষ্কৃত শেরশাহের শাসনকালের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলার কিছু অংশ আগে থেকেই তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিভিন্ন টাকশাল থেকে জারিকৃত নিম্নের মুদ্রাসমূহ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।[৯]

	টাকশাল	তারিখসমূহ
(১)	পাণ্ডুয়া	৯৪৭, ৯৪৮ হিজরি
(২)	সাতগাঁও	৯৫০ হিজরি
(৩)	শরীফাবাদ	৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫১ হিজরি
(৪)	ফতেহাবাদ	৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫১ হিজরি

উচ্ছেদকৃত হুসেন শাহী রাজত্বের একটি মাত্র টাকশাল নগরী ফতেহাবাদ থেকে শেরশাহ তাঁর মুদ্রা জারি করেন। নগরীটি বর্তমান বাংলাদেশের পূর্বাংশের ফরিদপুর জেলা হিসেবে চিহ্নিত। টাকশালটি সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩২)[১০] কর্তৃক প্রথম স্থাপিত হয় এবং তখন থেকেই শহরটি টাকশাল নগরী হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। অন্য তিনটি টাকশালের মধ্যে সাতগাঁও টাকশালটি পুরাতন। দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক এই টাকশালটি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহের শাসনকাল পর্যন্ত একশত বছর যাবৎ টাকশাল নগরী হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হুসেন শাহী শাসকেরা এই টাকশালটির প্রচলন বজায় রাখেননি।[১১] পাণ্ডুয়া এবং শরিফাবাদে অন্য দুটি টাকশাল শেরশাহ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন। পাণ্ডুয়া একটি প্রাচীন শহর যা হিন্দু শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু এটি খ্যাতি অর্জন করে মুসলিম শাসন আমলে যখন এটাকে ফিরোজাবাদ নামে নামকরণ হয়। মুসলিম শাসকেরা সময়ে সময়ে পাণ্ডুয়াকে তাদের রাজধানী হিসেবেও ব্যবহার করেন এবং সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহের সময় এখান থেকে মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়।[১২] শেরশাহ নগরীর প্রাচীন নাম ব্যবহার করে এখান থেকে মুদ্রা জারি করেন। অর্থাৎ শরীফাবাদ খ্যাতি অর্জন করে শেরশাহের সময়ে কারণ তিনি প্রথমবারের মতো এই টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেন।

শেরশাহের টাকশালসমূহ বাংলার পুরো এলাকায় প্রসারিত ছিল। তিনি বাংলায় মাত্র ৪টি টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেন যার তিনটি- শরীফাবাদ, সাতগাঁও ও পাণ্ডুয়া পশ্চিমবাংলা- বিহারের সীমান্তে অবস্থিত ছিল (এলাকাটি বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত)। মাত্র একটি টাকশাল অর্থাৎ ফাতেহ আবাদের টাকশালটি পূর্ব দিকে আধুনিক ঢাকা বিভাগে অবস্থিত। উত্তর পূর্ব বাংলা (ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চল জুড়ে) এবং সর্ব পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম বিভাগ) থেকে শেরশাহের নামে কোনো মুদ্রা জারি হয়নি এবং এখনও কোনো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলে টাকশাল না থাকাটা কোনো গুরুত্ব বহন করে না কিন্তু শেরশাহ, যিনি তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কর্তৃত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন, তার ক্ষেত্রে এর একটা গুরুত্ব আছে। এই অধ্যায়ের শেষে এটা দেখা যাবে যে পূর্বাঞ্চলে শেরশাহের টাকশাল নগরীর অনুপস্থিতি সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

মুদ্রাসমূহে প্রাপ্ত সন এবং তারিখও লক্ষণীয়। এই সনগুলো ৯৪৬ হিজরি থেকে ৯৫১ হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত[১৩]। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ঠিক তার শাসনকালের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত বাংলার উপর শেরশাহের অবিতর্কিত সার্বভৌমত্ব ছিল। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে যে, শাসনকালের শুরু থেকেই বাংলার পশ্চিমাংশে শেরশাহের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা অবশ্য এটা বলছি না যে শেরশাহ দেশের অন্যান্য অংশে তার কর্তৃত্ব মোটেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তিনি অন্য অংশেও সে চেষ্টা করে থাকতে পারেন। বর্তমানে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে তার কর্তৃত্ব অবিতর্কিত বা সমস্যাবিহীন (Undisturbed) ছিল না।

এই সময়ের ইতিহাসের উপর দুটো মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বাংলার প্রকৃত মুদ্রার সাথে আবিষ্কৃত এই মুদ্রা দুটি সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। ভট্টশালী বলেন, "এই সময়ে আবিষ্কৃত অনেক মুদ্রার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) জসোদলে একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। 'ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' এর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রা নং ২৩৯, পৃ. ১৮২ তে এই মুদ্রার ছবিসহ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে (দেখুন জেএএসসি ১৯১০, পৃ. ১৫০)। ঠিক প্রথমটার মতো মুদ্রাটি সিলেটের সোনাক্ষীরায় পাওয়া যায়। 'ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি শিলং কয়েন ক্যাবিনেট' এর ২য় খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় (মুদ্রা নং ২৪) এই মুদ্রাটির একটি বিবরণ (কিন্তু ছবি নয়) পাওয়া যায়। পরের মুদ্রার গায়ে স্পষ্টভাবে খচিত আছে 'বারবাক-উদ-দুনিয়া উদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর বারবাক শাহ ইবনে হুমায়ুন শাহ খালাদ আল্লাহ মুলকাহু ওয়া সুলতানুহু'। অর্থাৎ 'বারবাক উদ দুনিয়া উদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর বারবাক শাহ, হুমায়ুন শাহের পুত্র, আল্লাহ তার রাজ্য ও শাসনকে রক্ষা করুন।' তারিখটি স্পষ্টতই ৯৪৯ হিজরি/১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ (প্লেট নং-২)। প্রথম মুদ্রায় তারিখের ৯৪ অংশটি স্পষ্ট কিন্তু শেষ অংকটি বিচ্ছিন্ন। এই দুইটি মুদ্রা একই ছাঁচ (dice) থেকে তৈরি বলে মনে হয় না। যখন এই ধরনের দুইটা মুদ্রা প্রচলিত অন্যান্য মুদ্রার সাথে আমাদের কাছে আসে, তখন ধারণা করা যায় অনেক মুদ্রাই তৈরি হয়েছিল এবং দেশে প্রচলন করা হয়েছিল।[১৪] এই মুদ্রাগুলো প্রমাণ করে যে সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাংলায় শেরশাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বেপরোয়া প্রচেষ্টা ছিল অথবা অন্য কথায় বেশ কিছু সময় ধরেই অঞ্চলটিতে শেরশাহের কর্তৃত্ব প্রতিহত করা হয়েছিল। মুদ্রাগুলোতে তারিখ খচিত ছিল ৯৪৯ হি:/১৫৪২-৪৩ খ্রি.। ৯৪৯ হিজরির এই তারিখটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই তারিখে গৌড়ে নিযুক্ত শেরশাহের গর্ভনর খিদির খান সুর্ক তার প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আর এই ঘটনা বাংলার প্রতি শেরশাহের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল।[১৫] এ প্রসঙ্গে সারওয়ানীর বর্ণনা হচ্ছে: "ইত্যবসরে (অর্থাৎ যখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেরশাহ গাফফারদের সাথে যুদ্ধে রত ছিলেন) বাংলা থেকে সংবাদ আসে যে বাংলার গভর্নর খিদির খান সুর্ক বাংলার মৃত রাজা সুলতান মাহমুদের কন্যাকে বিবাহ করেছেন এবং বাংলার রাজাদের প্রথানুযায়ী 'টকি' অর্থাৎ বাম-ই-খানাতে (একটা উঁচু পিঁড়ি) বসেছিলেন। ঘটনাটি তাঁর মহৎ হৃদয়কে বেশ মথিত করে। অশুভ কোনো ঘটনা ঘট্যার আগেই তা এড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি হায়বাৎ খান নিয়াজী, খোয়াশ খান, ঈশা খান নিয়াজী, হাবীব খান এবং রায় হুসেন খান জালওয়ানীকে রোহতাস এর দুর্গে রেখে নিজেই বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হন। বাংলায় পৌঁছলে খিদির খান সুর্ক তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। তিনি খিদির খানের কাছে জানতে চান যে কেন তিনি তাঁকে অবহিত না করেই বাংলার রাজা সুলতান মাহমুদের কন্যাকে বিবাহ করেছেন এবং বাংলার রাজাদের প্রথানুযায়ী 'টকি' তে বসেছেন? রাজার পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রাজন্যবর্গের কোনো কাজ করা উচিৎ নয়। খিদির খানকে রাজার মতো তিরষ্কার করে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে তিনি নির্দেশ দেন এবং বলেন যে তার কোনো রাজন্য যদি তাঁর অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কোনো কাজ করে তবে তারাও এমন কঠিন শাস্তি লাভ করবে। তিনি বাংলাকে কয়েকটি ছোটো ছোটো গভর্নরের অধীনে ভাগ করে দেন যারা পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং কাজী ফজীলাৎকে (প্রধান বিচারপতি)– সাধারণভাবে কাজী ফাদিহাত হিসেবে পরিচিত– বাংলার একজন ট্রাস্টি নিযুক্ত করেন। এর পরই তিনি আগ্রা ফিরে যান।[১৬]

খিদির খানের বিদ্রোহ বা মৃত সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করার বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলার রাজাদের প্রথানুযায়ী ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে রাজসোফায় উপবেশন, পূর্বে উল্লেখিত মুদ্রা প্রবর্তনের কিছু আগে ঘটেছিল। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, বিদ্রোহী দুটো দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল। ভট্টশালীর মত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে খিদির খানের বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির পর অনেক ঘটনা ঘটেছিল। এই সূত্রে তিনি পূর্বে উল্লেখিত ইসলাম শাহ সূরের শাসনকালে কালীদাসের (সোলায়মান) বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন।

পর্তুগিজ বণিকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম স্থানীয় তিনটি শক্তি– আরাকান রাজা, ত্রিপুরা রাজা এবং বাংলার শাসকদের নিকট সবসময় বিবাদের বস্তু ছিল। সুলতান মাহমুদ শাহের পতনের অব্যবহিত পরেই মৃত সুলতান মাহমুদু শাহের গভর্নরবৃন্দ– হামজা খান ও খোদা বখশ খান; পর্তুগিজ, আরাকানীয়, ত্রিপুরীয় এবং ভাটি অঞ্চলের এক প্রধান সোলায়মান বাইসার মধ্যে ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হয়ে যায়। এন.বি. রায়-এর মতে, শেরশাহের সেনাপতি নওয়াজিশ খান প্রথমত, চট্টগ্রাম দখল করেন; পরে তা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বিজয় করেন।[১৭] কানুনগো বিশ্বাস করেন যে, পর্তুগিজদের কার্যকরভাবে বিতাড়নের জন্য শেরশাহ চট্টগ্রাম এবং সাতগাঁও (পশ্চিম বাংলা)-এর উপর দৃঢ় অধিকার নিশ্চিত করেন।[১৮] অবশ্য কখন এবং কিভাবে শেরশাহ এই অধিকার নিশ্চিত করেন, তিনি তা বলেননি। বস্তুত কানুনগোর বিস্তারিত বর্ণনার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো জায়গা রাখেননি। কিন্তু পর্তুগিজদের নিজেদের দেওয়া তথ্যপ্রমাণ, মুদ্রা ও শিলালিপির প্রমাণাদি এবং হামজা খানের পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি মুহাম্মদ খান এর তথ্যাদি থেকে চট্টগ্রামের উপর শেরশাহের নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। শেরশাহের বঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ক্যাম্পোস লিখেছেন : 'এই নাবিক (সাম্পায়ো) যখন চট্টগ্রাম পৌঁছেন তখন শেরশাহ বাংলার প্রভু হয়ে গেছেন।' এই সময় চট্টগ্রাম অধিকার নিয়ে সেনাপতি মাহমুদ শাহ, খোদা বখশ খান এবং আমীরজা খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নুনো ফার্নান্দেজ প্রেইরি যাকে মাহমুদ শাহ শুল্ক বিভাগের প্রধান করেছিলেন এবং যিনি চট্টগ্রামের উপর প্রভুত্ব প্রভাব রাখতেন, তিনি আমীজা খানের পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য শেরশাহ তার সেনাপতি নোগাজিল খানকে (নোয়াজিশ খান) চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন এবং তিনি শহরটি অধিকারে আনেন।

চট্টগ্রামে এমন এক জটিল অবস্থা দেখে নুনো ফার্নান্দেজ সাম্পায়োকে শহরটি দখলের পরামর্শ দেন। যা তিনি সহজেই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি হয় নৈতিক নয়তো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা করতে অস্বীকার করেন। ইতিমধ্যে আমীরজা খান এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন এবং শেরশাহের সেনাপতি নোগাজিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নোগাজিল নুনো ফার্নান্দেজ-এর সাহায্য কামনা করেছিলেন। যখন ফার্নান্দেজ শেরশাহের বাড়ি যান নোগাজিল তখন অবরুদ্ধ ছিলেন। আমীরজা খানের লোকেরা তাকে চিনতে পেরে ব্যাপক সংবর্ধনা দেন। তিনি নোগাজিলকে অবরুদ্ধ রাখতে তাদের বিরত রাখেন। কিন্তু নিজেই ৫০ জন পর্তুগিজসহ, যাদের সাম্পায়ো পাঠিয়েছিলেন, নোগাজিলকে পাকড়াও করেন এবং সাম্পায়োর একটা জাহাজে বন্দি করে রাখেন। ছয় মাস বন্দি থাকার পর সাম্পায়োর নাবিকদের ঘুষ দিয়ে নোগাজিল কোনো প্রকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এক সময় এমন ঘটলো যে রাজা সোলায়মানের ৬০ জন সশস্ত্র মুর ছোটো একটা নৌকায় চট্টগ্রাম আসেন এবং সাম্পায়োর কিছু লোকের সাথে একত্রিত হন। কিন্তু সব সময় কাপুরুষের মতো আচরণকারী সাম্পায়ো-এর বেশি লোক দিয়ে তাদের সাহায্য করেননি। এমনকি বিপদগ্রস্ত পর্তুগিজ নাবিকদের রক্ষার্থে এবং ফার্নান্দেজ এর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের রক্ষার্থে আর কোনো জাহাজ পাঠালেন না। দিয়োগো বিবেলো এবং নুনো ফার্নান্দেজ নিজেরাই আত্মরক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ফার্নান্দেজ আহত হন।[১৯]

সুতরাং উপরের বর্ণনা মতে শেরশাহের গৌড় দখল সুলতান মাহমুদ শাহের দু'জন গভর্নর আমির্জা খান এবং খুদা বখশ খানের মধ্যে চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তারে ব্যক্তিগত সংঘাতের সংকেত বহন করে। এই দুই গভর্নরের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে নওয়াজিশ খান প্রাথমিকভাবে শহরটি দখলে সফল হন। এতে আরো প্রকাশ হয় যে নওয়াজিশ খান চট্টগ্রামের উপর তার কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন। এই সময়ে রাজা সোলায়মান বাইসা হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু একা সফল হওয়াটা কঠিন হবে ভেবে তিনি পর্তুগিজ ও আমির্জা খানের মিত্রবাহিনীর সাথে চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্বের লড়াইয়ে যোগ দেন। পর্তুগিজ বিবরণ মতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমির্জা খান, পর্তুগিজ ও সোলায়মান বাইসার যৌথবাহিনী লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়। নওয়াজিশ খানের সাফল্য ম্লান হয়ে যায় যেহেতু গৌড়ের রাজধানী থেকে দূরে এই স্থানে তার সরবরাহ কমে আসে। নিজের সম্পদ যা ছিল তার উপরই তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে হামজা খান এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন এবং নওয়াজিশ খানের সরবরাহ লাইন বন্ধ দেখে তাকে ঘিরে ফেলেন। কিন্তু পর্তুগিজরা হস্তক্ষেপ করে নওয়াজিশ খানকে হামজা খানের থাবা থেকে রক্ষা করেন।

পর্তুগিজরা শেষ পর্যন্ত নওয়াজিশ খানকে তাদের নজরবন্দি করে রাখে। অবশ্য নওয়াজিশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং ত্রিপুরার রাজার কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করেন।[২০] আঞ্চলিক রাজনীতিতে পর্তুগিজদের এ ধরনের জড়িয়ে পড়া সম্ভবত হামজা খানের পছন্দ ছিল না। তাই হামজা পর্তুগীজ সম্পর্কটা ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে পড়ে। পর্তুগিজরা আফগানদের বিশেষত সূর আফগানদের বড় শত্রুতে পরিণত হলো। পর্তুগিজরা মাহমুদ শাহের গভর্নরদেরও পছন্দের ছিল না কারণ সুলতান মাহমুদ কর্তৃক দেয় সুযোগ সুবিধার আড়ালে তারা দাপ্তরিক ক্ষমতার ব্যবহারে অংশীদার হয়ে উঠেছিল। তাই ধারণা করা সমীচিন যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের পতনের পর পরই চট্টগ্রামে নতুন রাজনৈতিক পট আসন্ন হয়ে উঠেছিল। আফগান, মোগল, ত্রিপুরা রাজা এবং পর্তুগিজেরা সেই কাজের অংশীদার ছিল, যারা Estado Codovascam এবং হামজা খানের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. করিমের মতামত হচ্ছে :[২১] 'হামজা খান ত্রিপুরা রাজা এবং শেরশাহের আফগান সেনাধ্যক্ষকে পরাজিত করেছিলেন। যেহেতু বাঙালি এবং আফগানদের মধ্যে তীব্র শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল, তাই হামজা খান আরাকানের শাসকদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন বলেই মনে হয়। হামজা খান এবং আরাকানীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মিত্রতা (Confederacy) চট্টগ্রামের স্থল ও জলসীমা থেকে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যক্তিকে বিতাড়িত করতে সফল হয়। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পর্তুগিজ বাণিজ্য জাহাজের অনুপস্থিতি হামজা- আরাকান কূটনীতির সফলতার সুচক বই কিছু নয়।" করিম আরো লিখেছেন, "ত্রিপুরা ও পাঠান জিতিবার পরে হামজা খান কী ভূমিকা গ্রহণ করেন এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যবধি আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।... কিন্তু ত্রিপুরা রাজ ও পাঠানের শত্রু হামজা খানের পরে আরাকান রাজার সঙ্গে মিতালী করা বা আরাকান রাজের আনুগত্য স্বীকার করার সম্ভাবনাই বেশি।"[২২] কিন্তু করিমের এই মতামত সুদুরপ্রসারি ও সঠিক বলে মনে হয় না। কবি মুহম্মদ খানের বংশবৃত্তান্তে প্রাপ্ত শব্দ 'রাজধানী' এর উপর তিনি তার যুক্তির নির্ভরতা দেখিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ

করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলায় পাঠানগণ জিনি।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শত্রুসব করি ক্ষয় বাহুবলে লভি জয়
বাপ হোত্তে কৈলা রাজধ্বণী।[২৩]

অর্থাৎ তিনি (হামজা খান) সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ত্রিপুরা ও আফগানদের উপর বিজয় অর্জন করেন। সব শত্রুকে নিধন করার পর নিজ বাহু বলে বিজয় অর্জন করে তিনি 'রাজধ্বনি' দিয়ে রাজাকে স্বাগত জানান। করিমের বর্ণনা মতে ত্রিপুরা রাজা এবং পাঠানদের পরাজিত করার পর আরাকানী রাজার পক্ষ অবলম্বন ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না এবং তাই তিনি আরাকান রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য বুঝতে পারি না যে হামজা খানের মতো ব্যক্তি দুটো বড় শত্রুকে পরাজিত করার পর কেন একজন রাজার পক্ষ অবলম্বন করবেন বিশেষত যখন বিশ্বাসে এবং ভৌগোলিকতায় তিনি ভিনদেশি। অধিকন্তু ড. করিম লক্ষ্য করেননি যে 'রাজধ্বনী' শব্দটির পাঠ পুরোপুরি সঠিক না। এটি 'রাজধানী' হতে পারে।[২৪] সুতরাং আমরা এটা বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি যে, ত্রিপুরা রাজা এবং পাঠানদের পরাজিত করার পর হামজা খান একটি 'রাজধানী' স্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার আশা পোষণ করেছিলেন। শব্দটির 'রাজধানী' পঠন সঠিক হলে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে হামজা খান চট্টগ্রাম রাজ্যের একটি রূপকল্প করেছিলেন। আর তা সঠিক হলেও তার স্বাধীনতার স্থায়িত্ব ছিল স্বল্প সময়ের কারণ অন্য কোনো সুত্রে এর কোনো প্রমাণ অদ্যবধি নেই।

চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত জনৈক চণ্ডিলা রাজার একটি শিলালিপির উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ১৫৪১-৪২ সালে চট্টগ্রাম আরকান রাজাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[২৫] শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ ভাষা হচ্ছে "শিক্ষা ও ধার্মিকতার পরিচালক বাউল গিরি রাউলের পরামর্শ এবং অন্য ২৮ জন বাউলের মতানুসারে ১৪ মাঘ ৯০৪ সালে চণ্ডিলা রাজা একটি উপাসনালয় স্থাপনের নকশা প্রণয়ন করেন এবং এ জন্য একটি গুহা খনন করা হয়।"[২৬] উল্লেখ্য যে, ৯০৪ সালের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত মতের পক্ষে তারা এটা ধরেই নিয়েছেন যে ৯০৪ সালটি মাঘী যুগ যা ১৫৪১-৪২ সালের সমসাময়িক।

১৫৪১-৪২ সালে রাজা মিন বিন আরাকানের সিংহাসনে ছিলেন; কিন্তু মিন বিনের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইতিহাসে চণ্ডিলা রাজার বিষয়টি ধুম্রাচ্ছন্ন, তার নাম অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায়নি। সুতরাং ৯০৪ সাকা যুগও হতে পারে যা ৯৮১ খ্রি. তুল্য। সুতরাং এই শিলালিপির ভিত্তিতে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে শেরশাহের বাংলা অধিকারের সময় চট্টগ্রাম আরাকানীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে এটা পরিষ্কার যে চট্টগ্রামের অবস্থান সুনিশ্চিত ছিল না। কিন্তু এটা সম্ভব যে (আরো তথ্য প্রমাণ পরে সংযুক্ত করা হলো)[২৭] যেহেতু শেরশাহ ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠতম শক্তি এবং দিল্লি সাম্রাজ্যের প্রভু হয়ে উঠেছিলেন, তাই ত্রিপুরা কিংবা আরাকান এমন কি ক্ষমতাচ্যুত সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের গভর্নরবৃন্দও তাকে চট্টগ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দখল থেকে প্রতিহত করতে পারতেন না। কানুনগো[২৮] যথার্থই বলেছেন, "পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বাংলার রাজ্যের বিষয়ে এই নীরবতা শেরশাহ কর্তৃক সুচিত শক্তিশালী আফগান শাসনের প্রতি সর্বোত্তম (যদিও নীরব) শ্রদ্ধা নিবেদন। চট্টগ্রাম বন্দরে এবং পশ্চিম বঙ্গের সাতগ্রামে পর্তুগিজ জলদস্যুদের জন্য সহজে শিকার ধরার আর কোনো সুযোগ ছিল না। এমনকি, রাজ্য অভ্যন্তরে সৎ ব্যবসা খোলারও কোনো সুযোগ ছিল না। এই অবস্থা নীতিগতভাবে বাংলার বিভক্তির চেয়ে আরো কিছু বেশি জিনিসের প্রতি ইঙ্গিতবাহী; অথবা এটা এও ইঙ্গিত বহন করে যে, একজন কাজীর নেতৃত্বে বাংলাকে আফগান উপজাতীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া যেখানে পুরো রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী ছিল না।

রাজনীতিতে মিলেমিশে একটা হযবরল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টারত ছোটো ছোটো গোষ্ঠী প্রধানদের বিষয়ে ক্যাম্পোস আবারো আমাদের সহায়তায় আসতে পারেন। তিনি বলেন, 'ঘটনাক্রমে একটা ছোটো পালতোলা নৌকায় (Galiot) রাজা সোলায়মানের ৬০ জন সশস্ত্র মুর চট্টগ্রামে এলেন। সাম্পায়োর কিছু লোককে তাদের সাথে সংযুক্ত করলো।[২৯] ভট্টশালী[৩০] রাজা সোলায়মানকে[৩১] চিহ্নিত করেছেন ঈশা খাঁর বাবা হিসেবে। ঈশা খাঁ ছিলেন বাংলার বারো ভুঁইয়াদের একজন যিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।[৩২] মরহুম সুলতানের জামাতা হিসেবে তিনি নিজেকে সুলতান মাহমুদ শাহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারি ভাবতেন এবং বিপর্যস্ত পারিবারিক ভাগ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা প্রকাশ করতেন।

খিদির খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শেরশাহ উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাকে তার এখতিয়ার ভুক্ত করেন এবং গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড নির্মাণের মাধ্যমে সোনারগাঁকে লাহোরের সাথে সংযুক্ত করেন। পথের বিভিন্ন স্থানে সরাইখানাও নির্মাণ করেন।[৩৩] শেরশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা পূর্ব বাংলার আরো গভীরে পিছু হটতে থাকে এবং ময়মনসিংহ ও সিলেটের কোনো কোনো অঞ্চলকে তাদের নাশকতার জন্য অনুপ্রবেশের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। মুদ্রাগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভট্টশালী[৩৪], এন.বি. রায়[৩৫] এবং ড. করিম[৩৬] মত পোষণ করেন যে বাংলায় শেরশাহের শাসনের প্রথম দিকে বারবাক শাহ বিন হুমায়ুন শাহ নামে জনৈক ব্যক্তি সূর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, নিজকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দেন, মুদ্রা প্রবর্তন করেন, নিজ নামে খুৎবা পাঠ করান এবং ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলা শাসন করেন। ৯৪৯ হিজরি/১৫৪২-৪৩ খ্রি. তারিখ সম্বলিত মুদ্রাগুলোতে কোনো টাকশালের নাম উল্লেখ নেই কিন্তু তারপরও স্থানীয়ভাবে প্রবর্তিত ও বাইরে থেকে না আসায় সেগুলোর মূল্য আছে। সুতরাং খিদির খানও সোলায়মান খানের মতো বারবাক শাহ বিন হুমায়ুন শাহের (যার পূর্ব পরিচয় এখন জানা যায়নি) নেতৃত্বে ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলা থেকে বাংলায় শেরশাহের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধিতার গতিময়তা বজায় রাখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পূর্ব বাংলায় অন্যান্য রাজ্য এবং ছোটো ছোটো স্বশাসিত প্রধানদের মধ্যে ছিল ত্রিপুরা রাজ এবং বাকলা (বর্তমান বরিশাল) জেলার রাজা পরমানন্দ রায়। ত্রিপুরা ১৫৪০ সাল থেকে ১৫৭১ সাল পর্যন্ত রাজা বিজয় মানিক্যের শাসনাধীন ছিল। ১৫৩৮ সালে শেরশাহের প্রথম গৌড় দখলের পর পূর্বাঞ্চল সমূহে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ত্রিপুরাও অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা করে। হামজা খান ত্রিপুরীয়দের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। হামজা খান কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর নওয়াজিশ খান পর্তুগিজদের নিকট বন্দি হয়েছিলেন। রাজমালার তথ্যানুসারে পর্তুগিজ বন্দিদশা থেকে পালানোর পর তিনি ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। কিন্তু শাসক আফগান এবং ত্রিপুরীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে এবং শত্রুতা এমন এক পর্যায়ে পৌছে যেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের কোনো পথ খোলা ছিল না। আর তখনই, রাজমালার তথ্যানুসারে, আশ্রয়গ্রহণকারী আফগানেরা তাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করে।[৩৭]

একইভাবে বাকলা বা আধুনিক বরিশাল ছিল হিন্দু রাজা রায় পরমানন্দ রায় এর শাসনাধীন, চট্টগ্রাম ত্যাগ করার পর পর্তুগিজরা এই রাজার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং ১৫৫৯ সালে একটা বাণিজ্য চুক্তিও করেছিল। পর্তুগিজরা তাদের সকল নৌযানকে চট্টগ্রাম বন্দর বয়কট করে বরিশাল নৌবন্দর দিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়, চুক্তিটি রাজা পরমানন্দ রায় এবং গোয়ার পর্তুগিজ হাই কমান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।[৩৮] এই চুক্তিই প্রমাণ করে যে রাজা পরমানন্দ স্বশাসিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপ্রধান যিনি নিজ কাজকর্মে স্বাধীন ছিলেন। শেরশাহের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে তিনি শেরশাহের অনুগত ছিলেন। পর্তুগিজ বিবরণীতে লিপিবদ্ধ পয়গাঁও ও, যা বর্তমান খুলনা জেলার পয়গ্রাম নামে পরিচিত, একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূখণ্ড ছিল।[৩৯]

শেরশাহ যখন খিদির খান সুর্ককে ক্ষমতাচ্যুত করেন তখনকার বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা এমনই ছিল। বাংলাকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার কোনোটিই সম্পর্কে সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিক তথ্য বা দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাই হোকে সারওয়নীর 'তারিখ-ই-শেরশাহীতে' শুধুমাত্র তার কর্মকাণ্ডের উল্লেখ এবং বিক্ষিপ্ত স্থানীয় কিছু প্রমাণ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সারওয়ানী বলেন, "তিনি বাংলাকে 'মুলুক আল তাওয়ায়েফ' বা কয়েকটি ছোটো ছোটো প্রদেশে বিভক্ত করেন যারা অভ্যন্তরীণভাবে পরস্পর থেকে স্বশাসিত ছিল এবং কাজী ফজীলাতকে, সাধারণভাবে ফদিহাত নামে পরিচিত, বাংলার আমিন নিযুক্ত করে নিজে আগ্রায় ফিরে যান।"[৪০]

বাংলায় শেরশাহের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটা নকশা চিত্র এঁকেছেন সারওয়ানী। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত বিভিন্ন স্থানীয় তথ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় শেরশাহ বাংলার প্রশাসন ও রাজনীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং রাজনৈতিক বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি বাংলাকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা দিয়ে কয়েকটি ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করেন এবং এক অংশকে অপর অংশের পর্যবেক্ষক হিসেবে গড়ে তোলেন। বাংলাকে পাঞ্জাবের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ, সরাই খানা নির্মাণ, সংবাদ আদান প্রদানের সহজ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কৌশলগত ও সহজ বাণিজ্যিক চলাচলের মতো বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলার বিভিন্ন ঘটনাক্রম সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখার মূল লক্ষ্যেই পরিচালিত ছিল। শেরশাহের প্রচণ্ড ক্ষমতা ও মানসিক শক্তি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে ঢাকা অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত একটি স্থানীয় কামানে উৎকীর্ণ লিপি থেকে যা ৯৪৯/হিজরি মোতাবেক ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দের।[৪১] (বারবাক শাহ বিন হুমায়ুন শাহের মুদ্রায়ণ একই তারিখ পাওয়া যায়। এটি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।) উৎকীর্ণ আবিষ্কৃত লিপি থেকে জানা যায় যে, কামানটি জনৈক ফজল গাজী কর্তৃক শেরশাহকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ভট্টশালী ফজল গাজীকে বাহাদুর গাজীর বাবা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এরাই বর্তমান ঢাকা জেলার ভাওয়ালের বিখ্যাত পরিবার ছিলেন। ভট্টশালী বিশ্বাস করেন যে, বাহাদুর গাজী পরগণার মালিকানা স্বত্ব আকবরের শাসনকালের প্রথম দিকে এই শর্তে লাভ করেছিলেন যে তিনি সম্রাট আকবরের সুন্দর কোসাম শ্রেণিভুক্ত ৩৫টি যুদ্ধজাহাজ বার্ষিক ৪৮৩৭৯ রূপির বিনিময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।[৪২] ফজল গাজী যে ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন তা আওরঙ্গজেবের শাসনকালের ২য় রেগনাল (Regnal) বছরের একটি দলিল থেকে প্রমাণিত।[৪৩] কাজেই আমরা দেখতে পাই যে বাহাদুর গাজীর পিতা ফজল গাজী ভাঁটি অঞ্চলের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। এলাকার কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তার একটা শক্তিশালী নৌ স্থাপনা ছিল যেমনটি ছিল, পর্তুগিজ বিবরণ মতে, রাজা সোলায়মানের। অঞ্চলটি খারাপ রাস্তা এবং খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য পরিচিত ছিল কিন্তু একই সাথে ভালো নদী যোগাযোগের জন্যও এর সুনাম ছিল। ফজল গাজী কর্তৃক শেরশাহকে একটা কামান উপহার দেওয়ার ঘটনা তাই তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববঙ্গ মৃত সুলতান মাহমুদের সমর্থকদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। শেরশাহ ও ফজল গাজীর মধ্যে এই সমন্বয় এলাকায় বিদ্রোহী তৎপরতাকে বেশ দুর্বল করে ফেলে। ফলে শেরশাহ এলাকায় তার কর্তৃত্ব দৃঢ় করতে সুযোগ পেয়ে যান। সোনারগাঁকে লাহোরের সাথে ট্র্যাংক রোড নির্মাণের মধ্য দিয়ে সংযোগ করাটাই এর বড় প্রমাণ।

শেরশাহ কর্তৃক সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ, রাস্তার দু'ধারে বৃক্ষ রোপণ এবং দুই মাইল পরপর রাস্তার ধারে সরাইখানা নির্মাণের কথা সারওয়ানী উল্লেখ করেছেন। তিনি সোনারগাঁকে লাহোরের সাথে সংযোগ স্থাপনের কথাও বলেছেন।[৪৪] বাংলায় শেরশাহের সড়ক যোগাযোগটা পূর্বাঞ্চলের চেয়ে পশ্চিমাঞ্চলে বেশি উল্লেখযোগ্য। বাৎসরিক বন্যা ও প্লাবিত হওয়ার দেশ পূর্ব বাংলায় চার শতাব্দী প্রাচীন মাটির কাঁচা রাস্তার অস্তিত্ব পাওয়া অপ্রত্যাশিতই বটে। শেরশাহ কর্তৃক বাংলায় সড়ক যোগাযোগের এক অপূর্ব চিত্র কানুনগো তুলে ধরেছেন।[৪৫] একইভাবে শেরশাহের নামের সাথে সংযুক্ত কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্থানিক নামের অস্তিত্ব রাধ, বরেন্দ, ঢাকা ও সোনারগাঁও[৪৬] এলাকায় চিহ্নিত হয়েছে যেমন শেরপুর মুর্ছা, শেরপুর আতিয়া, শেরপুর চিরিঙ্গি, শেরশাহী, শেরপুর বাড়ি, শেরপুর তহশিল এবং শেরপুর কোইগাড়ী। সরাই এর সাথে সংযুক্ত নামগুলো হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের চেহ সরাই (বর্তমানে চাষাড়া) ও চট্টগ্রামের মিরের সরাই। এই স্থানিক নামগুলো তার জীবদ্দশায় কিংবা পরেও হতে পারে। মনে হয় তিনি প্রাচীন মুসলিম শাসকদের অসুবিধার কথা বাস্তবিকই উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাকে একক শাসনাধীনে আনতে প্রাচীন মুসলিম শাসকদের এক শতাব্দীরও বেশি এবং মোগলদের প্রায় অর্ধশতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শেরশাহ, যিনি তখন ভারতবর্ষের সম্রাট, তাকেও দিল্লি ফিরে যেতে হয়েছিল। এদেশে তার প্রথম প্রশাসক তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তিনি এখন বাংলাকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং কাজী ফদীলাতকে তা তদারকির দায়িত্ব প্রদান করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে শেরশাহ বাংলাকে 'মুলুক আল তাওয়াইফ' অর্থাৎ স্বশাসিত রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন। আর সম্ভবত বাগধারাটির ভালো ব্যাখ্যা এখানেই নিহিত। আসলে 'মুলুক আল তাওয়াইফ' বলতে কী বোঝায়? ষ্টেইনগাস 'মুলুক আল তাওয়াইফের'[৪৭] ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে "সিকান্দার লোদীর রাজ্য ভেঙ্গে যে সকল প্রদেশ/রাজ্য গঠন করা হয়েছিল"। নিমাত আল্লা তার রচিত পুস্তক 'তারিখ-ই-খানজাহানী ওয়া মাখজানে আফগানী' তে কয়েকবার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নিচের বাক্যটিতে তার একটা ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় "যখন ইসলাম শাহের মৃত্যু সংবাদ, ফিরোজ খানের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ এবং আদলীর সিংহাসন আরোহণের সংবাদ হিন্দুস্থানের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে, তখন অমাত্যরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিদ্রোহ করে বসলেন এবং 'মুলুক আল তাওয়াইফের' মতো সর্বত্রই তারা রাজা হয়ে বসলেন; আর ফলশ্রুতিতে সর্বত্রই একটা মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।"[৪৮] তাই 'মুলুক আল তাওয়াইফ' এর পরবর্তী অবস্থা হলো বিশৃঙ্খলা। শেরশাহ এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন (আক্ষরিক অর্থে নয় বরং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে) বাংলায় তার প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং এটা নিশ্চিত করতে যে বাংলায় তার শাসন প্রতিনিধিরা রাজ্যগুলোতে ক্ষমতাদখল থেকে বিরত থাকবে। তাই জনপ্রিয় ভাষায় কাজী ফজীলাৎ হয়ে ওঠে কাজী ফদীহাত কারণ শিক্ষিত, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হওয়ায় তাকে বিবাদকারী আফগানদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠ থাকতে হয়েছিল। তাই বলা যায়, শেরশাহ নিশ্চিত রূপেই 'মুলুক আল তাওয়াইফ' তৈরি করেছিলেন বিবাদমান আফগান জায়গিরদারদের ছোটো ছোটো রাজ্যের প্রধান হিসেবে প্রতিস্থাপিত করে বাংলায় শান্তি প্রিয় এবং আইনমান্যকারী মানুষদের মধ্যে প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। ফেরীঘাট, শহরতলী ইত্যাদি স্থানিক নামের সাথে শেরশাহের নামের সংযুক্তি এটা তুলে ধরে যে ধীরে ধীরে তার শাসন কর্তৃত্ব ছোটো ছোটো বিদ্রোহী অঞ্চল থেকে সমগ্র বাংলায় বিস্তার লাভ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহিঃ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য চট্টগ্রাম, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁ বন্দরসমূহ দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকেই সোনারগাঁ নিজেই একটা উন্নত শহর এবং এখানে একটা অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দরও ছিল। যে সকল বিদেশিরা নৌপথে বাংলা বিহার করেছিলেন তারা সোনারগাঁও বন্দরটি ব্যবহার করেছেন।[৪৯] বিদেশি ব্যবসায়ী ও ব্যবসা দ্রব্য সোনারগাঁ বন্দরে আসত। তাই বন্দর শহরটি নিয়ন্ত্রণের জন্য শেরশাহ চাপ প্রয়োগ করেছিলেন; কারণ এই বন্দর শহরকে তিনি স্থানীয় বিদ্রোহীদের দমনে, বন্দর থেকে মালামাল পরিবহন ও জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে মূলঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বন্দর শহরটির উপর তার নিয়ন্ত্রণ লাভ তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছিল। কেন না এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্য নির্বিঘ্নে পরিচালিত হতো। সমুদ্রের প্রভু এবং দুর্ধষ যোদ্ধা হিসেবে খ্যত পর্তুগিজরাও (যার প্রদর্শন ১৫৩১ সালে শেরশাহের সাথে যুদ্ধে তারা দেখিয়েছিল) সাতগাঁও বন্দরে এবং গভীর সাগরে বাংলার শান্তি বিঘ্নিত করতে পারেনি, বিশেষত সুলতান মাহমুদের শাসন আমলে।

শেরশাহের শাসনকালে পর্তুগিজদের কার্যক্রম ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসাটা আরো একটা প্রমাণ যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর জলে ও স্থলে শেরশাহের নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। ১৫৭৬ সালে মোগলরা গৌড় বিজয় করেছিল কিন্তু চট্টগ্রাম জয় করতে তাদের আরো একশত বছর লাগে। এই বিলম্বের জন্য পর্তুগিজ ও মঘদের লুটপাট ও ধ্বংসজজ্ঞই দায়ী। সম্ভবত শেরশাহের বাংলায় আগমনের সময় ১৫৪১ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার তার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা ছিল। অবশ্য শেরশাহ যে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন এবং এই বন্দর নগরীর নিয়ন্ত্রক হয়েছিলেন, তা সরাসরি কোনো সুত্র থেকে সমর্থিত হয়নি। কিন্তু পরোক্ষ সুত্র থেকে তথ্যটির সন্নিবেশ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা সুবিদিত যে টোডরমল বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন যার মধ্যে 'চট্টগ্রাম সরকার' ও একটি। এটাও সুবিদিত যে টোডরমলের রাজস্ব নিষ্পত্তির (Revenue settlement) প্রায় ১০০ বছরের কম সময়ের মধ্যে ১৬৬৬ সালের পূর্বে মোগলদের দ্বারা চট্টগ্রাম বিজিত হয়নি। তাই মনে করা যেতে পারে যে টোডরমল তার রাজস্ব নিষ্পত্তির পরিকল্পনা করেছিলেন বিদ্যমান ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই। সুলতানী আমলেও ১৯টি সরকার ছিল না এবং এটাও আমাদের জানা আছে যে শেরশাহ প্রথমবারের মতো বাংলাকে সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করেন।[৫০] তাই আধুনিক ইতিহাসবিদরা একমত যে বাংলাকে ১৯ সরকারে বিভক্তি শেরশাহেরই কাজ।[৫১] যেহেতু চট্টগ্রামকে ১৯টি সরকারের একটি হিসেবে তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে এনেছিলেন তাই তিনি অবশ্যই চট্টগ্রামও জয় করেছিলেন। সুতরাং ধারণা করা যায় যে শেরশাহ শেষ পর্যন্ত সমগ্র বাংলারই অধিকর্তা হয়ে ওঠেন।

সিংহাসনের আপাত উত্তরাধিকারী হিসেবে শেরশাহ তার জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল খানকে মনোনীত করেন। তিনি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার অমাত্যরা এটাকে উল্টিয়ে নিজেদের পছন্দমত ১৫৪৫ সালে ২৮ মে হিজরি ৯৫২ সালের ১৫ রবিউল আওয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসে জালাল খানকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। জালাল খান সিংহাসনে আরোহণ করে ইসলাম শাহ নাম ধারণ করেন।

ইসলাম শাহ এক বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন যা পশ্চিমে সিন্ধু থেকে পূর্বে আসামের পর্বতমালা এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরে তিনি তার পিতার কিছু পদক্ষেপ ও নিয়ম পাল্টে দিলেন। 'তারিখ-ই-দাউদীর' লেখক আবদ আল্লা লিখেছেন, "তিনি তার পিতা প্রবর্তিত সব নিয়ম কানুনই পর্যালোচনা করে কোনো কোনটি বহাল রাখেন এবং কোনো কোনোটিতে পরিবর্তন আনেন।"[৫২] ইসলাম শাহের আনীত পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হলো তিনি বাংলার 'আমিন' পদ 'গর্ভনর' পদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেন। তিনি মুহম্মদ খান সূরকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। রিয়াজ এর মতে :[৫৩] "তিনি ছিলেন প্রধান অমাত্য বৃন্দের (omra) একজন এবং সেলিম শাহ (ইসলাম শাহ) এর আত্মীয় এবং তিনি তার ন্যয় বিচার, সমতা ও ভদ্র আচরণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।" তবে ইসলাম শাহ বাংলার মারাত্মক বিদ্রোহের মুখোমুখি হন। বিদ্রোহটি ঈশা খানের বাবা সোলায়মান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। আবুল ফজলের ভাষ্য মতে, "এই প্রধানের (ঈশা খানের) বাবা রাজপুত এবং বায়াস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভাটি অঞ্চলে তিনি ক্রমাগতভাবে ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে থাকেন। সেলিম খানের (ইসালাম শাহের) সময়ে তাজ খান ও দরিয়া খান বিশাল বাহিনী সহযোগে সেখানে যান এবং অনেক প্রতিরোধের পর আত্মসমর্পণ করেন। অল্প কিছুদিন পরে তিনি আবার বিদ্রোহ করেন। তারা তাকে ধরার জন্য কৌশল অবলম্বন করেন এবং দ্বীপান্তরে (abode of annihilation) প্রেরণ করেন। তার দুই পুত্র ঈশা ও ইসমাইলকে ব্যবসায়িদের নিকট বিক্রয় করে দেন।"[৫৪] ঈশা খানের বাবাকে রাজপুত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তার নাম ছিল কালীদাস গাজদানী। তিনি সুলতান মাহমুদ শাহের অধীনে চাকুরিতে যোগ দেন এবং বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় 'দেওয়ান' পদে উন্নীত হন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান খান নাম ধারণ করেন। তিনি সুলতান মাহমুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করে ভাটি অঞ্চলে শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রধান হিসেবে ঘাঁটি তৈরি করেন। তার রাজ-জামাই হওয়া পর্যন্ত অঞ্চলটি তার শ্বশুরের শক্ত ঘাঁটি ছিল।[৫৫] শেরশাহের হাতে গৌড় পতনের পরপরই সোলায়মান খান চট্টগ্রামের বিষয়ে ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন এবং নৌ সেনাদের একটি দল তথায় প্রেরণ করেন। ঈশা ও ইসমাইল নামে তার দুই পুত্র ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের পরাজয় ও মৃত্যুর পর এবং সূরদের দ্বারা তার দুই পুত্রকে হত্যার পর জামাই খিদির খান ও সোলায়মান খান গৌড় দখলকারীকে ক্ষমতাদখলকারী হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁরা নিজেদেরকে সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী মনে করতেন। তাই তারা শেরশাহ সূরের সময় থেকে বিদ্রোহের মাত্রা ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে তোলেন। কিন্তু শেরশাহের শাসন কালে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সফলভাবে খিদির খানের বিদ্রোহ এবং সম্ভবত পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে বারবাক শাহ বিন হুমায়ুন শাহের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। তাই শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রধানেরা শেরশাহের জায়গিরদারী স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। ভাওয়ালে ফজল গাজী কর্তৃক কামান উপহার প্রদান এই স্বীকৃতিরই প্রমাণ। শেরশাহের শাসনকালে সোলায়মান খান তার কার্যতৎপরতা বন্ধ রেখেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু ইসলাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করলে এবং তার গোষ্ঠীপ্রধানদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণ করলে, যা তাকে পূর্ব ভারতে ব্যস্ত রেখেছিল, সোলায়মান খান সময়কে সুযোগ হিসেবে ক্ষমতা দখলকারী রাজ্যশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিজেকে বাংলার সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি করেন। 'তিনি ক্রমাগতভাবে ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে থাকেন' মর্মে আবুল ফজল যে উক্তি করেছেন তা দিয়ে প্রকারান্তরে তিনি এই ধরনের বিদ্রোহের কথাই বুঝিয়েছেন।

ভট্টশালী[৫৬] সোলায়মান খানের বিদ্রোহের সময় দেখিয়েছেন ১৫৪৬-৪৭ সালকে এবং তার পতন দেখিয়েছেন ১৫৪৮ সালকে। ইসলাম শাহ বিশাল সৈন্যবহর দিয়ে তাজ খান ও দারিয়া খানকে বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়েছিলেন।[৫৭] ভীষণ সংঘর্ষের পর সোলায়মান খান আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু এন.বি. রায়ের[৫৮] মতে, সম্ভবত নিয়াজীদের সাথে ইসলাম শাহের জড়িয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে তিনি আবারও বিদ্রোহ করে বসেন। ইসলাম শাহ এবারও তাজ খান ও দারিয়া খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। আবুল ফজলের মতে চাতুর্যের সাথে তারা ঈশা খানের বাবাকে আটক করেন এবং তাকে হত্যা করে বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তারা তার দুই ছেলে ঈশা ও ইসমাইলকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেন।[৫৯] এ ভাবেই ভাটি অঞ্চলে ইসলাম শাহ তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু একই স্থান থেকে শেরশাহ ও ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ থেকে বোঝা যায় যে অঞ্চলটি ছিল ক্ষমতাচ্যুত হুসেন শাহী বংশের অনুগতদের এবং অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠির শক্তিশালী ঘাঁটি। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে সুলতান মাহমুদ শাহের অনুসারীরা সূর সুলতানদের বাংলায় শান্তিতে বসবাস করতে দেননি।

রিয়াজের[৬০] ভাষ্যমতে, শেরশাহ সোলায়মান কররানীকে বিহারের গভর্নর[৬১] নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি ইসলাম শাহের শাসনকাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। শেরশাহের সমর্থনে সেবা প্রদানের জন্য কররানীরা রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। নিমাত আল্লাহর[৬০] মতে, সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ শেরশাহ তাদের খাসপুর টান্ডায় এবং দক্ষিণ বিহারের গঙ্গা নদীর তীরে এবং অন্যান্য জায়গায় জায়গির প্রদান করেন। বাবরের একজন আমীর বলে পরিচিত কালাপাহাড়, বাদাউনীর মতে, সিকান্দার শাহ সূর ওরফে আহমদ খান সূরের ভাই ছিল এবং শেরশাহের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সোলায়মান কররানীর একজন প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি ইসলাম শাহ সূরের শাসনকালে ১৫৪৭-৪৯ সালে আসামে অভিযান চালিয়ে হাজো এবং কামাখ্যা মন্দির[৬২] দুটো ধ্বংস করেছিলেন। ১৫৬৭ সালে উড়িষ্যা অভিযানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সময়ও কালাপাহাড় সোলায়মান কররানীর সাথে ছিলেন এবং জগন্নাথপুরীর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

আর এভাবেই বাংলা সামগ্রিক অর্থে আগাগোড়াই দিল্লির সূর সুলতানদের শাসনাধীন ছিল। যদিও অবাধ্যতা এবং ছোটো খাটো বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে যায়নি এবং সূরদের বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপিত হুসেন শাহী বংশের সমর্থকদের কারো না কারো বৈরী তৎপরতা ছিল, তথাপিও শেরশাহ এবং ইসলাম শাহ উভয়েই এই সন্তুষ্টিতে অন্ধ ছিলেন যে তাদের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত বাংলা অবিচ্ছিন্ন ছিল।

পাদটীকা

১. রিয়াদ আল সালাতিন, গোলাম হোসেইন সেলিম, ইং অনুবাদ-আব্দুস সালাম। কোলকাতা ১৯০২, পুনর্মুদ্রণ দিল্লি ১৯৭৫ পৃ. ১৩৯

২. কানুনগো : শেরশাহ এণ্ড হিজ টাইমস কলিকাতা ১৯৬৫ পৃ. ১৯৩

৩. উপরোল্লিখিত : পৃ. ২০৫। পাদটীকা ৩ দেখুন

৪. উপরোল্লিখিত : পৃ. ২৩৪

৫. নিমাত আল্লা : তারিখে খান জাহানী ওয়া মাখজানে আফগানী। সম্পাদনা এস,এম ইমামুদ্দিন, ঢাকা ১৯৬০ পৃ. ৩০৬

৬. কানুনগো, পৃ. ২২১

৭. এইচ, বি, ২য় খণ্ড পৃ. ১৭৪

৮. কানুনগোর মতে "খিদির আফগান ছিলেন না এবং বাংলার প্রাচীন তুর্কী অমাত্য পরিবারের সদস্য ছিলেন। এদের সাথে অধুনালুপ্ত সৈয়দ বংশের মনোমালিন্য ছিল"। কানুনগো পৃ. ২২২। অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটা অবাস্তব মনে হয়। শেরশাহ কি তার অমাত্য, সহযোগী (*Lieutenant*) এবং রাজপুত্রদের উপেক্ষা করতে পারেন যাদের সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ সমর্থন তাকে একটার পর একটা সাফল্য এনে দিতে সমর্থ করে তুলেছিল এবং ক্ষমতাকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য যাদের সমর্থন তার তখনও প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণি পেশা গোষ্ঠীর আফগানরা তাকে রাজমুকুট পরতে সাহায্য করেছিল। এমতাবস্থায় তিনি আফগানদের উপজাতীয় চরিত্র এবং স্বাধীনতার মনোভাবকে ক্ষুণ্নকারী কোনো কিছুই করতে পারেন না। তিনি সুর্ক আফগানদের তার আস্থায় নিয়েছিলেন। তাই তিনি চৌসার যুদ্ধের পর তার নব অধিকৃত বাংলা রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে খিদির খান সুর্ককে নিযুক্ত করেছিলেন এবং হুসাইন খান সুর্ক নামে আর এক ব্যক্তিকে বন্দি মোগল রাজ পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং আগ্রায় সম্রাট হুমায়ুনের কাছে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে তাদের পৌঁছে দিতে বলেন (১ম খণ্ডে পৃ. ১৩৯)। শেরশাহ লোদী বংশোদ্ভূত আফগান খিদির খান সুর্ককে বাংলায় তার প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। (কানুনগো, পৃ. ২২২, পাদটীকা-১)। তার কার্যের জন্য সুর্ককে কেবলমাত্র তাঁর নিকট জবাবদিহি রেখে শেরশাহ বাংলা ত্যাগ করেন। পূর্বের শাসকের অনুগত প্রধান অমাত্যবৃন্দ, সহযোগীবৃন্দ এবং রাজপুত্রদের তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাথে রাখার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেন। কানুনগো সম্ভবত সুর্ক কে তুর্ক পড়েছেন কিন্তু সারওয়ানী স্পষ্টতই খিদির খানকে সুর্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন

৯. জার্নাল অব দি ন্যুমিসমিটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া: খণ্ড-২৭ অংশ-১, ১৯৬৫, পৃ ৬৬-৬৯
১০. করিম : কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল, ঢাকা-১৯৬০, পৃ. ১৬১
১১. উপরোল্লিখিত- পৃ. ১৫৯
১২. উপরোল্লিখিত- পৃ. ১৫৯-১৬০
১৩. ৯৫০ হিজরিতে ইস্যুকৃত সাতগাঁওয়ের মুদ্রায় তারিখের অনুপস্থিতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ সাতগাঁওয়ের কাছাকাছি শরীফাবাদে ইস্যুকৃত মুদ্রার তারিখ ৯৪৬ হিজরি থেকে ৯৫১ হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত
১৪. বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৩৬, ১৯১৮, পৃ. ১৮
১৫. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮, ১২৯, উপরোল্লিখিত ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১-১৭২ (এখানে ফার্সী উদ্ধৃতি আছে)।
১৬. বেঙ্গল : পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট : খণ্ড-৩৬, ১৯২৮, পৃ. ১৮
১৭. এইচ. বি : ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩-১৭৪
১৮. কানুনগো : পৃ. ২২২
১৯. ক্যাম্পোস : পৃ. ৪২-৪৩
২০. রাজমালা (সম্পাদিত) কে.পি. সেন- ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫
২১. ইতিহাস পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৭৪, পৃ. ৫২-৫৩। এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশনা
২২. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৫২-৫৩। (এখানে ইংরেজি অনুবাদ আছে)
২৩. সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষাকাল সংখ্যা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০২-১০৩
২৪. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১০২-১০৩
২৫. জে.এ.এস.বিডি ১৯ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৬, পৃ. ৬৩। "এশিয়াটিক রিসার্চেস" ২য় খণ্ড পৃ. ৩৯৩
২৬. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৬৩
২৭. *Infra:* পৃ. ১০৯
২৮. কানুনগো : পৃ. ৩০৮
২৯. ক্যাম্পাস পৃ. ৪২
৩০. বেঙ্গল *পাস্ট* এণ্ড প্রেজেন্ট ৩৮ খণ্ড, ১৯২৯ পৃ. ১৭, ক্যাম্পাস : পৃ. ৪২
৩১. ক্যাম্পোস পৃ. ৪২, বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট ৩৮ খণ্ড, পৃ. ১৪-১৭, পাদটীকা- ৬, ৭
৩২. বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট ৩য় খণ্ড, ১৯২৯, পৃ. ১৭-১৮
৩৩. সারওয়ানী ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬। (এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে)
৩৪. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট : ৩য় খণ্ড, ১৯২৯, পৃ. ১৮
৩৫. এন.বি.রায় : পৃ. ৩৯
৩৬. করিম সুলতানী আমল, পৃ. ৪৬৬
৩৭. রাজমালা (সম্পাদিত) কে.পি.সেন ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫
৩৮. এইচ.বি- ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৯. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৩৫৯
৪০. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২, ২১৬
৪১. বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট ৩৬ খণ্ড, ১৯২৮, পৃ. ৩৫। ঢাকা রিভিউ দেখুন: ১৯১১, পৃ. ২১৯-২২১
৪২. জে,এ,এস,বি ১৯০৯, পৃ. ৩৬৭
৪৩. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৩৫
৪৪. সারওয়ানী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬, ২১৬
৪৫. কানুনগো : পৃ. ৩১৫-৩১৬
৪৬. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৩২২-৩২৩
৪৭. ষ্টেইনগাস এ কমিপ্রেহেনসিভ পার্সিয়ান- ইংলিশ ডিকশনারী, লন্ডন পৃ. ৮২১
৪৮. নিমাত আল্লা : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১। (এখানে ফার্সি উদ্বৃতি আছে)
৪৯. চীনা পরিব্রাজক এবং রাষ্ট্রদুতেরা, ইউরোপীয় পরিব্রাজক এবং ইবনে বতুতাও সোনারগাঁও হয়ে বাংলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন
৫০. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১
৫১. কানুনগো : পৃ. ৩১০। ৩০৮ পৃষ্টার ২নং পাদটীকা দেখুন)
৫২. দাউদী পৃ. ১৬৫। (এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে)
৫৩. রিয়াজ পৃ. ১৪৬
৫৪. ইংরেজি অনূদিত আকবর নামা ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৭
৫৫. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট : ৩৮ খণ্ড, ১৯২৯, পৃ. ১৩-১৯। পাদটীকা ৬ ও ৭ দেখুন।
৫৬. উপরোল্লিখিত ৩৮ খণ্ড, ১৯২৯, পৃ. ১৮-১৯
৫৬. ইংরেজি অনূদিত আকবরনামা। ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৭
৫৭. এন.বি. রায় : পৃ. ৪০
৫৮. ইংরেজি অনূদিত আকবর নামা ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৭
৫৯. রিয়াজ পৃ. ১৫১, ১৫২
৬০. এখানে বিহার বলতে দক্ষিণ বিহারকে বোঝানো হয়েছে। সূর আফগানদের স্বাধীন রাজ্য বাংলায় উত্তর বিহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতান নুসরত শাহের সময় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা হাজিপুর উত্তর বিহারের প্রধান দপ্তর হিসেবে অব্যাহত ছিল। দেখুন রিয়াজ পৃ. ১৪৯, পাদটীকা-৩
৬১. নিমাত আল্লা : পৃ. ৪০৯, (এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে)
৬২. এইচ.বি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

শামস আল দীন মুহাম্মদ শাহ গাজির বংশ

১৫৫৩ সালের ৩০ অক্টোবর/৯৬০ হিজরির ২৬ জ্বিলহাজ্জ তারিখে গোপন অঙ্গে যন্ত্রণাদায়ক রোগ ভোগের পর ইসলাম শাহ মৃত্যুবরণ করেন।[১] তার মৃত্যুর পর তার বারো বছরের পুত্র ফিরোজ সিংহাসনে বসেন কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পরেই শেরশাহ সূর এর ভ্রাতা নিজাম খান সূর এর পুত্র মুবারিজ খান তাকে হত্যা করে।[২] সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে মুবারিজ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩]

মুবারিজ খান, এখন সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহ এর সিংহাসনে আরোহণের ফলে ভারত বর্ষের সূর আফগান রাজ্যের উপর সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার দায়ভার চেপে বসে। এই ঘটনা প্রাদেশিক গোষ্ঠী প্রধানদের জেগে ওঠার সংকেতও দেয়। আদিলের দরবারে থাকা তাজ খান কররানী বিদ্রোহ করেন এবং পালিয়ে গিয়ে বিহারে তার ভাই সুলায়মান কররানীর সাথে যোগ দেন। তাঁকে অনুসরণ করে আদিলের শ্যালক (brother-in-law) আহমদ খান সূরও বিদ্রোহ করেন এবং সুলতান সিকান্দার শাহ উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করেন। আদিলের আর এক শ্যালক ইব্রাহিম খান সূর মামলা করেন এবং দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। ইসলাম শাহের এক আত্মীয় এবং বাংলার গভর্নর মুহম্মদ খান সূর তার আনুগত্য পরিহার করে শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজি উপাধি ধারণ করেন। প্রত্যেকেই দিল্লির মুকুট লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। তাই সূর সাম্রাজ্য স্বাধীন শাসকের অধীনে প্রধানত ৪টি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে-পাঞ্জাবে সুলতান সিকান্দার, দিল্লি এবং আগ্রায় ইব্রাহিম, চুনারে আদিল এবং বাংলায় মুহম্মদ খান সূর। এই সময়ের বিশৃঙ্খল অবস্থা বায়ানার গভর্নর গাজি খান সূর, অলওয়ার হাজী খান, সম্ভালের মিয়া ইয়াহিয়া তুরানদের মতো ছোটো ছোটো গোষ্ঠী প্রধানদের নিজ নিজ রাজ্যে ভাগ করে নিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। সুজাত খান নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করে মালওয়া পুনরুদ্ধার করেন।

তাই বলা যায়, পুরো সূর সাম্রাজ্যই তখন মুলুক আল তাওয়াইফে পরিণত হয়েছিল। নিমাত আল্লার ভাষ্য মতে, "একমাস পর যখন ইসলাম শাহের মৃত্যু সংবাদ, ফিরোজ খানের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ এবং আদিলের সিংহাসনে আরোহণ সংবাদ সমগ্র হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়ে রাজন্যবর্গের (উমারা) প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিদ্রোহ করেন এবং মুলুক আল তাওয়াইফের মত রাজা হয়ে ওঠেন। সর্বত্রই এক বিরাট সাম্প্রদায়িক সহিংস বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।"[৪]

আমার বই পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিল্লির সূর আফগান সাম্রাজ্য থেকে প্রথম যে অঙ্গটি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলো বাংলা। চার্লস স্টুয়ার্টের মতে, ইসলাম শাহ সূরের আত্মীয় বাংলার গভর্নর মুহম্মদ খান সূর আদিল শাহকে তার নীতিভ্রষ্ট আচরণ এবং ভোগ লালসার জন্য সার্বভৌম রাজা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি আদিল শাহকে তার প্রভুর সন্তানের হত্যাকারী মনে করেন।[৫] মুহম্মদ খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সিংহাসন আরোহণ করেন এবং শামস আল দীন আবু আল মুজফ্ফর মুহম্মদ শাহ' উপাধি ধারণ করেন।[৬]

প্রসঙ্গত নিমাত আল্লা লিখেছেন, "ইতিমধ্যে বাংলার গভর্নর মুহম্মদ খান সূর বিদ্রোহ করেন এবং বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে জৌনপুর বিজয়ের জন্য অগ্রসর হন। এই সংবাদ পেয়ে তার সাথে থাকা হিমুকে বায়ানার অবরোধ থেকে আদিল ডেকে পাঠান এবং ইব্রাহিম খানের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর বাংলার গভর্নর মুহম্মদ খান গৌড়িয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। মৌজা ছাপ্পার ঘাটে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যেখানে মুহম্মদ খান সূরকে হত্যা করা হয়।[৭]" ডর্ন (Dorn) তার ভাষ্যে লিখেছেন, "প্রায় একই সময়ে, মুহম্মদ খান সূর, যিনি মুহম্মদ খান গৌড়িয়া নামেও পরিচিত এবং যিনি বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করতেন, বিদ্রোহ করে বসেন এবং জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হন। এই নতুন বিশৃঙ্খলার সংবাদ পেয়ে আদিল শাহ বায়ানার অবরোধ থেকে হিমুকে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে থাকার জন্য নির্দেশ দেন।... ইব্রাহিম সূরের পরাজয়ের পর ও আদিলের কাছে ফিরে যাওয়ার পর হিমু মুহম্মদ খান গৌড়িয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ছপ্পার ঘাটের উপকণ্ঠে তাকে হত্যা করেন।[৮] একই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সেলিমও লিখেছেন যে ইসলাম শাহের শাসনের পর তিনি (মুহম্মদ খান সূর) বিদ্রোহের মাত্রা বাড়িয়ে দেন এবং চুনার, জৌনপুর, কালঙ্গী বিজয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। আদিলের শীর্ষস্থানীয় রাজন্য ব্যবসায়ী হিমুকে সাথে নিয়ে এবং বিশাল সৈন্যবহর সাথে রেখে মুহম্মদ খান সূরের বিরুদ্ধে আদিল অগ্রসর হন এবং কালপী থেকে ১৫ ক্রোশ দূরে ছাপ্পারঘাট গ্রামের নিকট উভয়পক্ষের সৈন্যরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হন। উভয়পক্ষেই অনেক হতাহত হয় এবং মুহম্মদ খানকেও হত্য করা হয়।[৯]

সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে বলা যায়, সুলতান শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজি শুধু বাংলার স্বাধীনতাই ঘোষণা করেননি বরং দিল্লি ও আগ্রায় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের শ্রেষ্ঠত্বেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে দিল্লি ও আগ্রা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং দেশটিকে সুদূর জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি কালপী পর্যন্ত অগ্রসর হন। বাংলার সৈন্যদলকে মোকাবিলার জন্য আদিলও অগ্রসর হন। উভয় সেনাদল কালপী থেকে বিশ মাইল দূরে ছাপ্পার ঘাটে[১০] গঙ্গা নদীর উভয় পাড়ে দীর্ঘদিন পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে থাকে। বাংলার সেনাদলের উপর অতর্কিত এক আক্রমণে আদিল জয়ী হয়।[১১] যুদ্ধে মুহম্মদ শাহ নিহত হন। আদিল শাহ বাংলার দিকে অগ্রসর না হয়ে চুনারে বিশ্রাম নেন এবং শাহবাজ খানকে[১২] বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। শেরশাহের শাসনকালে বাংলার সামরিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর্থিক, কৃষি, অর্থনৈতিক, মুদ্রা এবং রাজস্ব সংস্কারে তার চলমান দৃষ্টি ছিল এমনকি দিল্লির সুলতান হওয়ার পর তিনি তা মাথায় রাখেন। রাস্তা সংস্কার, বিশ্রামাগার নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, দুর্গায়ন, খানকা, মাদ্রাসা এবং কূপ খননের মত জনহিতকর কাজের জন্য ও তাকে প্রশংসা করা হয়। ইসলাম শাহের শাসন কালে মুহাম্মদ শাহ সূরকেও বাংলা ও উত্তর বিহার সুশাসনের জন্য প্রশংসা করা হয়।[১৩]

ভালো প্রশাসকের পাশাপাশি শামস আল দীন মুহম্মদ গাজি একজন ভালো সৈনিকও ছিলেন। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে, চট্টগ্রাম হুসেইন শাহী বংশের শেষ শাসকদের অধীনে এসেছিল এবং শেরশাহ সূর ও এটা অধিকার করেছিলেন। রাজকীয় সূর সুলতানদের উত্তরাধিকারী হিসেবে শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজিও চট্টগ্রামের প্রভু হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই সময়েই চট্টগ্রাম আবারও বাংলার সুলতান, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের বিষয় হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামের উপর আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত ত্রিপুরা রাজার মাধ্যমে। ত্রিপুরার রাজাদের সরকারি ইতিহাস 'রাজমালা'[১৪] তে ঘটনার নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় :

তথা চাটিগ্রামে সেই পাঠান বর্ব্বর।
রাজাকে মারিতে যুক্তি করেন অপর।
পাঠানের তরে রাজা জিঙ্গাসিল পুলি।
বংগে চাটিগ্রামে পাঠান যুক্ত হৈছে শুনি।
ভংগ দিয়া গেল পাঠান গৌড়েশ্বর স্থানে।
ক্রোধে গৌড়েশ্বর সৈন্য বহু দিল রণে।
চাটিগ্রামে চলিলেক সৈন্য সেনাগণ।
চলি আইছে বহু সৈন্য করিয়া গর্জন।
তিন সহস্র অশ্ব চলে তাহার সংহতি।
দশ সহস্র ঢালি চলে ধানুকি পদাতি।
দুরন্ত পাঠান জাতি ক্রোধে অহংকারী।
চলিয়াছে চাটিগ্রামে পাঠান সংগে করি।
মমারক খাঁ সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল।
ভংগ দিল ত্রিপুরা সন্য জিনিল।

বাম বাজু সৈন্য পলায় পাঠানের ভয়।
শোয়ার নাহিক দেখি ত্রিপুরের সেনা ॥
পাঠান লইল আসি চট্টগ্রাম থানা ॥

'রাজমালার' এই বিবরণের উপর ভিত্তি করে ভট্টশালী এই যুদ্ধের বিবরণ এই ভাবে দিয়েছেন "বিজয়ের পরে তার দৃষ্টি চট্টগ্রাম অধিকারের দিকে নিবদ্ধ করেন কিন্তু তার অশ্বারোহী দল যাদের অধিকাংশই মুসলমান পাঠান নিয়ে গঠিত, তার সাথে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলার সুলতানের ভাড়াটিয়া হিসেবে তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চেষ্টা করে। তাই বিজয় তাদের বন্দি করেন এবং বিখ্যাত ১৪ দেবতার, যারা ত্রিপুরা রাজার রক্ষাকর্তা দেবী হিসেবে পরিচিত, সামনে তাদের উৎসর্গ করেন। ত্রিপুরার অশ্বারোহী দলের এই অবিবেচনা প্রসূত ধ্বংস বাংলার সুলতানকে তেমন কেনো বড় ধরনের বাধা ছাড়াই চট্টগাম অধিকার করতে সাহায্য করে।"[১৫] আধুনিক পণ্ডিতেরাও মনে করেন যে, ১৫৫৩ সালে চট্টগ্রাম আরাকান রাজার দ্বারা অধিকৃত হয়। রহিম তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "আরাকানীয় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে এ.পি ফাইরে বিশ্বাস করেন যে মেং বেং (১৫৩১-১৫৫৩) ত্রিপুরীয়দের দখল থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেন। কিন্তু এটা ঘটনার দ্বারা সমর্থিত নয়। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর শাসকেরা ১৫৪২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম তাদের দখলে রেখেছিলেন এবং মেং বেং ঐ শহরটিকে দখল করেছিলেন ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৫৫৩ সালের শেষের দিকে।[১৬] এই বিবরণ এবং একইভাবে এ.পি.ফাইরের বিবরণটি কয়েকটি আবিষ্কৃত মুদ্রার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। কিন্তু আগের দিনের পণ্ডিতেরা এই মুদ্রায় ভুল পাঠ করেছিলেন। নিম্নে মুদ্রাগুলোর সঠিক বিবরণ সন্নিবেশিত হলো।[১৭]

মুদ্রার প্রধান/সম্মুখভাগ	মুদ্রার পিছন/পার্শ্ব ভাগ
আরাকানী ভাষায়	চট্টগ্রামের সুলতান (ফার্সি ভাষায় লিখন)
মিন বি (in)	মুবারিজ শাহ
টিন খা	
ইয়া	

মুদ্রাগুলোতে কোনো তারিখ খচিত নেই। এই ধরনের মুদ্রার বিষয়ে রবিনসন এবং শ' এর মন্তব্য নিম্নরুপ "বেশ কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে যেখানে মুদ্রার সম্মুখভাগে আরাকানী ভাষায় খচিত আছে 'মিন বিন টিন খা ইয়া' এবং ফার্সি ভাষায় মুদ্রার পার্শ্বভাগে লেখা আছে। এটা রাজা মিন বিন এর বলে ধরে নেয়া যায় যিনি ১৫৩১ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২২ বছর রাজত্ব করেন। এ.পি ফাইরের মতে[১৮] এই মুদ্রাগুলো চট্টগ্রামে খচিত ও প্রচলিত হয়। ড. করিম অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "মিনবিন এর পাঠটি সন্দেহের উর্ধ্বে নয় কারণ মুদ্রায় খচিত শব্দটি মিন। 'বিন' শব্দটি রবিনসন এবং শ' কর্তৃক শব্দটির পুনর্নির্মাণ। সান খা অং বলেন যে 'বিন' মুদ্রায় পাওয়া যায় নি। মিন শব্দের অর্থ রাজা। সুতরাং মুদ্রার উপর রাজার নাম টি প্রাপ্য নয়। এই বিতর্কিত মুদ্রা ছাড়া মিন বিন এর কোনো মুদ্রা এখনও পাওয়া যায় নি। বেশ কয়েকজন আরাকানি রাজারা মুসলিম উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মিন বিন ও জাবাওকশাহ উপাধি গ্রহণ করেন বলে জানা যায় কিন্তু জাবাওক শাহ এই উপাধিটি মুদ্রাগুলোতে পাওয়া যায় না। মুদ্রায় প্রাপ্ত মুসলিম নাম/উপাধি হচ্ছে 'মুবারিজ শাহ'। রাজা মিন বিন উভয় নাম বা উপাধি একই সময়ে ধারণ করেছিলেন বলে মনে হয় না।

~ www.amarboi.com ~

অধিকন্তু মিন বিন এর চট্টগ্রামের উপর আধিপত্য ছিল কিনা সন্দেহ রয়েছে। তার শাসনকাল বলে উল্লেখিত ১৫৩১-১৫৫৩ সালে চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৫৩১ সালে ...সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম এর নাম দিয়েছিলেন 'ফতেহাবাদ'। চট্টগ্রাম মহানগরের সন্নিকটে যে বড় পুকুরটি তিনি খনন করিয়েছিলেন তা আজও বিদ্যমান এবং তার নাম বহন করে চলেছে। একই এলাকায় তার রাজপ্রসাদ এবং নির্মিত মসজিদটি ঐতিহাসিক হামিদ আল্লা খান উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভগ্নাবস্থায় দেখেছেন। পর্তুগিজ লেখকদের দ্বারা চট্টগ্রামের উপর গিয়াস আল দীন মাহমুদ শাহের নিয়ন্ত্রণের কথা প্রমাণিত। খুদা বক্স খান এবং আমির্জা খান তার গভর্নর ছিলেন। প্রথম জনকে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে এবং পরের জনকে উত্তরে পদায়ন করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে ১৫ মাইল উত্তরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে তার নির্মিত কুমিরা মসজিদটি আজও বিদ্যমান আছে।

শেরশাহ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর আমির্জা খান চট্টগ্রাম দখল করেন। আমির্জা খান শেরশাহের সেনাধ্যক্ষের বিরোধিতা করেছিলেন। এই সংকটময় সময়ে পর্তুগিজরা হস্তক্ষেপ করে কিন্তু এই সংকট কালীন সময়ে চট্টগ্রামে আরাকানীয়দের কোনো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় নি। রাজকীয় সূর বংশের পতনের পর বাংলার স্বাধীন সূর সুলতানেরা শামস আল দীন মহম্মদ শাহ গাজি এবং তার পুত্র গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ, আরাকান টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেন বলে জানা যায়। বাঁশখালী উপজেলার ইলিশ গ্রামে প্রাপ্ত সুলায়মান কররানীর প্রস্তর লিপি থেকে চট্টগ্রামের উপর কররানীদের প্রভাবের কথা প্রমাণিত।[১৯]

সুতরাং এই সময়ে আরাকানী রাজারা চট্টগ্রাম দখল করেছিলেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায় নি। যেটা নিশ্চত হওয়া যায় তা হলো যে, শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজি এবং তার পুত্র গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ উভয়েই চট্টগ্রামকে শুধু তাদের নিয়ন্ত্রণেই রাখেননি বরং আরাকান এর এক অংশও দখল করেছিলেন এবং আরাকান টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু করেছিলেন। মুদ্রাগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ

শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজি[২০]

	মুদ্রার প্রধান / সম্মুখ ভাগ	মুদ্রার পিছন / পার্শ্ব ভাগ
১.	বর্গাকার এর মধ্যে কালিমা	বর্গাকারের মধ্যে (ফার্সি ভাষায়)
	মার্জিনে মহানবীর ১ম চার খলিফার নাম	মুহম্মদ শাহ গাজি খালিদ আল্লাহ
	উপরে আবুবকর সিদ্দিক, বামে উমর বিন খাত্তাব	মুলকুহু ও সুলতানুহু শাসমুদ্দনিয়া ওয়াল দীন আবু আলী
	নিচে উছমান, [redacted] আলী	তারিখ ৯৬২ হিজরি
	টাকশাল আরাকান	

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ[২১]

২. বর্গাকার : কালিমা
মার্জিনে : মহানবীর ১ম চার খলিফার নাম
উপরে : আবুবক্‌র সিদ্দিক, বামে : উমর বিন খাত্তাব
নিচে : উছমান, ডানে : আলী
টাকশাল : আরাকান

বর্গাকারে :
মুহম্মদ শাহ গাজি খালিদ আল্লাহ
মার্জিন: মুলকুহু ওয়া সুলতানুহু
তারিখ : ৯৬৫ হিজরি

গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহের মুদ্রাটি, যা আরাকান টাকশাল নামাঙ্কিত, অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজির মুদ্রাটি অনেক আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজির মুদ্রায় 'আরাকান' শব্দটির পাঠ নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ভারতীয় যাদুঘরের মুদ্রা লিপিতে বুরদিলন (Bourdilon) প্রথম আরাকান শব্দটি পাঠ করেন কিন্তু এই পাঠকে চ্যালেঞ্জ করেন এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ।[২২] এরপর এন.বি. সান্যাল[২৩] হাবিবুল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং বুরদিলনের পাঠকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রহিম[২৪] ও বুরদিলন এবং সান্যালের পাঠকে সমর্থন করেন। করিমই প্রথম যিনি হাবিবুল্লাহকে সমর্থন করেন। তিনি মতভেদের মূল বিষয়কে সংক্ষিপ্ত আকারে বলেছেন যা আমরা পুরোটাই উদ্ধৃত করছি। "শামস আল দীন মুহাম্মদ শাহের মুদ্রায় টাকশালের নাম আরাকান পাঠকে কেন্দ্র করে অনেক মতভেদ তৈরি হয়েছে। IMC তে বুরদিলন প্রথম এই পাঠটি করেন এবং এর ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা উপসংহারে আসেন যে শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ আরাকান জয় করেন এবং মগ রাজধানী নগরী থেকে মুদ্রাটি প্রচলন করেন।" নিচে উল্লেখিত কারণ দেখিয়ে এই মতকে প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ। ক) আরাকান শব্দটির পাঠ স্পষ্ট নয় কারণ এটি অনেকটা 'রিকাব' শব্দটির মতো দেখতে। খ) আধুনিক নাম আরাকান তখন প্রচলিত ছিল না কারণ মুসলিম ঐতিহাসিকেরা সব সময় শব্দটি 'রাখাং' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গ) এই সময়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বাংলা নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণের সাথে এটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অন্যকথায়, এই সময়ে বাংলার দুর্বলতা এটা সমর্থন করে না যে শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ সূর আরাকান আক্রমণ ও বিজয় করেছিলেন। এন.বি সান্যাল হাবিবুল্লাহর এই মতকে খণ্ডণ করার চেষ্টা করেন। তার যুক্তি হচ্ছে ক) তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন যে শব্দটির পাঠ সঠিক। খ) সমসাময়িক ত্রিপুরা ও আরাকানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি মনে করেন যে সেই সময় বাংলা দুর্বল ছিল না। গ) যখন এই দুই বিষয়ে একমত হওয়া যায় যে মহম্মদ শাহ সূরের নেতৃত্বাধীনে আরাকানের উপর বাংলার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব ছিল না ,তখন সান্যাল মনে করেন যে বিদেশী শব্দ 'আরাকান' এর সাথে স্থানীয় শব্দের ব্যাপারে মতভেদ রাখা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সান্যালের ২য় যুক্তিটি বিতর্কিত করা যায় না। আরাকান এবং ত্রিপুরার সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনা করলে, যেমনটি সান্যাল করেছেন, এটা বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেতেই পারে যে আরাকানের উপর বাংলার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলে 'আরাকান' শব্দের পাঠ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আরাকান শুধু একটা বিদেশি নামই নয় বরং শব্দে এ রূপটি তখনকার মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল না। মুসলিম ঐতিহাসিকরা সর্বদাই 'রাখাই' এই রূপটি ব্যবহার করেছেন। পাঠটিও পরিষ্কার নয় কারণ এটা দেখতে 'রিকাব' এর মত।[২৫]"

আরাকান শব্দটির পাঠ নিয়ে সম্ভবত বিতর্ক করা যায় না। আরাকান শব্দটি ইংরেজরা ব্যবহার করেছেন এ মর্মে হাবিবুল্লাহর যুক্তিটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। পর্তুগিজ ও ডাচ তথ্যসূত্রে আরাকান শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ১৫৫৪ সালে তুরস্কের নৌবাহিনীর এডমিরাল সিদি আল রাইস 'রাকাঞ্জ'[২৬] নামটি ব্যবহার করেছেন এবং তাই মনে হয় আরবেরা একে 'রাকাঞ্জ' নামেই ডাকত এবং আধুনিক নাম 'আরাকান' আকৃতি ধারণ করতে থাকে সুলতান শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজির ও তার পুত্র সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের শাসন আমল থেকে। সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, সুলতান শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজি চট্টগ্রামকে কার্যকর ভাবেই তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং তিনি তার রাজ্যের সীমানাকে আরাকান এর প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। সুলতান মুহম্মদ শাহ গাজি ইসলাম শাহের গভর্নর হিসেবে ৯৫২-৬০ হিজরি/১৫৪৫-১৫৫৩ সাল পর্যন্ত এবং রাজা হিসেবে ৯৬০-৯৬২ হিজরি/১৫৫৩-১৫৫৫ সাল পর্যন্ত বাংলাকে শাসন করেছিলেন।

সুলতান শামস আল দীন মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার অমাত্য ও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এলাহাবাদের বিপরীত দিকে ঝাঁসিতে সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশকে একত্রিত করেন এবং মৃত সুলতানের পুত্র খিদির খানকে বাংলার সিংহাসনে বসান।[২৭] রিয়াজের তথ্যানুসারে, ইতিমধ্যে আদিল শাহ বাংলার গভর্নর রূপে শাহবাজ খানকে নিয়োগ দেন। খিদির খান, যিনি এখন সুলতান গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ, বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন, গৌড়ে প্রবেশ করেন, শাহবাজ খানকে পরাস্ত ও হত্য করেন এবং সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।[২৮] আমরা দেখি যে, বাংলা কখনোই আদিল শাহের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। অধিকন্তু যখন সুলতান মুহম্মদ শাহ গাজিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত ও হত্যা করা হয়, তখন আদিল তার হাতে আসা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তার সুবিধাজনক অবস্থানকে বাংলার অভিমুখে অগ্রায়িত না করে চুনারে অবকাশে চলে যান।[২৯]

বাংলার পরাজিত সৈন্যদের বাকি অংশ ঝাঁসিতে একত্রিত হয়ে মৃত সুলতানের পুত্র খিদির খানকে বাংলার সিংহাসনে আসীন করেন। সুলতান আদিল শাহ নিজে বাংলায় আগমন করেন নি। তিনি কী তাহলে তার সৈন্য ও সরঞ্জামাদীর সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তাই শাহবাজকে গৌড় দখলের জন্য পাঠিয়েছিলেন? আদিল অবশ্য তখন পরিস্থিতির ভীষণ চাপে ছিলেন এবং গৌড় দখলের চেয়ে উত্তর ভারতে আত্মরক্ষার্থে আরো জনবল ও আনুষঙ্গিক উপকরণ প্রয়োজন ছিল। তাহলে কে এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহবাজ খান যাকে আদিল বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন? তিনি কী সুলতান শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজির বিদ্রোহী সহচরদের একজন যারা আদিলের বিপক্ষে ছাপ্পারঘাটের যুদ্ধে সুলতানের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে বাংলায় পালিয়ে এসেছিলেন? দাউদীর ভাষ্য, "মুহম্মদ খান গৌড়িয়ার সৈন্য তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলার দিকে চলে যায়।"[৩১]

আরো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের অভাবে কেবল অনুমান করা যেতে পারে যে, শাহবাজ খান হয় সুলতান মাহমুদ শাহ গাজির সেই সহচরদের একজন যাদের হাতে গৌড় রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যারা তাদের প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শুনে আদিল শাহের প্রতি তাদের অনুগত্য পরিবর্তন করেন, না হয় শাহবাজ খান হচ্ছেন মৃত সুলতান মাহমুদ শাহের পক্ষ ত্যাগকারী সহচরদের একজন যিনি গৌড় প্রত্যাবর্তনের পর আদিল শাহের পক্ষে বাংলার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এন.বি রায় বলেন, "আদিল শাহবাজ খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং নিজে চুনার প্রত্যাবর্তন করেন।"[৩১] কিন্তু আদিল শাহের শাসনকালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার উপর লিখতে গিয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত এন.বি রায় বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ শব্দের পরিবর্তে গভর্নর হিসেবে স্বীকৃতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় এন.বি রায়ও বিপরীত ধর্মী ঘটনাকে সংশ্লেষ করতে কঠিনতার মুখোমুখি হয়েছেন এবং বিষয়টিকে ব্যাখ্যা না করেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তিনি বাংলার গভর্নর নিযুক্তির ব্যাপারে উভয় ধরনের শব্দই চয়ন করেছেন। তিনি আবার লিখেছেন, "ছাপ্পারঘাটের যুদ্ধের পর বাংলার গভর্নর হিসেবে শাহবাজ খানের এই স্বীকৃতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে শান্তি পুণঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।"[৩২] ছাপ্পার ঘাটের যুদ্ধের পর বাংলার অবশিষ্ট সৈন্যদের দ্বারা সুলতান মুহম্মদ শাহ গাজির পুত্র খিদির খানকে ঝাসিতে বাংলার রাজা হিসেবে মুকুটিত করা হয়। খিদির খান 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন আবু মুজাফ্ফর বাহাদুর শাহ' উপাধি ধারণ করেন। সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি সৈন্য সংগ্রহে নিয়োজিত হন এবং রিয়াজ এর মতে 'দক্ষ সেনাদল নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। তাকে মোকাবিলার জন্য শাহবাজ খান রণাঙ্গনে অগ্রসর হন। বাহাদুর শাহের বিশাল বাহিনী দেখে শাহাবাজ খানের অমাত্যরা তাকে ত্যাগ করে চলে যান। অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে যারা তাকে ছেড়ে যায়নি, শাহবাজ খান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হন।[৩৩] এভাবেই ১৫৫৬ সালের শেষ দিকে খিদির খান, এখন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ, তার বাংলার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।[৩৪]

সুলতান গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ নিজের নামে সিক্কা ও খুতবা পাঠ প্রচলন করেন এবং আদিল শাহের হাতে তার বাবা সুলতান মাহমুদ শাহ গাজির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নেন। আদিল শাহের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহের সামরিক অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দাউদীর বইয়ে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,[৩৫] "যখন হিমুকে হত্যা করা হয় এবং আদলী চুনারের উপকণ্ঠে ছিলেন তখন সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হন মুহম্মদ খানের পুত্র বাংলার শাসক খিদির খান যিনি সুলতান বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং তার নিজের নামে খুৎবা ও সিক্কা (মুদ্রা) চালু করেন। আদলীর বিরুদ্ধে তার বাবা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে এসেছিলেন। আদলী চুনার থেকে বিহারে চলে যান। বিপরীত দিক থেকে সুলতান বাহাদুর মুঙ্গেরে আগমন করেন। আদলী তার বাহিনীকে পাটনায় সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত করেন এবং মুঙ্গেরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পাটনা থেকে বের হয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ নদীর কাছে আসেন। নদীটি পাটনা এবং দরিয়াপুরের মধ্যে কয়েকবার বক্র গতিপথে গিয়ে অবশেষে সোজাসুজি প্রবাহিত হয়েছে। সেখান থেকে তিনি দরিয়াপুর পৌঁছেন। অপরদিক থেকে সুলতান বাহাদুর শাহ মুঙ্গের থেকে শুরু করে আদলির নিকটে পৌঁছান। সুলতান বাহাদুর শাহ তার সব সৈন্যদের নদীর অপর পাড়ে প্রেরণ করেছেন এটা শুনে আদলীও তার সৈন্যদের নদীর অপর পাড়ে প্রেরণ করেন এবং অল্পকয়েকজন সৈন্য নিয়ে নিজে এ পাড়েই থেকে যান। সুলতান বাহাদুর গোপনে সংবাদ পেলেন যে আদলীর বাহিনী গঙ্গা নদীর ধারে পৌঁছেছে। রাতে সুলতান বাহাদুর তার পুরো বহরসহ গঙ্গা নদী পুনরায় পার হলেন এবং ভোর হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে তিনি তার বাহিনীকে আদলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করালেন। আদলী অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। উভয় বাহিনী সুরুজগড় থেকে ২ মাইল দূরে নুল্লায় মিলিত হলো। সুরুজগড়টি পাটনার দিকে যেতে মুঙ্গের থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। আদলী সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। যেহেতু সুলতান বাহাদুরের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, তাই আদলী ৯৬৮ হিজরিতে পরাজিত ও নিহত হন।

একই বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে নিমাত আল্লা লিখেছেন, "হিমুর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর আদলী কিছু দিনের জন্য চুনার দুর্গের উপকণ্ঠে অবস্থান করেন। মুহম্মদ খান গৌড়িয়ার পুত্র খিদির খান, যিনি তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর নিজ নামে গৌড়ে খুৎবা ও মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং সুলতান বাহাদুর উপাধি ধারণ করেছিলেন, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে আদলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আদলীর বাহিনী পরাজিত হয় এবং খিদির খান বিজয়ী হন। সেই যুদ্ধে সাহসিকতা এবং শৌর্যের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আদলীকে হত্যা করা হয়। নিরাপদে এবং নীরবে খিদির খান গৌড়ে ফিরে যান।"[৩৬] রিয়াদ এর মতে, "সুরুজগড় এর জাহাঙ্গীরাহ এর মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়।"[৩৭]

সুতরাং উপরের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে, সুলতান গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহের শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আদিল শাহের হাতে তার বাবার পরাজয় ও হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সবচেয়ে উপযুক্ত এই সময়ে (যখন ইতিমধ্যে হুমায়ুন দিল্লি দখল করে নিয়েছিলেন) তিনি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে গঙ্গা নদীর তীর বরাবর অগ্রসর হলেন। আদিল শাহ চুনার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অগ্রসর হন এবং পাটনায় পৌঁছান। সেখানে তার বাহিনীকে সজ্জিত করে তিনি মুঙ্গের এর দিকে রওয়ানা হন। পাটনা এবং দরিয়াপুর এর মধ্যে তিনি পুনঃপুনঃ নদী অতিক্রম করেন। সেখানে গিয়ে আদিল শাহ সংবাদ পেলেন যে বাহাদুর শাহ তার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন অর্থাৎ গঙ্গানদীর অপর পাড়ে আছেন। তাজ খান কররানী এবং তার ভাইয়েরা এখানে তার সাথে যোগ দেন।[৩৮] বাহাদুর শাহকে প্রতিহত করার জন্য আদিল শাহ তার বাহিনীর উল্লেখযোগ্য বিশাল অংশকে গঙ্গার অপর পাড়ে প্রেরণ করেন এবং নিজে অল্প কিছু সৈন্য সহ ক্যাম্পে অবস্থান করেন। বাহাদুর শাহ তার সৈন্য নিয়ে রাতের আঁধারে গঙ্গা পাড়ি দিলেন এবং শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি করে ফেলেন। আদিল শাহ বিস্মিত হলেন কিন্তু তার বাহিনীকে সুরুজগড় থেকে দুই মাইল দূরে ছোট স্রোতের নিকট একত্রিত করেন। পরের দীন সকালে ফতেহপুর নামক স্থানে যুদ্ধ শুরু হয় এবং বাহাদুর শাহ আদিল শাহকে পরাস্ত ও হত্যা করেন। আর এভাবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ বাংলা ও বিহারের অধিপতি হলেন। এন. বি রায়ের কথায়, যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৫৫৭ সালে[৩৯] এবং করিম স্থানটিকে ফতেহপুর হিসেবে সনাক্ত করেছেন।[৪০] এন. বি রায়ের পর্যবেক্ষণ হলো 'সূর সৌভাগ্যের যে সূর্যটি (১৫৩৪ সালে) সুরুজগড়ে উদিত হয়েছিল তা চিরকালের জন্য অস্ত গেল।'[৪১]

সুলতান বাহাদুর শাহ বিহারের গভর্নর হিসেবে তাজ খান কররানীকে নিযুক্ত করেন এবং নিজে গৌড় ফিরে যান। রহিম বলেন, "বাহাদুর শাহ উচ্চাভিলাসী হয়ে ওঠেন এবং আর একবার মোগলদের ভারত থেকে বিতাড়নের দৃঢ়তা পোষণ করেন যাতে আফগানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়। তাই তিনি বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন এবং ১৫৩৮ সালে ৩০ হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে মোগলদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হন। জৌনপুরের কাছে যুদ্ধে তিনি পুর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে মোগলদের নিযুক্ত ভাইসরয় খান জামানের বাহিনীকে উচ্ছেদ করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন এই ভেবে আফগান সৈন্যরা লুটপাটে লিপ্ত হয়। যখন তারা লুটপাটে লিপ্ত ঠিক সেই সময়ে খান জামান তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। আফগান সৈন্যদের অনেকেই হয় মারা যায় নয়তো ধরাপড়ে। এই পরাজয়ের ফলে বাহাদুর শাহ আফগানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার উপলব্ধি করেন। তখন থেকে সুলতান বাহাদুর শাহ নিজেকে সীমার মধ্যে রাখেন এবং জৌনপুরের মোগল ভাইসরয় খান জামানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।[৪২]

রাজমালার তথ্য প্রমাণাদির সাথে ১৪৮১ সাকা/১৫৫৯ খ্রিঃ বিজয় মাণিক্য কর্তৃক প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার পণ্ডিতদের এটা বিশ্বাস করতে সাহায্য করে যে ত্রিপুরার বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রামসহ আন্ত-মেঘনা অঞ্চল জয় করেছিলেন। ভট্টশালীর ভাষ্য মতে, "সৌভাগ্যবশত বিজয় মাণিক্যের এই পূর্ববঙ্গীয় অভিযানকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রাজমালা বর্ণনা দেন যে ব্রহ্মপুত্রে স্নানান্তে বিজয় ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থে মুদ্রাগুলো ছেপেছিলেন। একইভাবে লক্ষ্যা নদীতে স্নানের পর মুদ্রাগুলো ছাপা হয়। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরের শ্রেণীর মুদ্রাগুলোর একটি পাওয়া গেছে।"[৪৩] ভট্টশালী মুদ্রাগুলোর নিম্নরূপ পাঠ উদ্ধার করেছেন : "লক্ষ্যাস্নায়ী শ্রী শ্রী বিজয় মাণিক্য দেব।"[৪৪]

সুতরাং উপরোল্লিখিত স্বর্ণমুদ্রার তথ্যপ্রমাণ ও রাজমালার তথ্যসূত্র সমন্বয়ে ভট্টশালী এই উপসংহারে পৌছান যে, "বিজয়মানিক্য পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন এবং তার সফলতাও ছিল।[৪৫] তাঁর দেওয়া তথ্যানুসারে আধুনিক ইতিহাসবিদেরা মনে করেন যে, "১৫৫৬ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরা রাজা চট্টগ্রামকে তার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং একদশক বা তার কিছু অল্প সময় ধরে তা ত্রিপুরার দখলে ছিল।"[৪৬]

ড. করিম জনৈক আব্দুর রহমান কর্তৃক রচিত ফার্সি ভাষার একটি কাব্যগ্রন্থ 'মাখজান-ই-গঞ্জে রাজ' আবিষ্কার করেন এবং তার বই 'বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল'[৪৭] এ তার তথ্য ব্যবহার করেছেন। সুলতান গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ গাজির আমলে ৯৬৬ হি./১৫৫৯ খ্রি. ফতেহাবাদে বইটি লিখিত এবং 'তাসাউফ' এর উপরে আলোচিত। বইটির মুদ্রিত কপির শেষ পৃষ্টা (colophon) থেকে জানা যায় যে 'গঞ্জ-ই-রাজের' পাণ্ডুলিপিটি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার অধিবাসী জনৈক মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তার মৃত্যুর পর পাওয়া যায়। তাঁর তিনজন শিষ্য যথাক্রমে মকবুল আহমদ বানারসী, ফাইয়াদ আল রহমান ইসলামাবাদী এবং শামস আল ইসলাম গ্রন্থটি লক্ষ্মৌ থেকে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। মাওলানা আব্দুল হাই চট্টগামের সাতকানিয়ার মির্জারখিল এ সমাহিত আছেন। করিম গঞ্জ-ই-রাজ এর ফতেহাবাদকে চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ বলেই সনাক্ত করেছেন যেটি চট্টগ্রাম মহানগর থেকে ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত।[৪৮]

সুলতান বাহাদুর শাহ গাজি নামটি ও ৯৬৬ হি./১৫৫৯ খ্রিঃ তারিখটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ১৫৫৯ খ্রিঃ/১৪৮১ সাক্কা তারিখ সম্বলিত বিজয় মানিক্যের স্বর্ণমুদ্রাটির আবিষ্কার এই তারিখটির ও এর শাসকের নামের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা ইতিহাসবিদদের উপসংহারে পৌছাতে দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম বিজয় করেছিলেন এবং ১৫৫৬ সাল থেকে ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত অথবা তারও পরে পর্যন্ত চট্টগ্রামকে তাদের অধিকারে রেখেছিলেন। গ্রন্থটি ৯৬৬ হি./১৫৫৯ খ্রিঃ (চট্টগামের) ফতেহাবাদে সুলতান বাহাদুর শাহ গাজির শাসনামলে রচিত। আব্দুর রহমানের গ্রন্থটি এই মন্তব্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যেচট্টগ্রাম ত্রিপুরিয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল । যদি করিম কর্তৃক সনাক্ত করা গঞ্জ ই রাজ এর ফতেহাবাদ চট্টগ্রামস্থ ফতেহাবাদ হয় তাহলে আমরা অনেকটা স্বস্তির সাথেই বলতে পারি যে দিল্লি ও আগ্রার শাসকদের সাথে বাংলার পরপর দুই আফগান শাসকের ব্যস্ততা স্বত্বেও চট্টগ্রাম পাঠান ও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বিজয় মাণিক্যের আন্তঃমেঘনা অঞ্চলে সফলতার বিতর্কের বিষয়ে বলা যায় যে, যদি চট্টগ্রাম সুলতান বাহাদুর শাহ গাজির নিয়ন্ত্রণে থেকে থাকে তাহলে আন্তঃমেঘনা অঞ্চলও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। এতদাঞ্চলে দেশের সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যায় যে, সুলতান মুহম্মদ শাহ এবং সুলতান বাহাদুর শাহ উজানে ভারতবর্ষের সাফল্যের জন্য বাংলা থেকে মানব ও সম্পদের যা কিছু সম্ভব সবই আহরণ করে নিয়েছিলেন। আদিল শাহের সমর্থনে শাহবাজ খানের ঘোষণা বাংলায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। সময়কে উপযোগী পেয়ে এবং সম্ভবত চট্টগ্রামে অসফল হয়ে বিজয় মাণিক্য ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুবিধা গ্রহণ করলেন। রাজধানী গৌড়ে সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে (সম্ভবত মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান এবং জৌনপুরে পূর্বাঞ্চলীয় মোগল গভর্নর খান জামানের হাতে পরাজয়ের কারণে) বিজয় মানিক্য সম্ভবত ভাটি অঞ্চলে গঙ্গা নদীর পবিত্র জলস্রোতে স্নানের জন্য তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। এই তীর্থযাত্রাকেই অতিরঞ্জিত করে পূর্ব বাংলার বিজয় হিসেবে দেখানো হয় এবং স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন দিয়ে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়। এটা অবশ্যই নিশ্চিত করে না যে, বিজয় মাণিক্য অঞ্চলটি জয় করেছিলেন। রাজমালা বিজয় মাণিক্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদী পালন (লাক্ষ্য এবং গঙ্গানদীতে তার স্নান এবং সিলেট জেলার উনকোটিতে পবিত্র স্থান সমূহ ভ্রমণ) ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন নি।

১৫৫৯ সালে চট্টগ্রামের জলসীমা থেকে পর্তুগিজ জাহাজ প্রত্যাহারের ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ যা 'গঞ্জ-ই-রাজ' এর তথ্য প্রমাণকেই সমর্থন করে। পর্তুগিজেরা অঞ্চলটির রাজা রায় পরমানন্দ রায় এর সাথে এক আঁতাতের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে তাদের নৌযানগুলো সরিয়ে বাকলায় (বাকের গঞ্জে, বর্তমান বরিশাল জেলা) স্থানান্তর করে। চুক্তিটি বাঙালী রাজপুত্রের পক্ষে বাকলার রাজা রায় পরমানন্দ রায়, নিমাত খান এবং কানু/গানু বিশ্বাসের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।[৪৪] চুক্তিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্বের ত্রিপক্ষিয় লড়াইয়ে পর্তুগিজেরা স্বার্থপর বিদেশি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জলদস্যু এবং দিল্লি ও বাংলার সূর সুলতানদের শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়। স্থানীয় মুসলমানরা স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের নাক গলানো পছন্দ করতেন না। যেমনটা করতেন না আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের একাধিপত্য ও চরম জলদস্যুতা। তাই সূর এবং স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠি প্রধানদের নিকট অগ্রহণযোগ্য হয়ে পর্তুগিজরা এলাকার ছোটো ছোটো গোষ্ঠী প্রধানদের দ্বারস্থ হয় এবং তাদের সাথে সামরিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করে চট্টগ্রাম থেকে তাদের নৌযানসমূহ সরিয়ে নেয়। ত্রিপুরীয়রা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই এলাকায় সফলকাম হতো তাহলে পর্তুগিজেরা তাদের নৌযান চট্টগ্রাম জলসীমা থেকে সরিয়ে নিত না। তাই আমরা দেখতে পাই যে চট্টগ্রামে আফগানরা তাদের শক্তি এবং কর্তৃত্বকে সুসংহত করেছিল; তারা যে শুধু আরাকানী রাজাকে পরাজিত করে আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত তাদের ভূমি দখল করে নিয়েছিল তাই না, বরং পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম জলসীমা থেকে তাদের নৌযান সরিয়ে নিতেও বাধ্য করেছিল।

জৌনপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সুলতান গিয়াসউদ্দিনের শেষ কটি বছর শান্তিতেই কেটেছিল। তিনি তার পিতা সুলতান মুহম্মদ শাহ সূর এর মৃত্যুর পর যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সকল স্থানীয় গোষ্ঠিপ্রধানরা জেলায় জেলায় আস্তানা গেড়ে বসেছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ১৫৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার ভাই জালালউদ্দিন সূর তার উত্তরাধিকারী হন এবং তিনি গিয়াস আল দীন আবু আল মুজফ্ফর জালাল শাহ উপাধি ধারণ করেন। তার সময়ে তৈরি মসজিদের মাধ্যমে গিয়াস আল দীন বাহাদুর নাম আবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার বাবার কোনো উৎকীর্ণ শিলালিপি যখন পাওয়া যায় নি তখন এই সুলতানের ৫টি উৎকীর্ণ শিলালিপি অবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে (১) রাজমহল জামি মসজিদ লিপি; তারিখ ৯৬৪ হি/১৫৫৭ খ্রি., (২) কুসুম্বা মসজিদ লিপি, মান্দারান, রাজশাহী; তারিখ ৯৬৬ হি/১৫৫৮ খ্রিঃ, (৩) কুমারপুর লিপি, রাজশাহী; তারিখ ৯৬৬ হি./১৫৫৮ খ্রি., (৪) গৌড় লিপি; তারিখ : ৯৬৭ হি./১৫৫৯ খ্রি. এবং (৫) কালনা লিপি; ৯৬৭ হি./১৫৫৯ খ্রি.[৫০]

তার পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী শাসকদের চেয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মুদ্রাও প্রচুর পরিমাণ আবিষ্কৃত হয়। তার মুদ্রাগুলো ৯৬৪ থেকে ৯৬৮ হিজরি কাল পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু একটি মাত্র মুদ্রায় আরাকান ছাড়া অন্যগুলোতে কোনো টাকশালের নাম নেই।[৫১] উৎকীর্ণ লিপিতে তাকে 'সুলতান আল আদিল ওয়াল বাজিল' বা ন্যয় পরায়ন ও বিনয়ী রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, তার আবিষ্কৃত লিপি সমূহের সবগুলোই উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় পাওয়া এবং কোনোটাই দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় পাওয়া যায়নি। উপরের বর্ণনামতে সুলতান গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী হন তার ভাই জালাল আল দীন যিনি সুলতান গিয়াস আল-দুনিয়া-ওয়াল দীন আবু আল মুজফ্ফর জালাল শাহ উপাধি ধারণ করেন। এ পর্যন্ত এই সুলতানের দুটো উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে বগুড়া জেলার শেরপুর মুর্ছা থেকে[৫২] তারিখ ৯৬০ হি./১৫৬৩-৬৪ খ্রিঃ বগুড়া লিপি যেটি ৯৬০হি./১৫৫৩ খ্রিঃ খচিত (যখন তার বাবা দেশ শাসন করছিলেন) সেটি ঐতিহাসিক ও লিপি বিশারদদের বিপাকে ফেলেছে। শামস আল দীন আহমেদ লিখেছেন "বর্তমান লিপিটি অদ্ভুত ধরনের এই জন্য যে জালাল শাহ নামটি এবং ৯৬০ হিজরি তারিখটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জালাল শাহ ৯৬০ হি. তে বিদ্রোহ করেন এবং সেই বছরেই রাজকীয় মুকুট ধারণ করেন। কিন্তু আমরা সমসাময়িক কোনো ইতিহাসেই জালাল খানের বিদ্রোহের কথা পাই না। যা জানা যায় তা হচ্ছে যে নয় বছর পরে জালাল শাহকে বাংলার রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৫৩] রহিমের উপসংহারটি এরূপ "জালাল নিজেকে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তিনি তার বাবার কাছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবী করেছিলেন এবং তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছিল।"[৫৪] মুদ্রাটি এখন চালু নয় এতে তাই তারিখটি খোঁদাই করা হলো না। তার ৯৫৫ হিজরি/১৫৫১-৫২ খ্রিঃ এর মুদ্রাটির আবিষ্কার বাংলার জালাল শাহের ভূমিকাকে আরো জটিল করে তুলেছে। মুদ্রাটির পাঠ এরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্মুখভাগ	পিছন ভাগ
বর্গাকার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	বৃত্তাকারে বাহাদুর শাহ সুলতান বিন
তারপর বাঁকা এলাকায় :	মুহম্মদ শাহ সূর সুলতান খালিদ আল্লা
আস সুলতান বিন সুলতান	মুলকুহু ওয়া সুলতানুহু
মার্জিনাল অংশে	টাকশাল আরাকান
উপরে -ঘষা হয়েছে	তারিখ ৯৫৯ হিজরি
বামে -কাটা	
নিচে -কাটা	
ডানে -?	

মুদ্রাটির তাৎপর্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে ড. করিম লিখেছেন "এই মুদ্রার তারিখটি ৯৫৯ হি. যা লক্ষণীয়। গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ ৯৫৯ হিজরির অনেক পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এমনকি তার বাবা শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজির সিংহাসন আরোহণের প্রথম তারিখ হচ্ছে ৯৬০ হিজরি। এই তারিখের তাই কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না শুধু এই কথা ছাড়া যে সম্ভবত একটি পুরাতন মুদ্রা নতুন করে ছাপা হয়েছে কিন্তু পুরাতন তারিখটি অসাবধানতাবশত রয়ে গেছে।[৫৫]

মুদ্রা এবং লিপি উভয় তথ্য প্রমাণ থেকে এটা পরিষ্কার যে জালাল উদ্দিন ৯৫৯-৬০ হিজরিতে/১৫৫১-১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার জারিকৃত মুদ্রার প্রথম তারিখটি হচ্ছে ৯৬০ হিজরি। যেহেতু প্রমাণটি বস্তুনিষ্ঠ সুতরাং বলা যেতে পারে যে জালাল উদ্দিন নিজেকে বগুড়া অঞ্চলে রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন যা তার অধীনে ন্যস্ত ছিল। এটা আফগানদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের একটা সাধারণ প্রবণতার প্রকাশ এবং বাংলায় শেরশাহের মুলুক আল তাওয়ায়েফ সৃষ্টির ফল অথবা উচ্চাভিলাষী ভাইদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তার ভাইয়েরা যে কোনো ভাবে হোক তাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। যেহেতু জালাল উদ্দিন ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং সম্ভবত তিনি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ে তার ভাইকে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন, সুতরাং ভাইদের এবং বাবার মধ্যে সমঝোতার সব রকম সম্ভাবনাই রয়েছে। সুতরাং মুহম্মদ শাহ তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এবং বাহাদুর শাহ তার শাসন কালে এটা সমর্থন করে নিশ্চিত করেন। এরপর থেকে জালাল খান বাংলায় গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তার ভাইকে সমর্থন দিয়ে যান।

১৫৫৬ সালে মোগলরা দিল্লি এবং আগ্রা পুনরুদ্ধার করে এবং ধীরে ধীরে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে তাদের আধিপত্য সম্প্রসারণ করতে থাকে। সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেন। রহিম বলেন, "তিনি মোগলদের উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকেন এবং উত্তর ভারত পুনরুদ্ধারে চুনার ও রোহতাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর আফগানদের অভিযানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।"[৫৬] গৌড় নগরীতে ১৫৬৩ সালে সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ মৃত্যুবরণ করেন।[৫৭]

সুলতান গিয়াস আল দীন আবু আল মুজাফ্ফর জালাল শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র, যার নাম জানা যায় নি, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ পর্যন্ত তার কোনো মুদ্রা বা লিপি আবিষ্কৃত হয় নি। রিয়াজ বলেন, "জালাল আল দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র (নাম জানা যায় নি) সিংহাসন আরোহণ করে সংক্ষিপ্ত কর্তৃত্বেও ঘোষণা জারি করেন এবং ৭ মাস ৯ দিন যেতে না যেতেই গিয়াস উদ্দিন তাকে হত্যা করে বাংলার সার্বভৌমত্ব দখল করেন।[৫৮] এভাবেই বাংলায় সূর আফগানদের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

উচ্ছেদকারী শাসক গিয়াস উদ্দিন উপাধি ধারণ করেন, সিংহাসনে বসেন এবং এক বছর ১১ দিন শাসন করেন মর্মে রিয়াজ বর্ণনা করেছেন।[৫৯] বিহারে বাংলার সুলতান গভর্নর সুলায়মান খান কররানী পরিস্থিতির উপর তার প্রতিক্রিয়া দেখান। ১৫৬৪ সালে তিনি তার ভাই তাজ খান কররানীকে গৌড়ে প্রেরণ করেন যিনি বাংলার সূর সুলতানকে উচ্ছেদকারী গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তিনি নিজেকে সুলায়মান খান কররানীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সূর আফগানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কররানী আফগানদের হাতে চলে যায়। আর এভাবেই বাংলায় কররানী আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাদটীকা সূত্রসমূহ

১. নিমাত আল্লা-১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪। তিনি লিখেছেন (ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি) পৃ. ৩৭৪, ৩৭৫ এ পাদটীকা ১ দেখুন

২. উপরোল্লিখিত-পৃ. ৩৮৮-৮৯। (ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি) "ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের কর্মকর্তা ও অমাত্যবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে বারো বছর বয়স্ক ফিরোজ খানকে সিংহাসনের জন্য সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা ছাপার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মাত্র ৩ দিন পর ইসলাম শাহের শ্যালক ও শেরশাহ সূরের ভাই নিজাম খান এর পুত্র মুবারিজ খান ফিরোজকে হত্যা করে তার মায়ের উপস্থিতিতে তরবারির আঘাতে"

৩. উপরোল্লিখিত পৃ. ৩৮৯। ডর্ন দেখুন পৃ. ১৭১

৪. নিমাত আল্লা ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১। তিনি লিখেন, "যখন আদলির সিংহাসন আরোহণের সংবাদ এবং ফিরোজ খানের মৃত্যুর সংবাদ দুরবর্তী প্রদেশ সমূহের অমাত্যদিগের নিকট পৌছায়, প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে সিংহাসনের প্রতি আসক্ত হয়ে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার অবস্থা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ডর্ন-পৃ. ১৭২

৫. চার্লস স্টুয়ার্ট হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, কলিকাতা-১৯০৩; পৃ. ১৬৫। আরো দেখুন নিমাত আল্লা ১ম খণ্ড, পাদটীকা-১ পৃ. ৩৯৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬. এন.বি রায়, পৃ. ৬৯, এইচ,বি ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯। "আরাকান টাকশাল থেকে জারি করা তার মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় তিনি গাজি উপাধিও ধারণ করেছিলেন। সূত্র জার্নাল অব দি ন্যুমিসমিটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া : ২৭ খণ্ড ১ম অংশ, ১৯৬৫, পৃ. ৭১

৭. নিমাত আল্লা : ১ম খণ্ড পৃ. ৩৯৮-৪০০ (এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে)

৮. ডর্ন : পৃ. ১৭৫।

৯. রিয়াজ : পৃ. ১৪৬-১৪৭। নিমাত আল্লা : ১ম খণ্ড, পাদটীকা-১ পৃ. ৩৯৮

১০. নিমাত আল্লা : পৃ. ৪০০। এন.বি. রায় পৃ. ৭৬

১১. দাউদী পৃ. ২০০। তারিখ-ই-মুস্তাকী। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপির একটি রোটোগ্রাফ কপি পৃ. ১৪৪। ফার্সি উদ্ধৃতির ইংরেজি অনুবাদ থেকে "মুহম্মদ খান গৌড়িয়ার সৈন্যরা অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয় যখন যুদ্ধ থেকে তাদেরকে সুসজ্জিত করা হয় কিন্তু তারা তাকে একা ফেলে বাংলার দিকে চলে যায়। মুস্তাকী বলেন আদিলের সৈন্যের দ্বারা মুহম্মদ খান নিহত হন। (ফার্সি উদ্ধৃতি)... যারা তাকে একা ফেলে যায় তারা বেঈমান প্রমাণিত হয়

রিজক আল্লা মুস্তাকি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপির একটি রোটোগ্রাফ কপি পৃ. ১৪৪

১২. এইচ, বি ২য় খণ্ড পৃ. ১৭৯। এন,বি রায় পৃ. ৭৬। রিয়াজ পৃ. ১৪৮।

১৩. চার্লস স্টুয়াট হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, কলি ১৯০৩। পৃ. ১৬৫। রিয়াজ পৃ. ১৪৯, পাদটীকা-৩ "এই সময়ে দক্ষিণ বিহারের আধা-স্বাধীন গভর্নর হিসেবে সুলায়মান কররানী কাজ চালিয়ে যান। পাশাপাশি সুলতান নুসরাত শাহের সময় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা হাজিপুর দক্ষিণ বিহারের বাংলা গভর্নরদের সদরদপ্তর হয়ে ওঠে। সম্রাট আকবরের সময় থেকে পাটনা বিহার গভর্নরদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শেরশাহ পাটনার দুর্গ নির্মাণ করেন... বাদাউনী মুন্তাখাব আল তাওয়ারিখ, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৩০, এ বিবৃত আছে "বাংলার শাসক মুহম্মদ খান সূর সুলতান জালাল উদ্দিন উপাধি গ্রহণ করেন এবং বাংলা রাজ্যকে জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।" অবশ্য এটা সঠিক না কারণ তার নিজের মুদ্রায় দেখা যায় যে তিনি শামস আল দীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, (জালাল আল দীন নয়) আরো দেখুন নিমাত-আল্লা ১ম খণ্ড পৃ. ৩৯৮ পাদটীকা-১

১৪. রাজমালা (সম্পাদিত) কে,পি, সেন ২য় খণ্ড পৃ. ৪৭

১৫. ভট্টশালী বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' গ্রন্থে 'বেঙ্গল চিফস স্ট্রাগল ফর ইনডিপেন্ডেন্স"। খণ্ড ৩৮, ১৯২৯, পৃ. ২০

১৬. জে এ এস বি, খণ্ড-১৮ সংখ্যা-১, ১৯৫২, পৃ. ২৫-২৬

১৭. এ,পি ফাইরে হিষ্ট্রি অব বার্মা, পৃ. ৮০। সর্বমোট নয়টি নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে বাইরে ১টি , রবিন্সন এবং এল,এ ,শ' ৫টি (কয়েন্স এণ্ড ব্যাংক নোটস অব বার্মা, ম্যানচেষ্টার, ১৯৮০ পৃ. ৫১), সেন থা আউং ৩টি (রেখাইং দিংগা মাইয়া, আরাকানী মুদ্রা) গোচরীভূত হয়। আই সেট এর ইংরেজি অনুবাদ যা বাজারজাত করে এম, রবিনসন্স এবং আই সেট। ম্যানচেষ্টার, ১৯৮০, প্লেট-১৫। আকার ডায়মিটার ১৮ মি.মি. ওজন ২.৪০ থেকে ২.৪৭ গ্রাম পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮. এম, রবিনসন ও এল.এ.শ' কৃত 'কয়েন্স এণ্ড ব্যাংক নোটস অব বার্মা, ম্যানচেষ্টার ১৯৮০ পৃ. ৪৫

১৯. করিম "Was Chittagong ever a capital city? A Fresh Study of Some Rare Coins of Chitttagong" জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-১৯৮৬

২০. এইচ. এন. রাইট 'ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম', কলিকাতা, ২য় খণ্ড নং-২২৯, পৃ. ১৮০। লেনপুল 'ক্যাটালগ অব কয়েন্স অব দি মুহম্মাদান সুলতানস ইন দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম' : নং-১৫২-১৫৪, পৃ. ৫৬-৫৭

২১. এম রবিন্সন এবং এল,এ, শ' কৃত 'কয়েন্স এন্ড ব্যাংক নোটস অব বার্মা, ম্যানচেষ্টার, ১৯৮০, পৃ. ৫২

২২. জে এ এস বি-খণ্ড-১১, ১৯৪৫ পৃ. ৩৬

২৩. উপরোল্লিখিত : খণ্ড-১৭, নং-০১, ১৯৫১, পৃ. ১১-১৩

২৪. উপরোল্লিখিত খণ্ড-১৮, নং-০১, ১৯৫২, পৃ. ২৬

২৫. 'জার্নাল অব দি ন্যুমিসমিটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' খণ্ড-২৭, ১৯৬৫, ১ম অংশ, পৃ. ৭৯

২৬. জে, এ, এস, বিডি খণ্ড-১৬, নং-৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ-২৩৩। করিম সম্প্রতি এই মত গ্রহণ করেছেন। দেখুন "Was Chittagong ever a capital city? A Fresh Study of Some rare Coins of Chitttagong" "জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন-১৯৮৬

২৭. রিয়াজ পৃ. ১৪৮, পাদটীকাঃ ১। লিখিত আছে শামস আল দীন আবুল মুজাফ্ফর মুহম্মদ শাহ কে ঝাসিতে ক্ষমতায় বসানো হলো যেখানে ছাপ্পার ঘাটার যুদ্ধের পর মুহম্মদ শাহের পরাজিত অমাত্যরা এবং কর্মকর্তারা সমবেত হয়েছিলেন। এন,বি রায় পৃ. ৯৮

২৮. উপরোল্লিখিত পৃ. ১৪৮

২৯. নিমাত আল্লা পৃ. ৪০০; দাউদী পৃ. ২০০। নিমাত আল্লা বলেন (ফার্সি উদ্ধৃতি আছে) 'আদলী বিজয় ও সম্পদ প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং জাকজমকের সাথেই চুনারের দিকে অগ্রসর হন।' কিন্তু দাউদী লিখেছেন, 'আদলীর হাতে মুহম্মদ শাহ নিহত হন এবং আদলী সম্পদশালী হয়ে ওঠেন এবং সেখান থেকেই তিনি চুনার এর দিকে অগ্রসর হন'

৩০. দাউদী : পৃ. ২০০

৩১. এন, বি রায় পৃ. ৮০। স্টুয়ার্ট লিখেন 'গৌড়ে বাহাদুর শাহের আগমনের ফলে তিনি জানতে পারেন যে,শাহবাজ খান নামে এক গোষ্ঠীপ্রধান বাংলার সৈন্যদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ জানতে পারায় সম্রাট আদিলের নামে সেই নগরীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতা দখলকারী অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই তার বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হন, তাকে বন্দি করা এবং হত্যা করা হয়। চার্লস স্টুয়ার্ট হিস্ট্রি অব বেঙ্গল কলি ১৯০৩ পৃ. ১৬৬

৩২. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৯৮

৩৩. রিয়াজ পৃ. ১৪৮

৩৪. এন,বি রায় পৃ. ৯৮

৩৫. দাউদী পৃ. ২০২-২০৩। (এখানে বিশাল এক ফার্সি উদ্ধৃতি আছে)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৬. নিমাত আল্লাঃ খণ্ড-১, পৃ. ৪০২-৪০৩ (এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে)
৩৭. রিয়াজ পৃ. ১৪৮, পাদটীকা-২
৩৮. উপরোল্লিখিতঃ পৃ. ১৪৯, পাদটীকা-১, এন,বি রায় : পৃ. ১০১, রহিম পৃ. ১৬৭
৩৯. এন,বি রায়ঃ পৃ. ১০০
৪০. সুলতানী আমল, পৃ. ৪৭০; রিয়াজ পৃ. ১৪৯, পাদটীকা-১
৪১. এন,বি রায় ; পৃ. ১০০। পণ্ডিত অবশ্য ভুলে গেছেন যে গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহও সূর বংশোদ্ভূত। পর্যবেক্ষণটা আরো ভালো হচ্ছে দিল্লিতে সূর সাম্রাজ্যের ভাগ্যের উন্নয়ন অস্তমিত হয় পূর্বাঞ্চলে সূর রাজ্যের উদ্ভবের মধ্যে
৪২. রহিম পৃ. ১৬৭। বাদাউনী ২য় খণ্ড পৃ. ২৫
৪৩. রহিম পৃ. ১৬৭। এন,বি রায় পৃ. ১০১
৪৪. ভট্টশালী "*Bengal chiefs struggle for independence in Bengal Past and present*" খণ্ড-৩৮, ১৯২৯, পৃ. ২১
৪৫. উপরোল্লিখিত : পৃ. ২১
৪৬. উপরোল্লিখিত পৃ. ২১
৪৭. 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' ১৯৭৬, পৃ. ৭১
৪৮. সুলতানী আমল, পৃ. ৫৫২-৫৩; পাদটীকা-২ এবং ৪
৪৯. সুলতানী আমল, পৃ. ৫৫২-৫৩; পাদটীকা-১ ও ২ দেখুন
৫০. এইচ. বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮
৫১. খচিত মুদ্রা খণ্ড-৪ পৃ. ২৪১-২৪৭
৫২. সুপরা পৃ. ১২৩
৫৩. খচিত মুদ্রা খণ্ড ৪, পৃ. ২৪৮
৫৪. উপরোল্লিখিত
৫৫. রহিম, পৃ. ১৬৮
৫৬. করিম Catalogue of the Coins in the Cabinet of the Chittagong University Museum Chittagong. ১৯৭৯. পৃ. ৬৭
৫৭. উপরোল্লিখিত পৃ. ৬৮
৫৮. রহিম পৃ. ১৬৮
৫৯. এইচ এম রাইট ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম খণ্ড-২ পৃ. ১৮১। মুদ্রাটিতে ৯৭০ হি./১৫৬৩ খ্রি. তারিখ মুদ্রিত। রিয়াজ বলেন "তিনি বাংলা ও উত্তর বিহারে ৯৬৮-৯৭১ হি./ ১৫৬১-১৫৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।" এই সময়ে সুলায়মান কররানী দক্ষিণ বিহারের আফ্গার স্বাধিন গভর্নর হিসেবে ছিলেন। নুসরাত শাহের সময় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা হাজিপুর উত্তর বিহারের বাংলার গভর্নরদের সদর দপ্তর হয়ে ওঠে
৬০. রিয়াজ পৃ. ১৪৯-৫০
৬১. উপরোল্লিখিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়
কররানী বংশ

সুর আফগানদের মতো কররানী আফগানরাও নিম্ন গোত্রের ছিলেন যারা লোদী শাসনকালে অজানাই ছিল। আজমল খান কররানী ছিলেন তাজ খান কররানী, সোলায়মান কররানী, ইলিয়াস এবং ইমাদ খান কররানীর পিতা। তাজখান কররানীর পিতা আজমল খান কররানীর নাম শুধুমাত্র একটা লিপি থেকে জানা যায়।[১]

শেরশাহ সূরের সময়ে তাজ এবং সোলায়মান খ্যাতি লাভ করেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন এর বিরুদ্ধে এই দুই ভাই বিলগ্রামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, শৌর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাদের প্রদত্ত সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ শেরশাহ তাদের কে খাসপুর, তান্ডা এবং দক্ষিণ বিহারের গঙ্গা নদীর পাড়ে বিভিন্ন জায়গায় জায়গির প্রদান করেন। তাজখান কররানীর শৌর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার জন্য শেরশাহ তাজখানকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন এবং তার পুত্র জালাল খানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে নিয়োগ দেন।[২]

সিংহাসন আরোহণের পর জালাল খান (এখন ইসলাম খান) তাজ খানকে তার প্রধান অমাত্য এবং উপদেষ্টা পদে উন্নীত করেন। তাজ খান ইসলাম শাহকে মূল্যবান সেবা প্রদান করেছিলেন। হুসেন শাহী বংশে সুলতান মাহমুদ শাহের জামাতাদের একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত্র সোলায়মান বাইসা যখন বাংলার ভাটি অঞ্চলে বিদ্রোহ করেন, তখন দীর্ঘ যুদ্ধের পর চাতুরীর দ্বারা দরিয়া খানের সহযোগিতায় তাজ খান তাকে গলাটিপে হত্যা করেন।[৩]

মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম শাহ তাজখান কররানীকে তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরোজ এর অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। সিংহাসন আরোহণের পর ফিরোজ তাজ খানকে সুলতানের অধীনে সর্বোচ্চ সরকারি পদ উজির হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাজ খানের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হওয়ায় আফগান প্রধানেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং বালক সুলতান ও তার উজিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। আদিল শাহ বালক সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং শেরশাহের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাজ খানকে সন্দেহ করে তাকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৪] তাজ খান আদিলের দরবার থেকে পালিয়ে বাংলার দিকে রওয়ানা দেন। এ সংবাদ পেয়ে আদিল শাহ একদল সৈন্য সহ তাকে অনুসরণ করেন এবং আগ্রা ও জৌনপুরের মাঝামাঝি ছাপরামাত্তা নামক স্থানে যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। পরাজিত হয়ে তাজ খান তার ভাই সোলায়মান, ইলিয়াস এবং ইমাদের সাথে যোগ দিতে পালিয়ে যান।[৫] ভাইয়েরা দক্ষিণ বিহারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেদের জন্য রাজ্য চিহ্নিত করে আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ১৫৫৪ সালে আদিল শাহ তার সেনাধ্যক্ষ হিমুকে কররানীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। হিমু চুনারের নিকট কররানীদের পরাজিত করেন।[৫] কিন্তু ইব্রাহিম খান সুরের বিদ্রোহ ও দিল্লি এবং আগ্রা দখল তাজ খানের বিরুদ্ধে আদিলের শক্তিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। পরাজিত হয়েও কররানীরা দক্ষিণ বিহারের প্রভুত্ব বজায় রাখেন। নিমাত আল্লা এবং গোলাম হোসাইন বলেন যে, হিমু কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর কররানীরা গৌড় অভিমুখে চলে যান এবং নগরীটি দখল করেন। নিমাত আল্লার বর্ণনা একটা কল্প কাহিনির মতো যা অনেকটি এ রকম :

"হিমু এই বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং তাজ তার ভাইদের সাথে গৌড় ছুটে গিয়েছিলেন। গৌড়ের তৎকালীন শাসক সেলিম খান কাকর 'মসনদে আলা' উপাধি ধারণ করেছিলেন। ৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং পাহাড়ের মতো ৫০০ হাতিসহ তিনি পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চিত করেছিলেন। তাজ খান তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ছুটে গেলেন এবং আদিলের ফরমান দেখালেন যাতে এ মর্মে লেখা ছিল যে তাজ খানের সৈন্য পর্যবেক্ষণ করে সেলিম খান এর তাকে জায়গির ও ভরণপোষণ ভাতা মঞ্জুর করা উচিত। এই অজুহাতে তিনি তার সৈন্যদের বিন্যস্ত করে সেলিম খান কাকরের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। যে সময় সেলিম খান সৈন্য পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাজ খানের তখন বিশাল সৈন্য সমাবেশিত ছিল। তিনি বলেন, যদি তারা আপনার সাহচর্য দেয় তাহলে আমার লোকেরা আপনার নজরেই আসবে না। তারপর সেলিম খান মুক্ত মনে তাজ খানের অধীনে রক্ষিত সৈন্য পরিদর্শনে যান। তার সাথে ছিল ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া ৫০/৬০ জন অমাত্য এবং অনুগত। সময়কে অনুকূল পেয়ে সুযোগ বুঝে তাজ খান সেলিমকে আঘাত করে ফেলে দিলেন। সেনাদলে বিরাট উত্তজনা ছড়িয়ে পড়ল। কাকর বাহিনী অন্যান্য দল প্রধানদের সাথে তাজ খানের দিকে প্রতিশোধ নেয়ার মতো করে ছুটে গেল। এখন তিনি আর একটি ফরমান প্রদর্শন করেন এবং বলেন, 'আমি আদিলের নির্দেশনা মতোই সেলিম খানকে হত্যা করেছি'। ফরমানের বিষয়বস্তু পড়ে অমাত্যবৃন্দ তাদের উদ্দেশ্য সাধন থেকে বিরত থাকলেন। অমাত্যদের বড় একটা অংশ তার (তাজ খানের) নেতৃত্ব মেনে নেওয়াটাই পছন্দ করলো। অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও অসংখ্য হাতি তাজ খানের হস্তগত হলো এবং তিনি দেশটাকে তার নিয়ন্ত্রণে আনলেন।"[৬]

নিমাত আল্লার উপর্যুক্ত বিবরণ প্রকাশ করে যে, ক) কাকররা ছিল আদিল শাহের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ গোষ্ঠী এবং আদিল শাহ সেলিম খান কাকর এর নেতৃত্বে বাংলা দখল করেছিলেন। খ) তিনি ছিলেন শক্তি শালী শাসক যার শক্তিশালি সেনাবাহিনী ছিল। গ) আদিল শাহের সেনাধ্যক্ষ হিমু যখন কররানীদের বিহারে পরাজিত করেন, তারা দ্রুত বাংলা অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন এবং ছল চাতুরীর মাধ্যমে সেলিম খানকে হত্য করে গৌড় দখলে নিয়েছিলেন। ঘ) সেলিম খানের অমাত্যরা তাজ খানকে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এলাকার শাসক হিসেবে মেনে নেন যখন তাজ খান তাদের সেই ফরমান প্রদর্শন করেন যেখানে আদিল শাহের নির্দেশে সেলিম খানের হত্যার কথা বলা হয়েছে। আর ঙ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বেই তাজ খান গৌড় দখল করেছিলেন। রিয়াজ বলেন, "মুহম্মদ শাহ আদিল যখন তার বাহিনী নিয়ে কররানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে যান এবং গঙ্গা নদীর পাড়ে যখন দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন মুহম্মদ আদিল শাহের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মুদি দোকানী হিমু এক 'হলকাহ' পরিমাণ হাতি নিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়। আদিল শাহের এক ভগ্নিপতি ইব্রাহিম খান সূর পালিয়ে গিয়ে দিল্লি দখল করে সমস্যার সৃষ্টি করলে মুহম্মদ আদিল শাহ বাধ্য হয়ে কররানীদের ত্যাগ করে দিল্লি ফিরে যান। আর এই ভাবে কররানীরা স্বাধীন হয়ে যায়। আর বাংলা রাজ্য জয় করে নয় বছর শাসন করার পর যখন তাজ খানকে শুধুমাত্র গৌড় নগরীটি তার অধীনে রাখা হলো তখন তিনি অন্যান্যদের মতই মৃত্যুবরণ করেন।"[৭] ইতিহাস জানা তথ্য অবশ্য এ ধরনের মতকে সমর্থন করে না। আর জানা ইতিহাস হচ্ছে

ক) তাজ খান অবশ্যই গৌড় দখল করেছিলেন কিন্তু তা ৯৭০ হি./১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে নয়। খ) দিল্লির সিংহাসনে আদিল শাহের আরোহণ এবং তাজ খান কররানীর গৌড় দখলের সময় থেকে সেলিম খান কাকর নামে বাংলায় কোনো শাসকের বিষয়ে নিমাত আল্লার বিবরণ ছাড়া আর কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। গ) ১৫৪৫ সালে কাজি ফজিলাৎ এর পরিবর্তে মুহম্মদ খান সূরকে ইসলাম শাহ কর্তৃক বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। ঘ) যখন আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুহম্মদ খান সূর গৌড়ে তার স্বধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান শামস আল দিন মুহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির মসনদ দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত হন এবং আদিল শাহ কর্তৃক ছাপ্পারঘাটের যুদ্ধে ১৫৫৬ সালে নিহত হন। ঙ) শাহবাজ খানকে বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত করেন আদিল শাহ। চ) পরাজিত বাহিনীর অমাত্যরা বাংলায় মৃত সুলতানের পুত্র খিদির খান কে এলাহাবাদের নিকট ঝাঁসিতে বাংলার সিংহাসনে বসান এবং খিদির খান ১৫৫৫ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন। ছ) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ বাংলা অভিমুখে ছুটে যান, শাহাবাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করে তার সিংহাসন দখল করেন। জ) তাজ খান কররানী অনেকদিন পর অর্থাৎ ১৫৬৪ সালে জবরদখলকারী গিয়াসউদ্দীন কে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড় দখল করেন।[৮] ঝ) ইতিহাসে উপরোল্লিখিত জবরদখলকারী গিয়াসউদ্দীন অথবা যে শাসক কে হত্যা করে তিনি ক্ষমতা জবরদখল করেন তাদের কারোরই পুরো নাম পাওয়া যায়নি। বাংলা রাজ্যে লিখিত ঐতিহাসিক সাহিত্যের দৈন্যদশাই এ ধরনের অনেক শাসকের বিষয়ে ধোয়াশার কারণ। শিলালিপির তথ্য প্রমাণ এ ধরনের শাসকদের অনেককেই ধোয়াশা থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে। সুলতান গিয়াস আল দীন জালাল শাহের মৃত্যুর পর যে দুইজন শাসক পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রিয়াজ তাদের পুরো নাম আমাদের জানাতে পারে নি। সুতরাং পরবর্তী সহায়ক এবং সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নিমাত আল্লার উপর্যুক্ত তথ্য প্রমাণ গুরুত্ব দিয়ে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

আবুল ফজলের মতে তাজ খান এবং তার ভাইয়েরা বাংলার সূর সুলতানদের সাথে কখনো বৈরিতা আবার কখনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখেছে।[৯] এর দ্বারা এটা বোঝা যায় যে তাজ খান বাংলার শাসক মুহম্মদ খান সুরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল যদিও মুহম্মাদ খান সূর দক্ষিণ বিহারে কররানীদের স্বাধীন অস্তিত্ব সহ্য করতে পারতেন না। দিল্লি ও গৌড়ের দুজন শক্তিশালী শাসক যথাক্রমে সুলতান আদিল শাহ ও সুলতান মুহম্মদ শাহ এর মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকায় তিনি নিজের অবস্থানকে বেশ অনিরাপদ মনে করতেন। তাই তিনি বাংলার নতুন সুলতানের সাথে শান্তি সন্ধি করলেন এবং এর শাসককে আদিল শাহের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করলেন। অবশ্য মুহম্মদ শাহ সূর পরাজিত ও নিহত হন। তার পুত্র খিদির খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন। আদিল শাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলে কররানীরা বাংলায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং সুরুজগড়ের নিকট ফতেহপুরে বাংলার শাসকের পক্ষে যুদ্ধ করেন। আদিল কে পরাজিত ও হত্য করা হয়। ১৫৫৯ সালের এক শিলালিপিতে দেখা যায় যে, তাজ খান তার নিম্নপদেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের নিকট থেকে মসনদে আলা উপাধি লাভ করেন।[১০]

পূর্বের বিবৃতি মতে ইতিমধ্যে মোগলরা দিল্লি এবং আগ্রা তাদের দলে এনে আশ পাশের এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করে। জৌনপুরে অবস্থানরত খান জামানকে সম্রাট আকবর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের গর্ভনর নিযুক্ত করেন। বাহাদুর শাহের শাসনের শেষ দিকে তাজ খান আনুগত্যহীনতার লক্ষণ প্রদর্শন করলে তাকে গৌড়ে ডেকে পাঠনো হয়। কররানী প্রধান তার প্রভুর ডাক উপেক্ষা করে মোগল গর্ভনর খান জামানের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন এবং ভাই সোলায়মান কররানীকে বাংলা আক্রমণে প্রেরণ করেন। কররানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বাহাদুর শাহ এক বিশাল সেনাদল গড়ে তোলেন কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন।[১১] ভাই সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ তার স্থলাভিত্তিক হন। তিনি কররানীদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতেন। দৃশ্যত দক্ষিণ বিহারে সার্বভৌম এক সুলতান হিসেবে তাজ খান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ তাজ খানের সাথে শান্তি স্থাপন করে কররানীদের আগ্রাসন এড়াতে সক্ষম হন।

১৫৬৩ সালে সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহের মৃত্যুর পর গণ অসন্তোষ শুরু হয় এবং দক্ষিণ বিহারে বাংলার সুলতান এর গর্ভনর সোলায়মান খান কররানীর পক্ষে তাজ খান এই গণ অসন্তোষের সমাপ্তি করেন। তাজ খান গৌড় দখল করেন এবং প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক বছর বাংলা শাসন করে ১৫৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১২] তাজ খানের মৃত্যুর পর সোলায়মান খান কররানী গৌড় অধিকারে আনেন এবং উত্তর পশ্চিম বাংলা ও পুরো দক্ষিণ এবং উত্তর বিহারে তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত ও সুসংহত করেন। সোলায়মান কররানীর ক্ষমতারোহণ বাংলায় এক অভূতপূর্ব শান্তিময় সমৃদ্ধি ও উন্নতি সূচনা করে। তিনি জৌনপুরের মোগল ভাইসরয় খান জামানের সাথেও কুটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখেন।[১৩]

ইত্যবসরে সম্রাট হুমায়ুন ১৫৫৫ সালের মাঝামাঝি দিল্লি অধিকার করেন কিন্তু ১৫৫৬ সালের প্রথমাংশে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র আকবর অপ্রাপ্ত বয়সেই সিংহাসন আরোহণ করেন। তখন থেকেই মোগলরা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে তাদের শক্তি ও অবস্থানকে সুসংহত করতে থাকে এবং আফগান শাসনের শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে ওঠা বাংলা ও বিহার দখলের সুযোগ খুজতে থাকেন। সূর শাসকেরা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য অসফল প্রচেষ্টা নিয়েছিল। তারা ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যায়। রহিমের ধারণা ভুল যে, তাজ খানের মৃত্যুর পর সোলায়মান কররানীর বাংলা ও বিহারে শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।[১৪] তাজ খান বিহার কিংবা বাংলায় কখনোই শক্তিশালী শাসক ছিলেন না। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সোলায়মান কররানী তার নিজের জন্য দক্ষিণ বিহারে একটি রাজ্যের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন।

গোয়ালিয়রে আদিল শাহের সিংহাসনে আরোহণের পর তাজ খান ও তার অন্য ভাইয়েরা তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় তার ভাই সোলায়মান, ইলিয়াস ও ইমাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং ভট্টশালী যথার্থই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "যখন জালালের (গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহের) পুত্রের এক হত্যাকারীর হাতে পতন হয়, সোলায়মান কররানী তার ভাই তাজ খানের সহযোগিতায় বাংলা ও বিহার জয় করেন। তাজ খান কররানী তার ভাই সোলায়মান এর প্রতিনিধি হিসেবে তখন বাংলা শাসন করছিলেন।"[১৫] আবুল ফজলের মতে অধিকারচ্যুত আফগানরা সব দিক থেকে এসে বাংলা ও বিহারে সমবেত হতে থাকে এবং তাদের নেতৃত্ব দানকারী সোলায়মানের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলে।[১৬] ক্রমান্বয়ে সোলায়মান এক বিশাল সেনা বহর গড়ে তোলেন যা চার্লস স্টুয়ার্টের মতে, প্রচুর ধন সম্পদ ছাড়াও ৩৬০০ হাতি, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ১,৪১,০০০ পদাতিক সেনা, ২০,০০০ কামান এবং কয়েক শত নৌ যুদ্ধযান নিয়ে গঠিত হয়।[১৭]

কিন্তু ভাই তাজ খান কররানীর মতো সোলায়মান কররানী ও এক জন চমৎকার মেধাবী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। বিহার ও বাংলার আফগানদের মধ্যে বিহারের কররানীদের সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল। সূর শাসকেরা দিল্লিতে ও আগ্রায় তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল। মোগলরা দিল্লিতে ধীরে ধীরে তাদের কতৃত্ব সুরক্ষিত করেছিল এবং সব দিকেই তাদের সীমা সম্প্রসারিত করেছিল। বাংলায় সুলতান মুহম্মদ শাহ সূর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ সূর সমভাবে শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কররানীরা বুদ্ধিমত্তার সাথে আকবর এর কর্তৃত্ব সম্প্রসারণও সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি এবং বাংলার সূর সুলতানদের সামন্তগিরি নীতির অনুসরণ করেন। বিহার সীমান্ত জৌনপুরের ঘাঁটি থেকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহে খান জামানের ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ থেকে কররানীরা তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনে। সোলায়মান কররানীর জৌনপুরের মোগল ভাইসরয় খান জামানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি তাকে উপহার পাঠাতেন এবং তার মাধ্যমে সম্রাট আকবরকে খুশি রাখতেন। কিন্তু সম্রাট আকবর নির্বাসনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৫৬ সালে দিল্লির মসনদে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সেভাবেই লালিত পালিত হন। এই নির্বাসন তার পিতার উপর আরোপিত হয়েছিল কারণ তিনি শেরশাহকে, যিনি একজন আফগান, হালকা ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। আফগানদের দ্বারা তার পিতাকে ভারত থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি তার জানা ছিল। তাই যখন তিনি দেখলেন যে বাংলা ও বিহার আফগানদের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে, তিনি সেখানে থেকে তাদের বহিষ্কারের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে জৌনপুরে তার ভাইসরয় খান জামানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। ১৫৫৭ সালে সিকান্দার খান সূর মানকটে আত্মসমর্পণ করলে তিনি খান জামানকে অস্থায়ী জায়গির দিয়ে ফরমান জারি করেন এবং আফগানদের নিকট থেকে বাংলা জয় করার পর সম্ভব দ্রুততম সময়ে তাকে বাংলায় একটি স্থায়ী জায়গিরের ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেন।[১৮]

১৫৬৩ সালে সম্রাট আকবর দ্বিতীয় বারের মতো খান জামানকে জৌনপুরের ভাইসরয় নিযুক্ত করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে বাংলাকে অফগানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলে তাকে বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত করবেন।[১৯] এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে আকবর আফগানদের শক্তিশালী ঘাঁটি বাংলা ও বিহার জয়ের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত ছিলেন। কিন্ত কররানীদের শক্তি ও সম্পদ এবং রাজধানীর নিকটবর্তী তার রাজ্যের অন্যান্য দিকের প্রতি ব্যস্ততা মাথায় রেখে আকবর কোনো তাড়াহুড়া করেন নি। কারণ বাংলার রাজধানী গৌড় অতীতে তার পিতার সার্বভৌম রাজত্বের জন্য শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই "গোর" (কবর) এ পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য পুনঃনির্মানে বাংলা আফগানদের জন্য হয়ে উঠেছিল একটি চারণক্ষেত্র (Jumping ground)। তাই বাংলায় আফগান শক্তির উত্থান আকবরের জন্য একটা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে।

অবশ্য সোলায়মান কররানী সম্রাট আকবরকে তার নিজের ব্যাপারে সন্দেহের সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে রাজ্য রক্ষার জন্য বিরতিহীন ভাবে কাজ করে যান এবং মোগল, অসমীয়, বাঙালি ও উড়িয়াদের সাথে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। উপহার প্রদানের মাধ্যমে তিনি সম্রাট আকবরের প্রতি তার আনুগত্যের সত্যতার প্রমাণ রাখেন। আকবরকে প্ররোচণা দেওয়া থেকে এড়িয়ে যেতে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি বিশেষ অধিকার মুদ্রা ছাপানো এবং নিজ নামে খুতবা পাঠ থেকেও নিজেকে বিরত রাখেন। তিনি সম্রাটের জৌনপুরের পূর্বাঞ্চলীয় ভাইসরয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং সম্রাট আকবরকে বিব্রত করার মতো কারণের সুযোগ এলে তা ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও তিনি শাহ অথবা সুলতান উপাধি ধারণ না করে নিজেকে হযরত-ই-আলা (বা মহামান্য) বলাতেই সন্তুষ্টি বোধ করেন। এই সকল বাস্তব ও রাষ্ট্রনায়ক সুলভ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সোলায়মান কররানী আকবরকে নিরস্ত্র করেন কিন্তু সোলায়মানের বাহ্যিক বিনয়সূচক আচরণ দেখে কেউ বা সন্তুষ্ট না হয়ে পারে।

অধুনালুপ্ত সার্কিদের স্বাধীন রাজ্যের মতো জৌনপুরকে রাজধানী করে এই অঞ্চলে একটি "খান্নাৎ" গঠনের সুপ্ত পরিকল্পনা ছিল জৌনপুরের মোগল ভাইসরয় খান জামানের। তিনি জৌনপুরে একটি দূর্গ তৈরি করে নিজের নামানুসারে তার নামকরণ করেন "জামানিয়া দূর্গ।" আফগানদের শক্তিশালী ঘাঁটি বিহার এবং বাংলা জয়ের লক্ষ্যে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য আকবরের চাপ সত্ত্বেও খান জামান "ধীরে চলো" নীতি অনুসরণ করেন এবং নিজের লক্ষ্য অর্জনে সোলায়মান কররানীর সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। সোলায়মানের ছত্রছায়ায় শেরশাহের শেষ সেনাদলের নামকরা সেনাদের এক বিশাল সমাবেশ ঘটেছিল। ১৫৫৮ সালে খান জামানের হাতে পরাজয়ের পর ইব্রাহিম খান সূর প্রথমে বাংলায় এবং পরে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। তখন উড়িষ্যার শাসক ছিলেন রাজা মুকুন্দ দেব হরিচন্দ্র। উড়িষ্যার রাজার নিকট ইব্রাহিম খান সূর আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং রাজা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেন।[২০] কিন্তু উড়িষ্যায় ইব্রাহিম খান সুরের উপস্থিতি ছিল বাংলায় সোলায়মানের দিক তরবারি তাক করে রাখার মত। খান জামানের উদ্দেশ্য সম্পর্ক জানতে পেরে সম্রাট আকবর উড়িষ্যার রাজার সাথে একটি সামরিক সন্ধিতে উপনীত হন এবং সোলায়মান কররানী খান জামানকে কোনো সক্রিয় সহযোগিতা করলে তাকে বাংলা আক্রমণের জন্য প্রণোদিত করেন।[২১] সোলায়মান কররানী এই অবস্থা সম্পর্কে পুরো সজাগ ছিলেন এবং যতক্ষণ উড়িষ্যা তার রাজত্বের আওতার বাইরে থাকে ততক্ষণ নিজেকে অনিরাপদ মনে করেন। ইতিমধ্যে ঘটনা ভিন্ন দিক মোড় নেয়। ১৫৬৫ সালে খান জামান সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেব হরিচন্দ্র বাংলা আক্রমণ করেন এবং সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও দখল করে নেন। তার সেনাধ্যক্ষ আসাদ আল্লা খানের হাতে খান জামান পরাজিত হন। আসাদ আল্লা জৌনপুরের 'জামানিয়া দূর্গটি' সোলায়মান কররানীর হাতে হস্তান্তর করে নিজে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২২] কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের ভাইসরয় মুনিম খান সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।[২৩] আফগানরা অসফল হয়েই ফিরে এলেন। সোলায়মান কররানীর উজির লোদী খান 'খান-ই খানান' মুনিম খানের সাথে দেখা করে শান্তি স্থাপন করেন।[২৪] পরে সোলায়মান কররানী পাটনায় মুনিম খানের সাথে দেখা করে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্রাট আকবরের কর্তৃত্বের অধীনে আত্মসমর্পণ করেন।[২৫] কৌশল এবং কুটতত্ত্ব দিয়ে সোলায়মান কররানী বাংলায় মোগল আগ্রাসন এড়িয়ে গেলেন।

নিজ দেশের উপর মোগল আক্রমণের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে সোলায়মান কররানী উড়িষ্যা আক্রমণ ও জয় করা সুবিধাজনক মনে করলেন। সেই দেশের ধনসম্পদ সম্রাট আকবরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তার অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করবে। পূর্বের বর্ণণা মতে তখন উড়িষ্যা শাসন করতেন মুকুন্দ দেব হরিচন্দ্র। গণ অসন্তোষের কারণে সে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। মুকুন্দ দেব তার দুজন কর্মকর্তা ছোট রায় এবং রঘু ভাঞ্জাকে আগ্রাসী সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে নিযুক্ত করেন। তারা সেনাদলকে তাদের আনুগত্য থেকে বিমোহিত করে তাদের প্রভুর বিরুদ্ধেই আক্রমণ করে বসেন। জে.এন.সরকার প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন, "মুকুন্দ দেব কোসামা দুর্গে আশ্রয় নেন এবং বায়েজিদ এর নিকট থেকে পাঠানদের একটি দলের ত্রাণ সামগ্রী কিনে নেন। বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে ছোট রায় এবং মুকুন্দ দেব উভয়কেই হত্যা করা হয়।"[২৬]

সুরুজগড়ের সেনাধ্যক্ষ দুর্গাভাঞ্জা নামে পরিচিত রামচন্দ্র ভাঞ্জা সিংহাসন দখল করেন। সোলায়মান কররানী তাকে আত্মসমর্পণ করতে চাপ দেন এবং পরে হত্যা করেন। আর ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়[২৭] মনে করেন মুকুন্দ দেব বিদ্রোহী এক ক্রীড়নক রাজার হাতে নিহত হন। এর পরপরই হত্যাকারী এবং নিহত রাজার ছোট ভাইয়ের (যিনি আইনত সিংহাসনের দাবিদার) মধ্যে শক্তির লড়াই শুরু হয়ে যায়। ঠিক যে সময়ে শক্তির পরীক্ষায় তারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তখনই সোলায়মান কররানী উড়িষ্যায় আক্রমণ করেন এবং কালাপাহাড়[২৮] কর্তৃক উভয় প্রতিদ্বন্দ্বিকে যুদ্ধরত অবস্থায় হত্যা করা হয়। ইব্রাহিম খান সূরকে আত্মসমর্পণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়।[২৯] এভাবেই সোলায়মান কররানী বাংলা ও বিহারের সাথে উড়িষ্যাকে তার রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করে ফেলেন। নিমাত আল্লা লিখেছেন, "হিন্দুদের সর্ব বৃহৎ মন্দিরটি উড়িষ্যায় অবস্থিত এবং জগন্নাথের মন্দির হিসেবেই পরিচিত। তিনি (সোলায়মান) মন্দিরটি ধংস করার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ঐ দিকে এক দল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। এই তীর্থ স্থানটিকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেন। বাহুগুলো লাল স্বর্ণের ও চোখ দুটো বাদাখশানী পাথরের তৈরি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো কৃষ্ণ দেবতার মূর্তিটিকে তিনি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে পয়ঃনালীতে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। বিভিন্ন আকৃতির আরো ৭টি সোনার মূর্তি যা এই শহরের আনাচে কানাচে বিস্তৃত ছিল এবং যার প্রত্যেকটির ওজন ৫ মণ (আকবরী ওজনের মাপ অনুযায়ী), সেগুলোও তুলে ফেলা হয়েছিল। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদের লেখা ইতিহাসে বর্ণনা আছে যে, পান্ডোভাসের সময় কাল থেকে বর্তমান শাসন কাল পর্যন্ত কোনো পর্যটকই এই মাটিতে পর্দাপণ করেন নাই। মুসলিম সৈন্যরা যখন শহরে প্রবেশ করে তখন, যেহেতু এখানকার জনগণ পালানোর কৌশল জানতেন না, তাই ব্রাহ্মণ মহিলারা শরীরের উপর ঘোমটা জড়িয়ে এবং বিভিন্ন অলংকারাদি পরিধান করে জগন্নাথ এর মূর্তির পেছনে লুকিয়ে ছিলেন। মুসলমানরা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহরে আক্রমণ করেছে, তাদেরকে বন্দি করতে পারে এবং মন্দিরটি ধ্বংস করতে পারে- একথা বারংবার বলা সত্ত্বেও তারা তা বিশ্বাস করে নি বরং বলেছে এটা কীভাবে সম্ভব; এই দেবীদের পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা তাদের কীভাবে হয়।" কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা প্রবেশ করে যখন তাদের বন্দি করে, তখন তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল।"[৩০]

নিমাত আল্লার মতে, সম্রাট আকবর ১৫৬৭ সালে যখন চিতোরকে ছোটো করে আনতে ব্যস্ত, সোলায়মান কররানী তখন উড়িষ্যার দিকে সেনা অভিযান নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই অভিযানে তার সাথে ছিলেন পুত্র বায়েজিদ, সিকান্দার উজবেক নামে স্বপক্ষত্যাগকারী এক মোগল এবং তার বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ কালাপাহাড় (রাজা)। প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর সোলায়মান কররানী পুরীসহ সমগ্র উড়িষ্যা ও হিন্দু তীর্থস্থান জয় করেন। স্বর্ণসহ প্রচুর ধন সম্পদ তার হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এমন প্রত্যেক আফগানকে এক বা দুটি করে স্বর্ণের মূর্তি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। কালাপাহাড় জগন্নাথপুরীর মন্দিরটি ধ্বংস করেন। এখানে ৭০০ টি স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি ছিল যার সর্ববৃহৎ মূর্তির ওজন ছিল ৩০ মণ। সোলায়মান উজির লোদী খান এবং কাতলু খান লোহানীকে যথাক্রমে উড়িষ্যার ও পুরীর গর্ভনর নিযুক্ত করেন। আর এখন তিনি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার শাসক হয়ে গেলেন।

বাংলার উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত এলাকা হচ্ছে কুচবিহার। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসন কালে জনৈক বিশ্ব সিনহা নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুচবিহারে একটি নতুন রাজবংশের ভিত্তি গড়ে তোলেন। এডওয়ার্ড গাইটের মতে তিনি ১৫১৫ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৩১] তিনি কামতাপুর জয় করে নিজে কামতেশ্বর উপাধি ধারণ করেন।[৩২] সুলতান মাহমুদ বাংলার সিংহাসন আরোহণ করে তার পুরো রাজশক্তি পশ্চিম রণাঙ্গনে মাখদুম-ই-আলম ও শের খানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন। রাজ্যের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতির পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনো অবকাশ সুলতান মাহমুদের ছিল না। কুচবিহারের রাজা ও বিশ্ব সিনহা ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোকে নিজেদের বশ্যতায় এনেছেন এবং তার রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন অর্জনে গর্বিত হয়ে বিশ্ব সিনহা বাংলার সীমান্ত অঞ্চল দখলের চেষ্টা করেন। তিনি কান্ত দুয়ার ও ঘোড়াঘাট দখল করে নেন।[৩৩] কিন্তু ১৫৪০ সালে বিশ্ব সিনহা মৃত্যুবরণ করেন।[৩৪] বিশ্ব সিনহার মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নর-নারায়ণ হিসেবেও পরিচিত। চিলরাজ হিসেবে পরিচিত তার ছোটো ভাই এবং তার সেনাদলের অধ্যক্ষ শুক্লাধ্বজা নর-নারায়ণের শাসন কালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পূর্ব দিকে সীমানা সম্প্রসারণে তাকে সহায়তা করেন।[৩৫]

১৫৪৭ সালে কুচ বাহিনী অহম রাজ্য আক্রমণ করে কিন্তু নর-নারায়ণপুরের যুদ্ধে পরাজিত হয়।[৩৬] ১৫৬২ সালে শুক্লাধ্বজা অহম রাজ্য আক্রমণ করে এবং শুক্লেন মং এর নেতৃত্বাধীন অহম বাহিনীকে পরাভূত করেন।[৩৭] শুক্লাধ্বজার বিজয়ী বাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গারগাঁওয়ে প্রবেশ করেন এবং এখানকার রাজা আত্মসমর্পণ করে কুচ রাজার বশ্যতা স্বীকার করেন। গাইটের মতে, শুক্লধজা ধীরে ধীরে কাছাড়, মনিপুর, সিলেট, জয়ন্তিয়া এবং ত্রিপুরার মতো পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহ জয় করে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩৮]

কুচ রাজ্যের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণে সোলায়মান কিছুটা শংকিত হলেন কারণ ঘোড়াঘাট এবং কান্তদুয়ার মধ্যযুগের বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তার তিব্বত অভিযানের পূর্বেই বখতিয়ার খলজিকে ঘোড়াঘাটের প্রতিরক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। অধিকন্তু তিব্বত ও উত্তর বাংলার মধ্য দিয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক পথটি তখন কুচ রাজার দয়ার উপর নির্ভর করছিল। বিশ্ব সিনহার পুত্র শুক্লাধ্বজা ১৫৬৮ সালে বাংলা জয়ের চেষ্টা করেন। অবশ্য সোলায়মান কররানীর কুচ সেনাদের পরাজিত করে তার সেনাধ্যক্ষ শুক্লাধ্বজাকে বন্দি করেন।[৩৯]

কুচ রাজার আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সোলায়মান তার সেনাধ্যক্ষ কালাপাহাড়কে কুচবিহার আক্রমণে প্রেরণ করেন। দেশটির উজানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সুদুর তেজপুর পর্যন্ত আফগান সেনারা দখল করে নেয়। তারা কামাখ্যা ও হাজোর মন্দিরসমূহ ধ্বংস করে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে।[৪০] তিনি তাদের জমি দখল করেন নি। অধিকন্তু কুচ রাজার প্রতি মৈত্রীর নির্দশন স্বরূপ কয়েক বছর পর শুল্কা ধ্বজাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। এভাবেই তিনি তার বিরোধীদের মন জয় করে উত্তর সীমান্ত নিরাপদ করেন।[৪১]

কোনো কোনো আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে সোলায়মান কররানীর সময়ে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে চলে গিয়েছিল।[৪২] নতুন তথ্য উন্মোচিত হওয়ায় এ তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ১৫৬৯ সালের আগে বা পরে চট্টগ্রাম ভ্রমণকারী একজন ভেনেশীয় পর্যটক সিজার ফ্রেডারিক এর সাক্ষ্য থেকে এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে চট্টগ্রামের উপর কররানীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি বলেন, "সন্দিভা বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল– জনগণ ছিল মৌর্য (moor) এবং রাজা ছিলেন অত্যন্ত ভালো একজন মৌর্য (moor)। তারা এবং চট্টগ্রামের জনগণ একই রাজার প্রজা ছিলেন।"[৪৩] চট্টগ্রামের পটিয়া মহকুমার বাঁশখালী উপজেলার ইলশা গ্রাম থেকে ৯৭৫ হিজরি/১৫৬৮ খ্রি. একটি প্রস্তর লিপিও পাওয়া গেছে।[৪৪] গ্রামটি সাঙ্গু নদীর তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দক্ষিণ চট্টগ্রাম কররানী শাসনের অধীনে ছিল। এই প্রস্তর লিপি মাস্টার সিজার ফ্রেডারিক এর বক্তব্যকে নিশ্চিত করে যা পূর্বের ইতিহাসবিদরা যথেষ্ট তথ্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতির কারণে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন নি।

সোলায়মান কররানীর শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। তিনি এক জন সক্ষম শাসক ছিলেন। যদিও তিনি নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন নি, কিন্তু তিনি বাংলার সুলতানদের অতীত ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫৭২ সালের ১১ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, শক্তিশালী ও ধার্মিক শাসক ছিলেন। মসজিদে খচিত একটি শিলালিপি থেকে যানা যায় যে, তাকে বিচার ও দয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সোলায়মান (ইসলামের এক জন নবী যিনি রাজক্ষমতার অধিকারী ছিলেন) মনে করা হতো।[৪৫] সমসাময়িক সব ঐতিহাসিকেরাই তার ন্যায় বিচার ও প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং দয়ার বিষয়ে প্রশংসা করেছেন। তিনি তার ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম ধর্মের অনুশীলন মেনে চলেছেন। নিমাত আল্লার মতানুসারে "তিনি প্রতি রাতে ৭০০ উলামা ও মাশায়েখদের সাথে নিয়ে তার রাত্রীকালীন প্রার্থনা করতেন এবং উষালগ্ন পর্যন্ত তাদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। তার পর সকালের প্রার্থনা শেষ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদিতে মনোনিবেশ করতেন।"[৪৬] বাদাউনীর মতে, "সোলায়মান কররানীর শায়েখ ও উলামাদের সাথে আলোচনার সংবাদটি মোগল সম্রাট আকবরকে ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা ও দর্শনতত্ত্ব বিবেচনার জন্য একটি ইবাদত খানা (প্রার্থনালয়) নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে।[৪৭] সোলায়মান কররানী একজন উদার মুসলমান ছিলেন। স্থানীয় জনগণের অধিকাংশই অমুসলিম একটি দেশে তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করতেন এবং তাদেরকে সরকারী উচ্চপদে নিয়োগ দেন। রামানন্দ গুহ এবং তার পুত্র ভবানন্দ, গুনান্দ ও শিবানন্দ সরকার উচ্চ পদে আসীন ছিল। ভবানন্দ, গুনান্দকে ও শিবানন্দ সরকারি উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ভবানন্দ এবং গুনান্দকে মন্ত্রী বানানো হয়েছিল এবং শিবানন্দকে রাজস্ব বিভাগের প্রধানের পদটি দেওয়া হয়েছিল।[৪৮]

যদিও সোলায়মান কররানী নিজেই একজন প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, তার রাজত্বের কৃতিত্বের অধিকাংশই ছিল তার উজির লোদী খানের প্রাপ্য। আবুল ফজলের মতে লোদী খানের মধ্যে ছিল প্রভুর প্রতি সর্বাধিক বিশ্বস্ততা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বিজ্ঞ আধুনিকায়ন এবং অব্যর্থ কৌশলের অপূর্ব সমন্বয়। আবুল ফজল তাকে সেই সব অবাধ্য আফগান প্রধানদের যৌক্তিক চেতনা (rationale spirit) বলে আখ্যায়িত করেছেন যাদের অজ্ঞ দুঃসাহসিকতা তাদের রাজত্বের বিনাশ করতে পারতো।[৪৯] লোদী খান তাজখান কররানীর উজির হিসেবে ও কাজ করেছিলেন। সোলায়মান তার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণকারী এই বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট মন্ত্রীর কার্যক্রম চলমান রেখেছিলেন। লোদী খানের কারণেই সোলায়মান কররানীর বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করে নিজ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে মোগল ভাইসরয়ের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন; এবং মোগল রাজ্যের প্রতিপক্ষ হয়েও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মতো এক বিশাল রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রেখেছিলেন। আফগানদের দুঃসময়ে এই তিন রাজ্যের সমন্বয়ে শক্তিশালী আফগান রাজ্য গঠনটি তাৎপর্যপূর্ণ সফলতাই বটে। সোলায়মানের রাষ্ট্রনায়কোচিত কার্যাবলী এবং লোদী খানের সুচতুর কূটনীতির সাফল্যের কারণেই শক্তিশালী মোগল সম্রাট আকবরের বিরোধিতার মুখেও নিজ রাজ্যের অখণ্ডতা ধরে রেখেছিলেন। বস্তুত, লোদী খানই কররানীকে শক্তিশালী ও সফল

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাসক বানিয়েছিলেন। সোলায়মান কররানীর শাসনকালে বাংলা শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ ছিল এবং জনগণ ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। রহিমের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে : শেরশাহের মৃত্যুর পর আফগানদের মধ্যে এমন প্রাজ্ঞ ও সফল নেতার আর জন্ম হয় নি।[৫০]

সোলায়মান কররানীকে নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করতে দেখা যায়নি। এ পর্যন্ত তার ছয়টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে গুলো হচ্ছে :

১.	সোনারগাঁও শিলালিপি	তারিখ- ৯৭৬ হি:/১৫৬৯ খ্রি.
২.	বিহার শরিফ শিলালিপি	তারিখ-৯৭৭ হি:/১৫৭০ খ্রি.
৩.	দেওতলা, দিনাজপুর শিলালিপি	তারিখ-৯৭৮ হি:/১৫৭১ খ্রি.
৪.	হযরত পাণ্ডুয়া শিলালিপি	তারিখ-৯৮০ হি:/১৫৮২ খ্রি.
৫.	চট্টগ্রাম শিলালিপি	তারিখ-৯৭৫ হি:/১৫৬৮ খ্রি.[৫১]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন মালদার আর একটি লিপির কথা উল্লেখ করেছেন।[৫২] লিপিটি ৯৭৪ হি:/১৫৬৭ খ্রি. এ সোনা মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস বলে। তিনি র‍্যাভেন শ' কে[৫৩] তার সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু শিলালিপি এখন প্রাপ্য নয় এবং এই লিপি সম্পর্ক আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। একটি করে মোট তিনটি লিপি পাওয়া গেছে বিহারের শেখ শরাফ উদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী, দিনাজপুরের দেওতলার (তাবরিজাবাদ) শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজি এবং পাণ্ডুয়ার শেখ নুর কুতুব আলমের দরগাহে। (শাস হাজারী বা ছোটো দরগাহে)। কাজেই লিপিগুলো নিমাত আল্লার এই সনদকে সমর্থন করে যে তিনি উলামা মাশায়েখদের সংশ্রব পছন্দ করতেন।

সোলায়মান কররানীর মৃত্যুর পর তার জেষ্ঠ্য পুত্র বায়েজিদ কররানী ১৫৭২ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দাউদীর মতানুসারে তার দাম্ভিকতা, কর্কশ আচরণ এবং চাঁদাবাজী গর্ববোধকারী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আফগান অমাত্যদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।[৫৪] সম্রাট আকবরের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশে তার বাবার নীতি থেকেও তিনি সরে আসেন এবং নিজের নামে খুতবা পাঠ প্রচলন করেন।[৫৫] নিমাত আল্লা বলেন যে, তিনি মুদ্রা চালু করেছিলেন।[৫৬] ইমাদ কররানীর পুত্র এবং বায়েজীদ এর শ্যালক হানসু প্রকৃতপক্ষে কাতলু খান লোহানীর ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং বায়েজীদকে হত্যা করেন।[৫৭] বায়েজীদের হত্যাকাণ্ডের পর আবারো বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা গণঅসন্তোষের মধ্যে পড়ে। উৎসাহী আফগান প্রধানরা তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীকে সিংহাসনের জন্য দাঁড় করান। কাতলু লোহানীর নেতৃত্বে লোহানীরা হানসুকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু সোলায়মানের উজির লোদী খান, রাজ্যে যার একটি সম্মানজনক অবস্থান ছিল, দাউদ খানকে সিংহাসনে বসান। বিহারে গুজার কররানী বায়েজীদ এর এক পুত্রকে সিংহাসনের জন্য প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান।[৫৮]

বাংলার শাসকদের মধ্যে সোলায়মান কররানীই প্রথমবারের মতো রাজধানী গৌড় থেকে পাণ্ডুয়া ও পরে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করেন।[৫৯] তিনি নতুন রাজধানীর জলবায়ুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবস্থা গৌড়ের চেয়ে অধিকতর স্বাস্থ্যকর দেখতে পান। মুসলিম শাসনকালে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে প্রধানত নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সাথে রাজধানীর স্থানান্তর হতো। এই কারণে এবং জলাভূমি ও জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৌড়ের আবহাওয়া প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। রোকনউদ্দিন বারবাক শাহ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এটা সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং শাহ ইসমাইল গাজী সেতু নির্মাণ করে তাকে সহযোগিতাও করেন। আর এভাবেই সমস্যাটির অস্থায়ী সমাধান আসে।[৬০] আবুল ফজল চুটিয়া-পুটিয়া[৬১] জলাভূমির জন্য গৌড়ের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি ১৫৭৬ সালে গৌড়ের মহামারীর কথাও বলেছেন যখন খান-ই- খানান মুনিম খান নিজেই তার শিকার হন। তাই সোলায়মান কররানী কর্তৃক স্বাস্থ্যকর স্থান তান্ডায় রাজধানী স্থানান্তর তার দূরদর্শিতার কথা তুলে ধরে।

সোলায়মানের ছোটো ছেলে দাউদ কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে লোহানীদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হানসূর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েন।[৬২] হানসুকে পরাস্ত, ধৃত ও হত্যা করা হয়।[৬৩] দাউদ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুকুট ধারণ করেন। তিনি অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করে পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি সিক্কা নির্মাণ করেন এবং নিজ নামে খুতবা পাঠ করান। এভাবে নিজের কর্তৃত্ব দৃঢ় করার পর দাউদ বিহারের দিকে অগ্রসর হন গুজার খান কররানীকে মোকাবেলার জন্য। তিনি বায়েজীদ এর এক পুত্রকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। লোদী খানের নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনীর অগ্রসর হওয়া দেখে গুজার কররানী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। খান-ই খানান মুনিম খান তখন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের মোগল ভাইসরয় ছিলেন। গুজার খান তার সাথে দরকষাকষি করলেন এবং তার শর্তসমূহ মেনে নেওয়া হলে বিহার সমর্পণ করে মোগল চাকুরিতে যোগ দিতে সম্মত হন। তার শর্তগুলো ছিল তাকে এক বছরের জন্য গোরখপুর, হাজীপুর এবং বিহার ছেড়ে দেওয়া এবং পরবর্তী বছরে বাংলায় জায়গির প্রদান করা। মুনিম খান গুজার খানের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

মোগলদের সাথে গুজার খানের চুক্তিকে লোদীখান আফগান স্বার্থের বিনাশ হিসেবে দেখলেন। তিনি গুজার খানকে দাউদ কররানীর সাথে মীমাংসা করে দেন। বৃহত্তর আফগান স্বার্থে লোদী খান গাজীপুরের নিকট মোগলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং মুনিম খানকে এমন এক সংকটে ফেললেন যেখানে 'যুদ্ধ করাটা অনুমোদন যোগ্য নয় আবার ফিরে আসাটাও দুঃসাধ্য'।[৬৪] জৌনপুরের দিকে মোগলদের অগ্রযাত্রা লোদী খান সফলতার সাথে রুখে দেন। এভাবে লোদী খান দাউদের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করেন এবং মোগলরা আফগানদের উপর আঘাত হানার একটা সুযোগ হারালো। কিন্তু কাতলু খান লোহানী, শ্রীহরি এবং গুজার খানের মতো দরবারী রাজনীতিকরা লোদী খানের উত্থানকে হিংসার চোখে দেখলেন। তারা লোদী খানের বিরুদ্ধে দাউদের দরবারে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। তার বিরুদ্ধে পাকানো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে লোদী খান অবহিত হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা দাউদকে বোঝাতে সক্ষম হন যে লোদী খান শীঘ্রই তাজ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খান কররানীর পুত্র এবং লোদীর জামাতা ইউসুফকে সিংহাসনে বসাবেন।[৬৫] দাউদ অন্ধের মতো ইউসুফ কে হত্যা করেন এবং লোদী খানকে নিশ্চিহ্ন করতে পরিকল্পনা আটলেন।[৬৬] লোদী খান মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ করে দেন এবং মুনিম খানের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে সম্রাট আকবর ও মুনিম খান কে উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করেন।[৬৭]

এখন লোদী খান মনোযোগ দেন দাউদ খানের দিকে যিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুঙ্গের থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুক্ত হস্তে সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আফগানদের দলে টানলেন। প্রায় একই সময়ে সোলায়মান কররানীর বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ কালাপাহাড় এবং জালাল খান সাধুরী, লোদী খানের পক্ষ ত্যাগ করেন। লোদী খান নিজেকে সম্রাট আকবরের একজন অনুগত হিসেবে ঘোষণা দিলেন এবং মুনিম খানের সমর্থন লাভ করলেন। লোদী খানকে সাহায্যের জন্য মুনিম খান সৈন্য পাঠালেন। দাউদ খানের বিরুদ্ধে তিনি মুনিম খানের সাথে এগিয়ে এলেন।[৬৮]

দাউদ খান যখন দেখলেন যে লোদী খান মোগলদের সাথে সামরিক সহযোগিতা সন্ধিতে পৌঁছেছেন তখন তিনি তাকে এই মর্মে একটি বার্তা পাঠান "আপনি আমার বাবার স্থলাভিষিক্ত। এই পরিবারের প্রতি আপনার ভালবাসার কারণে যদি আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট তাহলে আপনি আপনার দায়িত্বই পালন করেছেন এবং আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নই। যে কোনো মূল্যে আমি আপনার সহযোগিতা চাই। যখন রাজকীয় বাহিনী আমার বিরোধিতায় নেমেছে আমি চাই যে আপনি, যেহেতু সবসময় সদিচ্ছার প্রদর্শন করেছেন, শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আমি সেনাবাহিনী, গোলন্দাজ ঘাঁটিসমূহ এবং সম্পদ আপনার নিকট হস্তান্তর/অর্পণ করলাম।"[৬৯]

কাতলু খান এবং গুজার খান দাউদকে ক্ষমা করে দিতে লোদী খানকে প্রভাবিত করেন। দেশপ্রেমিক লোদী খান বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারেননি, তিনি আবারো আফগান স্বার্থের বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং অগ্রসরমান মোগলদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। সেখানে নদীর তীরে তাদেরকে কার্যকর ভাবে প্রতিরোধ করেন এবং ভট্টশালীর মতে, মুনিম খানকে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য করেন।[৭০] ভবিষ্যতে মোগলদের কোনো আগ্রাসন নিরুৎসাহিত করতে লোদী খান মুনিম খানের নিকট সম্রাট আকবরের জন্য বার্ষিক নগদ ২ লক্ষ রূপি এবং এক লক্ষ রূপি বিভিন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়ে শান্তির প্রস্তাবনা করেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আফগানদের সাথে শান্তি স্থাপন করে মুনিম খান জৌনপুরে ফিরে যান।[৭১] আর এভাবেই লোদী খানের সাহস ও প্রজ্ঞায় দাউদের রাজত্বের প্রতি মোগলদের প্রতিবন্ধকতা এড়ানো সম্ভব হয়। কিন্তু লোদী খানের সেবার স্বীকৃতি দিতে দাউদ খান ব্যর্থ হন। কাতলু খান এবং যশোরের প্রতাপাদিত্যের বাবা শ্রীহরী বিক্রমাদিত্য দাউদের দুষ্ট চক্রের বুদ্ধিদাতা ছিলেন। তারা আবারো দাউদের সন্দেহপ্রবণ মনে কাজ করা শুরু করলেন। গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আলোচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অজুহাতে দাউদ লোদী খানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে তাকে ফাঁদে ফেলা হলো এবং বন্দি করে শ্রীহরীর নিকট হস্তান্তর করা হলো।[৭২] লোদী খান নিশ্চিত বুঝলেন যে তাকে হত্যা করা হবে, তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি শেষ উপদেশটা দিয়ে গেলেন। যেহেতু দাউদের রাজত্ব দখলে মোগলদের প্রত্যয়ের বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাই তিনি তাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বললেন। লোদী খানকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।[৭৩] কাতলু খান এবং শ্রীহরির অসৎ পরামর্শের শিকার হলেন লোদী খান। লোদী খানের পদটি পেলেন শ্রী হরি এবং কাতলু খানকে উকিল নিযুক্ত করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের মনঃস্কামনা পূর্ণ হয়। কিন্তু দাউদ তার একজন একনিষ্ঠ উজির এবং তার রাজ্যের একটা শক্তিশালী খুঁটিকে সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে ভুল করলেন। এমনকি আবুল ফজলও বলেন, "তিনি (লোদী) কৌশলী ও দূরদর্শী ছিলেন এবং শক্তিশালী পরিকল্পনার মেধা তার ছিল। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমুহের যুক্তিগ্রাহ্য চেতনা ছিলেন এবং আফগান স্বার্থ অগ্রায়নের সহায়ক ছিলেন"।[৭৪]

তার মৃত্যুতে আফগানদের শক্তিশালী ঘাটি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা জয়ে মোগলদের পথে একটি বাধা দূর হয়। লোদী খানের মৃত্যু জৌনপুরের মোগল ভাইসরয় মুনিম খানকে তাৎক্ষণিক ভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বিজয়ে প্রণোদনা জোগায়। সম্রাট আকবর তার শাসনামলের শুরু থেকেই বাংলা ও বিহার জয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন কারণ এই দুই রাজ্য ক্রমেই আফগানদের শক্তিশালী ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৫৫৭ সালে সিকান্দার খান যখন মানকোট সমর্পণ করেন, আকবর তখন জৌনপুরে একটি অস্থায়ী জায়গির প্রদান করে ফরমান জারি করেন। খান জামান আফগানদের নিকট থেকে বাংলা জয় করার পর পরই আকবর তাকে সেখানে একটি স্থায়ী জায়গির প্রদানের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আরো বলা হয়েছে যে, ১৫৬৩ সালে খান জামান কে দ্বিতীয়বার জৌনপুরের ভাইসরয় নিযুক্তিকালে আকবর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি আফগানদের নিকট হতে বাংলা জয় করতে পারেন, তাহলে তাকে সেখানে একটি স্থায়ী জায়গির দেবেন।[৭৫]

তাই বলা যায়, বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় আফগানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আকবর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। সোলায়মান কররানীর মৃত্যু তাকে সে সুযোগ করে দেয়। আবুল ফজল লিখেছেন, "এই সময়ের ঘটনাবলির একটা হচ্ছে এই যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতার শ্বাস ছেড়ে দেওয়া সোলায়মান কররানী ইহজীবন ত্যাগ করেন। তপস্বী, জ্ঞানী ও রাজনীতিবিদরা যাদের মরণশীলদের প্রতি আস্থা ছিল, যা মূলত এক ব্যক্তির শাসন, এক শাসক, এক পথ-নির্দেশক, এক লক্ষ্য এবং এক চিন্তা দ্বারা সীমিত, তারা এই ঘটনার অভ্যুদয়ে ভাগ্যের সহায়তার বিষয়টি লক্ষ্য করেন। আর যারা বুঝতে অক্ষম এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমুহে কালো বর্ণের আফগানদের বিক্ষোভকে নিজেদের মতের পক্ষের যুক্তি হিসেবে দেখেন, গুজরাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিযানের বিরোধিতা করেন, তারা এই ঘটনার ফলে ব্যর্থতার অতল গহবরে নিপতিত হলেন। আর একটি উপদল যাদের সংকীর্ণ বুদ্ধি গুজরাট অভিযান ও তার উত্তরণের ধারণা বুঝে উঠতে পারেননি এবং যারা বোকার মতো তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারা শুধু তাদের প্রয়োজনে ঘটনাটি ব্যবহার করেছেন এবং অভিযানের যাবতীয় কৃতিত্ব পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহকে দিতে চেয়েছেন। খোদাভক্ত খেদিভের মতে গুজরাটের নির্যাতিতদের ঈশ্বরের দয়ায় আনা উচিত; তিনি বাজে কথায় কান দেন নি এবং তার পবিত্র মুখেই বলেন যে সোলায়মনের মৃত্যু সংবাদটি গুজরাট অভিযানের সময়ই এসেছিল কারণ এটা যদি তার রাজধানীতে থাকাকালীন আসতো, তাহলে নিশ্চিতরূপেই তার অধিকাংশ কর্মকর্তাদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমেই পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের অভিযানে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলতেন। সোলায়মানের মৃত্যুর পর এই সমস্ত দেশে শাহেনশাহের ভ্রমণের কী প্রয়োজন ছিল? এখন সেই দেশের বিজয়টা ঐ কর্মকর্তাদের সাহস ও দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করা হবে। সেই অনুযায়ী খান-ই-খানান মুনিম খানের কাছে একটি আদেশ পাঠানো হলো যে, অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তারও বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা জয় করা উচিৎ।[৭৬]

আবুল ফজলের উপর্যুক্ত বিবরণ মতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রতি সম্রাট আকবরের পরিকল্পনার পথে সোলায়মান কররানী একটি শক্তিশালী বাধা ছিলেন। শেরশাহ ধীরে ধীরে শক্তিশালী শাসক হিসেবে পূর্বাঞ্চলে তার অবির্ভূত হওয়া আকবরকে একটা উপযুক্ত মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য করেছিল। সোলায়মান কররানীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই উপযুক্ত মুহূর্তটির আগমন ঘটে। ভাইসরয় মুনিম খানের কাজটি আরো সহজ হয়ে ওঠে দাউদ কতৃক লোদী খানকে হত্যার মধ্যদিয়ে। লোদী খানের মৃত্যু মুনিম খানকে বিহার আক্রমণে উৎসাহিত করে। অধিকন্তু সম্রাট আকবর মুনিম খানের নিকট এই লক্ষ্য অর্জনে বারবার আদেশ পাঠাতে থাকেন এবং সেনাধ্যক্ষের পর সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন। রিয়াজ এর মতে, "আকবরের বাহিনী আক্রমণের জন্য বিরাট সৈন্য বহর নিয়ে দাউদ সোনে নদীর তীরে অগ্রসর হন। সোনে, শ্র এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে বিশাল নৌযুদ্ধ সংগঠিত হয়। অবশেষে আকবরের ভাগ্যে বিজয় আসে। উৎপাটিত হয়ে আফগানরা পালাতে থাকে এবং পাটনায় আশ্রয় নেয়।[৭৭]

মুনিম খান তার অগ্রসরমান মোগলদের নিয়ে সোনে নদী অতিক্রম করেন, যেহেতু তাকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। আবুল ফজল বলেন, "শাহানশাহের দৈনন্দিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার কারণে দাউদ এই ধরনের সৈন্য ও অস্ত্র সত্ত্বেও কাপুরুষের মতো পালালেন এবং নিজে পাটনার দুর্গে আবদ্ধ থাকলেন।"[৭৮] ১৫৭৩ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুনিম খান পাটনার দিকে অগ্রসর হন এবং পাটনা নগরীকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। পুনপুন নদীর বাঁধ ভেঙ্গে ফেলার জন্য তিনি মাজনুন খান কাকশাল এবং অন্যান্য মোগল কর্মকর্তাদের পাঠালেন। পুনপুন নদীটি পাটনার দশ মাইল পূর্বে গঙ্গা নদীতে এসে মিশেছে। বাঁধটি পাহারারত আফগান প্রধান সোলায়মান মানকালী এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবুই মানকালী রাত্রীকালীন আক্রমণে হতবাক হয়ে যান এবং নিজেদের অবহেলায় লজ্জিত হয়ে ঘোড়াঘাটের দিকে পালিয়ে যান।[৭৯]

পাটনা অবরোধ অবশ্য খুব বেশি অগ্রগতি সাধিত করতে পারেনি। এটা গঙ্গা নদী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং মোগল সেনাদের অবরোধ এই দুর্গটি অবজ্ঞা করেছিল। ১৫৭৩ সালের অক্টোবরে গুজরাট বিজয় শেষে প্রত্যাবর্তনের পর মুনিম খানকে সাহায্যের জন্য আকবর একটার পর একটা সেনাপ্রধান প্রেরণ করতে থাকেন। ১৫৭৮ সালের এপ্রিল মাসে মুনিম খান আকবরকে জানালেন যে অবরোধ ঠিকমত কাজ করছে না। একই বছরের ১৫ জুন আকবর নিজেই পাটনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং তার উপস্থিতি এখানকার পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টিয়ে দেয়। পাটনা গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পাটনার বিপরীতে গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে হাজীপুর অবস্থিত। হাজীপুর এতদিন পাটনার রসদ যোগানদার হিসেবে কাজ করত। পাটনার এতদিনের অবরোধ কার্যকর হয়নি এজন্য যে, তার রসদ সরবরাহ যেতো হাজীপুর থেকে। আকবর তাৎক্ষণিক হাজীপুর দখলের ব্যবস্থা নিলেন এবং দূর্গটি খান-ই- আলমের কাছে খুব শীঘ্রই পতন হলো।

হাজীপুরের পতন মোগলদের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধের মনোবলকে ভেঙ্গে ফেলে। নিমাত আল্লার মতানুসারে,[৭৯] দাউদকে দূর্গ ছাড়তে বাধ্য করা গেল না। ১৫৭৪ সালের ১০ আগস্ট কাতলু এবং অন্যান্য আফগান প্রধানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দাউদকে মাদক সেবন করালেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় একটি নৌকা করে রাজধানী তান্ডায় নিয়ে এলেন। দাউদের উজির শ্রীহরি সমস্ত সম্পদ একটা নৌকায় তুলে দাউদকে অনুসরণ করে বাংলার দিকে যাত্রা করেন। সেনাদল ও হাতি নিয়ে গুজার খান পাটনা থেকে বেরিয়ে এলেন। রাত্রিটা ছিল অন্ধকারাছন্ন। অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীর স্রোত ছিল স্ফীত এবং আশপাশের গ্রাম ছিল প্লাবিত। এধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কর অবস্থায় স্থান ত্যাগ ছিল দাউদের বাহিনীর জন্য ধ্বংসাত্মক। অসংখ্য সেনা দুর্গের আশে পাশে গর্তে ডুবে মারা যায়, বিশাল সংখ্যায় লোকজন নদীতে ডুবে যায়, আর ভীত হাতির দল অনেককে পিষে মেরে ফেলে; পলায়মান সৈন্য সামন্তদের চাপে নদীর উপর সেতুটি ভেঙ্গে পড়ে। ফলে অনেক সৈন্য ও হাতি পুনপুন নদীতে ডুবে মারা যায়। পরের দিন সকালে আকবর শূন্য দূর্গটি দখলে নেন এবং নিজেই পলায়মান আফগানদের পিছু ধাওয়া করেন। দ্রুতই গুজার খানকে ঘিরে ফেলা হয় কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন হাতি ফেলে রেখেই। বিপদ উপেক্ষা করে আকবর ধাওয়ায় নেতৃত্ব দিয়েই চলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পুনপুন নদী সাঁতরিয়ে পার হলেন। শুধুমাত্র পাটনা থেকে ষাট মাইল পূর্বে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডে গঙ্গা নদীর পাশে দরিয়াপুরে থামলেন। এভাবে বিহার থেকে দাউদকে বিতাড়িত করার পর এবং দাউদ ও তার আফগানদের বাংলা থেকে নির্মূল করতে মুনিম খানকে নির্দেশ দানের পর আকবর ১৫৭৪ সালের ২৪ আগস্ট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।[৮১] আকবরের আগমনের এক পক্ষকালের মধ্যেই দাউদের পরাজয় নিশ্চিত হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫৭৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোগলরা বস্তুত কোনো বিরোধিতা ছাড়াই আফগানদের নিকট থেকে সুরুজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কোলগাঁও এবং অন্যান্য স্থান দখল করে নেয়। পাটনা থেকে বিপর্যয়কর পশ্চাদপসরণ করার পর আফগানরা নিজেরাই কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কালাপাহাড়, সোলায়মান মানকালী এবং বাবুই মানকালীর নেতৃত্বে একটি ভাগ ঘোড়াঘাটের দিকে চলে যায়। দাউদের নেতৃত্বে অপর দলটি তান্ডায় আশ্রয় নেয়। ইসমাইল সিলাহদার এর তত্বাবধানে একটি ছোটো দল তেলিয়াগড়ের গিরি পথ রক্ষার্থে থেকে যায়। তেলিয়াগড়ের গিরিপথ অতিক্রম করে যাওয়াটা মুনিম খানের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অবশ্য তিনি স্থানীয় কিছু জমিদারকে প্রভাবিত করে একটি গোপন পথের সন্ধান লাভ করেছিলেন। যে পথে এক ডিভিশন মোগল সৈন্য অগ্রসর হয়ে আফগানদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে।[৮২] তাই পরিকল্পনাটি ভালোভাবেই সফল হয়। একই সময়ে সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগ উভয় দিক থেকে আক্রমণ হওয়ায় ছোট একটি সেনাদল নিয়ে ইসমাইল সিলাহদারের পক্ষে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লে তিনি পিছু হটে যান। বস্তুত তেমন কোনো লড়াই ছাড়াই তেলিয়াগড় ও মোগলদের কাছে পতন ঘটে। মুনিম খান ও টোডরমল আরো এগিয়ে যান। দাউদ তান্ডা ত্যাগ করেন এবং উড়িষ্যায় পিছু হটেন। মুনিম খান এবং টোডরমল কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তান্ডা দখল করেন। এখন তিনি নিজেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো গোছাতে মনোনিবেশ করেন। মুনিম খান চিরুনী অভিযান পরিচালনা করে আফগানদের বিভিন্ন শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে সরিয়ে দিতে অনেকগুলো সেনাদল পাঠান। মুহম্মদ কুলী খান বারলার নেতৃত্বে একটি দল দাউদের পিছু ধাওয়া করে এবং নিজেরা সাতগাঁওয়ে অবস্থান নেয়। মজনুন খান কাকশাল ও বাবু খান কাকশাল এর নেতৃত্বে একটি দল পাঠানো হয় ঘোড়াঘাটের দিকে। মুরাদ খান এর নেতৃত্বে আর একটি দল ফতেহাবাদ ও বাকলার দিকে যায়। ইতিমাদ খান এর নেতৃত্বে চতুর্থ দলটিকে সোনারগাঁওয়ের দিকে প্রেরণ করা হয়।[৮৩]

সুতরাং এটা বলা যায় যে দাউদের উড়িষ্যায় পালানোর সাথে সাথে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে আফগানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঘোড়াঘাটে সোলায়মান মানকালী, কালাপাহাড় ও অপরাপর আফগান প্রধানরা মাজনুন খান কাকশালের নেতৃত্বাধীন মোগল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। আফগানরা পরাজিত হয়। সোলায়মান মানকালীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত্যা করা হয়। আফগান বাহিনীর অবশিষ্টাংশ কুচবিহারে পালিয়ে যায়। আর তাদের পরিবার ও পোষ্যদের মোগলদের হাতে বন্দি রেখে যায়। মজনুন খান ঘোড়াঘাট দখল করেন এবং তার পুত্রকে সোলায়মান মানকালীর মেয়ের সাথে বিয়ে দেন। 'মুনতাখাব আল তাওয়ারিখ' এর তথ্যানুসারে মৃত সূর সুলতান জালাল উদ্দীনের (সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ সূর) সন্তানেরাও ঘোড়াঘাটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল (যে যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হয়)।[৮৪] দাউদের উজির শ্রীহরি প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে যশোরে পালিয়ে যান।[৮৫] মোগল সেনাধ্যক্ষ মহম্মদ কুলী

আমাদের দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খান বারলার আগমনে দাউদ মোগলদের সাথে লড়াই করার জন্য দেবরাকসাই (মেদিনীপুর শহর থেকে ১৫ মাইল পূর্বে) নামক দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ করেন। কিন্তু টোডরমলের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য মহম্মদ কুলী খান বারলা মান্দারান থেকে কুলিয়া (মেদিনীপুর শহর থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে) অভিমুখে রওনা হন। তিনি হরিপুর গড়ে ধরাশায়ী হন। এটি বাংলা-নাগপুর রেলওয়ের দান্তন ষ্টেশনের ১১ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।[৮৬] তাই দাউদ উড়িষ্যায় অবসর গ্রহণ করলে বাংলার উত্তর, পশ্চিম, কেন্দ্র ও দক্ষিণে কোনো সংগঠিত আফগান শক্তির উপস্থিতি পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে যখন আফগান প্রধানদের বাংলার আনাচে কানাচে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় একের পর এক পতন হচ্ছিল তখন ইমাদ কররানীর পুত্র জুনায়েদ কররানী, যিনি বাংলার সিংহাসনের কোনো উপেক্ষণীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন না, ঝাড়খণ্ডের (বীরভূম জেলার গঙ্গা নদীর দক্ষিণের স্থলভূমি) জঙ্গলে আর্বিভূত হন এবং মোগলদের সমস্যার কারণ হয়ে ওঠেন।[৮৭] এই জুনায়েদ কররানী দেবরাকসায়ে অবস্থানরত দাউদের সাথে যোগ দিতে চান। ভীষণ বিপদে থাকা দাউদ তার এই ধীর ও দুঃসাহসিক ভাইয়ের প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি যা প্রকারান্তরে আফগান স্বার্থের অনুকূলে যেত। দাউদ মোগলদের বিরুদ্ধে জুনায়েদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হন। হতাশ হয়ে জুনায়েদ ঝাড়খণ্ডে তার সুরক্ষিত দুর্গে ফিরে যান কিন্তু বিহারে মোগলদের জন্য একটা প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকেন।[৮৮]

১৫৭৫ সালে মুনিম খান এবং রাজা টোডরমল দাউদের খোঁজে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মোগলরা উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হয়। দাউদ তার পরিবারকে কটকে রেখে নিজে হরিপুর তাঁবুতে আশ্রয় নেন। পরিখা খনন করে এবং ইটের দেওয়াল নির্মাণ করে তিনি তার তাঁবুকে দূর্গায়িত করেন। মেদিনীপুর থেকে হরিপুর গড় পর্যন্ত চলমান রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানে তিনি প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করেন।[৮৯] মুনিম খান তার বাহিনী নিয়ে এ পথে অগ্রসর হওয়াটা কষ্টসাধ্য মনে করলেন কারণ বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং রাস্তাটাও খারাপ ছিল। অধিকন্তু মুহম্মদ কুলী বারলার মৃত্যুর পর মোগল সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েছিল কারণ তারা এই জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে আপত্তি জানিয়েছিল।[৯০] তবে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় একটা নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়। সেই পথে অগ্রসর হয়ে মোগলরা আফগানদের মুখোমুখি হয় তুকারয় নামক স্থানে ১৫৭৫ সালের ৩ মার্চে। এখানে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধটা মোগলমারির যুদ্ধ নামে খ্যাত।[৯১]

আফগান ও মোগল উভয় দলই তাদের সেনাদের সনাতনী পদ্ধতিতে সাজালেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর পার্থক্যটা হলো এই যে তাদের অতিরিক্ত ডিভিশনকে আলতামাস (altamash) বা অগ্রগামী দলের ঠিক পিছনের দল হিসেবে রাখা হয়। মোগলদের সামনে কামান আর আফগানদের সম্মুখে ছিল "তস্করের" এক বিশাল বাহিনী। এই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলমান পর্বতগুলোকে আরো ভয়ংকর করে তোলা হয় চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে এবং তাদের মাথা ও দাঁত থেকে অসংখ্য কালো বন্য প্রাণীর লেজ ঝুলিয়ে রেখে।[৯২]

আফগান বাহিনীর সম্মুখভাগে গুজার খান এবং মোগল বাহিনীর সম্মুখভাগে ছিলেন মুনিম খান। জ্যোতিষীরা দিনটি শুভ নয় মর্মে মত দিলে সেদিন যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা মুনিম খানের ছিল না। আফগানরা এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে মোগল সেনাধ্যক্ষ আলম খান অধৈর্য হয়ে উঠলেন। কাজেই মোগল সৈন্য বিন্যাস সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি আক্রমণ করার জন্য উৎসাহিত বোধ করেন। মুনিম খান আলম খানকে ডেকে পাঠান।[৯৩] এই ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা মোগল সৈন্যদের দ্বিধায় ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে আফগান সেনাপ্রধান অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে মোঘলদের আক্রমণ করেন এবং আলম খানকে হত্যা করেন।[৯৪] এমনকি তিনি "আলতামস" বা সম্মুখভাগের পিছনের অতিরিক্ত কেন্দ্রিয় সেনাদের তাড়িয়ে দেন। ফলে সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও মুনিম খান তার সৈন্যদের মাঠে রাখতে পারলেন না। মুনিম খান তরবারী উন্মুক্ত রেখে চাবুক মেরে যখন তার পলায়মান সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক সেই সময় গুজার খান এসে তাকে সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলেন। অশীতিপর এই সেনাধ্যক্ষ গুজার খানের তরবারীর আঘাতের পর আঘাতে তাঁর চাবুকের হাতল দিয়ে প্রতিহত করতে থাকেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হন। হঠাৎ করেই কিছু ভক্ত সেখানে উপস্থিত হয় এবং তারা জোর করে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে তাকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যায়। তিনি বেশ অনেক দূরেই গিয়ে অবস্থান করেন।[৯৫]

তুকারয়টি মোগলমারি থেকে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভট্টশালীর মতে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তুকারয় ও মোগলমারির মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে। তাই আফগান সেনাদলের সম্মুখভাগ মোগল বাহিনীর প্রধান অংশটিকে ধ্বংস করতে অক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ পূর্ণভাগ জয়ের পূর্বেই লুটপাটের প্রতি লোভ তাদের বিজয়কে বিধ্বস্ত করে দেয়। কিয়া খান এবং অন্যান্য মোগল সেনাধ্যক্ষরা লুটপাটরত আফগান সেনাদের উপর আক্রমণ করে বসেন। অজ্ঞাত হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটি ধনুক গুজার খানের মস্তিষ্ক ভেদ করে গেলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হন। গুজার খানের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার অগ্রসরমান বিজয়ী সেনাদল মুহূর্তেই জীবন রক্ষার্থে পলায়মান একটি উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। আফগান সেনাদলের বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ অন্যান্য আফগান উপদলকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়।[৯৬] টোডরমল এবং শাহাম খান মাঠে অনড় থেকে দাউদের মুখোমুখি হন। ইতিমধ্যে শাহাম খান আফগান সেনাদলের বাম অংশকে তাড়িয়ে দিয়ে টোডরমলের সমর্থনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাদের সমন্বিত শক্তির সামনে দাউদ টিকতে পারলেন না এবং উড়িষ্যার দিকে পালিয়ে গেলেন। আফগান বন্দিদের তরবারীর আঘাতে শিরচ্ছেদ করা হলো এবং তাদের বিভিন্ন মস্তক দিয়ে আটটি মিনার তৈরি করা হলো। মোগলদের জয় করা তুকারয় এর যুদ্ধের এই ছিল চিত্র।[৯৭] ভট্টশালীর পর্যবেক্ষণ হলো, যুদ্ধের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচিত নাম মোগলমারির যুদ্ধ (অর্থাৎ মোগলদের তাণ্ডব) ব্যাপকভাবে যুদ্ধে মোগলদের কার্যক্রমের জনসমর্থন লিপিবদ্ধ করে।

তোকারয় এর যুদ্ধে বাংলার সার্বভৌমত্ব আফগানদের হাত থেকে মোগলদের হাতে বদল হয়। যুদ্ধটি ছিল মোগলদের জন্য সিদ্ধান্তকারী বিজয় চিত্র। তাদের অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং অনেকেই আহত হয়েছিলেন। তোকারয় এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাউদ কটক এ চলে যান এবং অবরোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তার কটকের গভর্নর খান জাহান তাকে মোগলদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু দাউদ যুদ্ধের জন্য তার প্রস্তুতির অপ্রতুলতা এবং কটক থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার মোগলদের দৃঢ়তা বুঝতে পেরে মোগলদের সাথে দরকষাকষিকে শ্রেয় মনে করেন। যুদ্ধ বিধস্ত মোগলরা প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং টোডরমল, মুনিম খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি শান্তি চুক্তিকে বেশি সুবিধাজনক মনে করেন। বার্তা বিনিময়ের পর মোগলদের ঘাঁটিতে দাউদ-মুনিম খানের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৫৭৫ সালের ১২ এপ্রিল অন্যান্য দলীয় প্রধানদের নিয়ে দাউদ মোগল ঘাঁটিতে গমন করেন।[৯৮] মুনিম খান দাউদ খানকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে তাঁর ও তার দলীয় লোকদের জন্য চমৎকার মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করলেন। মুনিম খান ও দাউদ খান একটি চুক্তিতে উপনীত হলেন যা কটক চুক্তি হিসেবে পরিচিত। ধৈর্য্যচ্যুত টডরমল চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। দাউদ সম্রাট ও ভাইসরয়ের জন্য হাতি ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন: "সম্রাট আকবরের প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রকাশ হিসেবে দাউদ তার মুখ মোগলদের রাজধানীর দিকে ঘুরিয়ে প্রণত হলেন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ মহম্মদকে তার আনুগত্যের নিশ্চয়তা হিসেবে সম্রাট আকবরের দরবারে প্রেরণ করেন। মুনিম খান সম্রাটের পক্ষ থেকে দাউদকে একটি দামী 'খিলাৎ' (সম্মানসূচক আবরণ) একটি তরবারী এবং স্বর্ণখচিত বেল্ট উপহার দেন।[৯৯] আর এভাবেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সার্বভোমত্ব আফগানদের হাত থেকে মোগলদের কাছে হস্তান্তর নিবন্ধিত হলো।" ভট্টশালী বলেন, "মোগল বাহিনী প্রধান মুনিম খান যদি বিশ্বস্ত হতেন তাহলে তিনি দাউদের স্বর্ন উপহারে ধরাশায়ী হতেন না। যদি টোডরমলের পরামর্শ অনুসরণ করে আফগান আগুনের শেষ ফুলকিটি তখনই নিভিয়ে দেয়া যেত, তাহলে দীর্ঘ সময় পরও সম্রাট আকবরকে বাংলাকে বশে না দেখে কবরে শায়িত হতে হতো না।[১০০]

মোগল স্বার্থের প্রতি টোডরমলের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় মোগল বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ও সর্বাধিনায়ক হিসেবে মুনিম খান এমন কিছু করেন নি যাতে মোগল স্বার্থের প্রতি তার আনুগত্যের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে বলে মনে করা যায়। মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উদার মুসলিম হিসেবে, আবুল ফজলের মতে, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস রাখতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তার সেনা অধিনায়ক আলম খানকে ডেকে পাঠান। যদি তিনি জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণীতে ততটা আস্থা না দেখাতেন তাহলে তার বাহিনী এতটা বিপর্যস্ত হতো না যতোটা বাস্তবে হয়েছিল। আবার ইসলামের অনুসারী হিসেবে তিনি ভালোই জানতেন যে যখন কোনো শত্রু শান্তির চেষ্টা করে তাকে সে সুযোগ প্রদান করা উচিৎ। শান্তির প্রতি দাউদের আহ্বানে তার সাড়া দেওয়াটা তাই কোনাভাবেই মোগল স্বার্থের প্রতি মুনিম খানের বিশ্বাসহীনতা বোঝায় না। মুনিম খান যদি দাউদের আহ্বানে সাড়া না দিতেন তাহলে তিনি সর্বাধিক তাকে পরাস্ত ও হত্যা করতে পারতেন; এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু যেমনটি দৃশ্যমান, ঘটনার পরম্পরা তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি, কারণ দাউদের আনুগত্য কেবল দাউদের জন্যই শান্তি বয়ে এনেছিল। ভট্টশালী মনে করেন, "ব্যাপক অর্থে আফগানরা এই চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং মোগল আফগান দ্বন্দ্ব বাধাহীনভাবে চলতেই থাকে। বিভিন্ন নেতার অধীন বাংলা ও বিহারের আফগানরা অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকেন। আফগান রাজা যে মোগলদের সাথে শান্তি চুক্তি করেছে সে বিষয়টি দৈনন্দিন ঘটনা পরম্পরায় কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি।"[১০১] এটা প্রমাণ করে যে, দাউদের মৃত্যু, আত্মসমর্পণ অথবা পরাজয় কোনোটিই বাংলার ঘটনা পরম্পরার কোনো পরিবর্তন সূচিত করে নাই। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আফগানদের উপর দাউদের খুব সামান্য নিয়ন্ত্রণই ছিল। সুতরাং তোকারয় এর যুদ্ধে দাউদের পরাজয় এবং মোগলদের সাথে কটক শান্তি চুক্তি ব্যাপক অর্থে আফগানদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদের চূড়ান্ত পরাজয় এবং মৃত্যুও তাদের দ্বারা খুব একটা স্বীকৃত হয়নি। সম্রাট আকবরের পুরো শাসনকালে এবং জাহাঙ্গীরের শাসনকালের প্রথম দিকে সংগ্রাম চলতেই থাকে।[১০২] বিজ্ঞ পণ্ডিতের উপর্যুক্ত উক্তিটি দাউদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে তার পূর্বের খেদোক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, 'সম্রাট আকবরের বাংলাকে বশে না দেখে কবরে শায়িত হতে হতো না।' সুতরাং কটক চুক্তি দাউদের জন্য শান্তি এনেছিল কিন্তু ব্যাপক আফগান জনগণ তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে মোগল আফগান সংঘর্ষ চলতেই থাকে। আফগান প্রধানেরা রোহতাস, চন্ড এবং সাসারামে তাদের দখল অব্যাহত রাখেন। ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মূল ঘাঁটি থেকে জুনায়েদ কররানী দক্ষিণ বিহার আক্রমণ করেন। কালাপাহাড় এবং বাবুই মানকালী ঘোড়াঘাট থেকে মাজনুন খান কাকশালকে বিতাড়িত করেন। তারা গৌড় থেকেও মোগলদের বহিষ্কার করেন এবং উত্তরবঙ্গের পুরোটাই পুনরুদ্ধার করেন। এমনকি মোগল অধিকারে থাকা কররানীদের রাজধানী তান্ডাতেও পিছু ধাওয়া করা হয়। এই সময় মুনিম খান উড়িষ্যা থেকে ফিরে আসলে হতবাক হয়ে দেখেন যে উত্তরবঙ্গে বিজয়ী হয়ে আফগানরা তান্ডাতেও হুমকি দিচ্ছে। মুনিম খানের সময়োচিত আগমন পরিস্থিতিকে সামাল দেয়। তিনি রাজধানী তান্ডাকে আক্রমণ করেন, গৌড় পুনঃদখল করেন এবং মজনুন খানকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘোড়াঘাট দখল করতে প্রেরণ করেন। তিনি ঘোড়াঘাট দখল করতে পেরেছিলেন ফলে ঘোড়াঘাট এলাকার সমস্যা প্রশমিত হয়েছিল কিন্তু দমিত হয়নি।[১০৩]

১৫৭৫ সালের ১২ এপ্রিল কটক চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ১৫৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর মুনিম খানের মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে আফগানরা সমগ্র বিহার ও বাংলা জুড়েই ক্রমাগত সমস্যা সৃষ্টি করে চলে এবং মোগলদের ব্যতিব্যস্ত রাখে। আফগানদের দমনে মুনিম খান রাজধানী তান্ডা থেকে গৌড় স্থানান্তরের কার্যকর সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু স্থানান্তরটি খারাপ আবহাওয়া আর অতিরঞ্জনের কারণে মোগলদের সইল না। মহামারী দেখা দিল এবং লোকজন এত ব্যাপকহারে মৃত্যুবরণ করলো যে, তাদের সমাহিত করাটাই অসম্ভব হয়ে পড়লো। অবশ্য মুনিম খান তার পুরাতন কিন্তু স্থানান্তরিত রাজধানী থেতে মোগল বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে জুনাইদ কররানীর বরণের অজুহাতে খালি করে দেন। কিন্তু নিজে তান্ডায় তাঁবুতে অবস্থান করেন। এখানেই তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হন এবং দশদিন রোগে ভোগার পর ১৫৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।[১০৪] মুনিম খানের মৃত্যুর সংবাদ বহ্নোৎসবের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। দাউদ খান কররানী কটক চুক্তি খারিজ করে দেন। তিনি ভদ্রক এর মোগল সেনাপতি নছর বাহাদুরকে হত্যা করেন এবং জলেশ্বর এর মোগল সেনাপতি মুরাদ খান টান্ডায় পালিয়ে যান। মোগলরা গঙ্গা নদী অতিক্রম করে গৌড়ে মিলিত হয়। দাউদ খান অভিযান পরিচালনা করে তান্ডা পুনঃদখল করেন এবং দ্রুত এগিয়ে তেলিয়াগড়ের গিরিপথ বন্ধ করে দেন।[১০৫] মোগলরা ফাঁদে আটকা পড়ল। ইতিমধ্যে ভাটি অঞ্চলের শক্তিশালী জমিদার ঈশা খান, নৌ সেনাপতি শাহবারদীর নেতৃত্বে মোগল নৌ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলের জলপথ থেকে তাদের বিতাড়িত করেন।[১০৬] মোগলরা এই মহামারী আক্রান্ত এবং আফগান অধ্যুষিত দেশটি দ্রুত ত্যাগ করার জন্য ধৈর্য্যহীন হয়ে ওঠে আর ত্রিহুতের পথ ধরে ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগ শুরু হয়ে যায়।

সম্রাট আকবর বাংলায় খান জাহানকে মুনিম খানের স্থলাভিষিক্ত করেন। খান জাহান মুলত হুসেন কুলী খান নামে পরিচিত এবং বৈরাম খানের বোনের ছেলে। আফগানদের হাত থেকে প্রদেশকে উদ্ধারের জন্য খান জাহানের সাহায্যকারী হিসেবে টোডরমলকে নিযুক্ত করা হয়।[১০৭] খান জাহান ভাগলপুরে বাংলা থেকে মোগলদের দেশত্যাগকে প্রতিরোধ করেন। ৩০০০ জন আফগান নিয়ে আয়াজ খান খাইল তেলিয়াগড়ের দূর্গ রক্ষা করছিলেন। দূর্ধষ সংঘর্ষের পর মোগল সেনাধ্যক্ষরা আফগানদের ক্ষমতাচ্যুত করে তেলিয়াগড় পুনঃদখল করেন।[১০৮] কিন্তু মোগল বাহিনী আগমহল পর্যন্ত অগ্রসর হলে, দাউদ খান জাহানের এগিয়ে যাওয়ার পথটি রুদ্ধ করে দেন। দাউদ নিজে পরিখার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে শক্তিশালী অবস্থানে চলে যান এবং খান জাহানকে ৭ মাস আটকে রাখেন। আগমহলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ভট্টশালী লিখেছেন, "রাজমহল জেলাটি গঙ্গা নদীর ডান (পশ্চিম) তীর বরাবর ৪০ মাইল উত্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবস্থিত। মালদা জেলার গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে ২০ মাইল সোজা উত্তর পশ্চিমে রাজমহল শহরটি অবস্থিত। যে সময়ের আলোচনা আমরা করছি তার প্রায় ১৫ বছর পর এই শহরের অস্তিত্ব গড়ে উঠে। মনে হয়, গঙ্গার তীরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে শহরটি গড়ে ওঠে এবং এখানে সেখানে কিছু বিচ্ছিন্ন পাহাড় হঠাৎ করেই একত্রিত হয়ে রাজমহল পর্বতমালা গড়ে তুলেছে। গঙ্গা নদীটি পাহাড়কে আঘাত করেছে এবং এখানে প্রায় ৯০° কোণে বাঁক খেয়েছে। পরবর্তীকালে ঐ কোণের চূড়ায় শহরটি জেগে উঠেছে। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মানসিংহ যিনি রাজমহলের নামটি পরিবর্তন করে আকবর নগর রাখেন। পূর্বে স্থানটিকে বলা হতো আগমহল। বাংলা বিহারের সুলতানরা বিহারের উদ্দেশ্যে গৌড় থেকে যাত্রা কালে তাদের যাত্রার প্রথমাংশ সমাপন করে এখানে বিশ্রাম নিতেন। আর তাই স্থানটি আগমহল বা অগ্রবর্তী অবস্থান হিসেবে পরিচিত হয়।

গঙ্গা নদী থেকে রাজমহল পর্বতমালার মধ্যবর্তী ৮ মাইল প্রশস্ত সমতল ভূমি নিয়ে রাজমহল শহরটি অবস্থিত। উত্তরে প্রায় ১৫ মাইল দূরে এটা সংকীর্ণ হয়ে বিখ্যাত শিকরিগলি গিরিপথ হয়ে গেছে। আবার শহরের প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে রাজমহল পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত হয়ে গঙ্গার উপর সমান সীমানাযুক্ত একটি পথ বের হয়েছে। রাজমহল পবর্তমালা এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী পথটি মাত্র ২ মাইল প্রশস্ত। আবার এই শূন্যস্থানে মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় বেড়ে উঠেছে এবং কিছু জায়গা দখল করেছে। আর পথটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। বিচ্ছিন্ন ঐ পাহাড় আর গঙ্গার মধ্যবর্তী পথটি প্রশস্ততায় ১ মাইলের বেশি হবে না। বিহার থেকে বাংলার দিকে যাওয়ার ট্র্যাংক রোডটি এই পথের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এই রাজমহল গিরিপথের প্রায় ১ মাইল উত্তরে উদয়নালা নামে একটি জলস্রোত গঙ্গা নদীতে এসে মিশেছে। 'সিয়ার আল মুতাখখারিন' এর বর্ণনা অনুসারে জলস্রোতটি খুব গভীর এবং এর মুখটি লতাগুল্মভরা। এর তীর খুব খাড়া এবং উঁচু, আর এ জলস্রোত অতিক্রম করা খুব কঠিন।

রাজমহল গিরিপথের পশ্চিমে ফাঁকা রাস্তা, রজমহল পবর্তমালার পূর্ব দিকে শেষমাথা এবং বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল অতিক্রম করাও কঠিন। উত্তর দিকের ফাঁকা অঞ্চলটি বিস্তীর্ণ একটি জলাশয় দ্বারা ব্যাপৃত এবং উদয়নালা দ্বারা প্রস্রাবিত। তাদের একটিকে বলা হয় ডোমজালা। বুকানন বলেন যে, বর্ষাকালে নদীটি পূর্ব ও পশ্চিমে ৭ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত হয়ে যায়। শুস্ক মৌসুমে এটা সংকীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তখনও তা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৪ মাইল এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে দেড় মাইল বিস্তৃত থাকে। ডোমজালা এবং রাজমহলের মধ্যে আর একটি জলাশয় আছে যার নাম অনন্ত সরোবর। শীতকালে এটা প্রায় শুকিয়ে যায় কিন্তু বর্ষায় এটাও একটা বিস্তীর্ণ জলধারে পরিণত হয়। রাজমহল গিরিপথের ঠিক দক্ষিণে আর একটি জলাশয় আছে যার নাম চাঁদ শাহের ঝিল। এটা পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত আর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজমহল পর্বতমালার দক্ষিণে শুরু। এটা রাজমহল গিরিপথের পশ্চিমের পুরো ফাঁকা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এবং রাজমহলের প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে অবস্থিত। অর্থাৎ রাজমহল গিরিপথের পশ্চিমের ফাঁকা জায়াগা দিয়ে অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব এবং একমাত্র পথ যা উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়েছে। এটি রাজমহল গিরিপথের পূর্বাংশে প্রায় ১ মাইল প্রশস্ত।[১০৯]

সুতরাং ভট্টশালী জায়গাটিকে রাজমহল গিরিপথের সাথে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এখানেই দাউদ ৭ মাস ধরে খান জাহানকে আটকে রেখেছিলেন। খান জাহানকে রাজমহলে ধরে রাখা এবং শত্রুকে ক্ষমতাচ্যুত করার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা দাউদের ক্ষমতার অবস্থানকে তুলে ধরে। খানজাহানকে শত্রুর মোকাবেলায় রাজমহলে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল যদিও মারাত্মক কোনো সংঘর্ষে তাকে লিপ্ত হতে হয়নি। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ অবশ্য নিত্য ব্যাপার ছিল। শত্রুর অবস্থান পরিবর্তনের চেষ্টায় মোগল পক্ষের আব্দুল্লাহ খানকে প্রাণ হারাতে হয়। একই ভাবে আফগান সেনাধ্যক্ষ ইসমাইল খান সিলাহারও নিহত হন। কিন্তু মোগল বা আফগান কারোরই পুরোপুরি যুদ্ধ করার অবস্থা ছিল না। বর্ষা এ যাত্রায় অত্যাসন্ন ছিল। আফগানদের দ্বারা খানজাহানের সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং এলাকার অন্যান্য অসুবিধাগুলো মোগলদের ভীত করে তোলে। এছাড়াও, সুন্নী মোগলেরা শিয়া মোগল সেনাধ্যক্ষ খান জাহানকে পছন্দ করতেন না। খান জাহান নিজেকে একটু অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়াটি বুঝতে পারলেন।[১১০] তিনি সম্রাট আকবরের কাছে খাদ্য ও সৈন্য সরবরাহের জরুরী বার্তা পাঠান।[১১১] আকবর নৌকা যোঝাই খাদ্য পাঠালেন এবং বিহারে মুজাফ্ফর খানকে খান জাহানের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১১২] মুজাফ্ফর খান পাটনা ত্যাগ করার সাথে সাথেই পাটনা ও হাজীপুরের প্রভাবশালী এক জমিদার গজপতি পিছন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, দাউদের পক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং সম্রাট আকবরের সাথে মুজাফ্ফরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। এই গজপতি মূলত মোগলদেরই একজন ছিলেন। মনে হয় রাজমহলে খান জাহানের দীর্ঘ বন্দিদশার সাথে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্য সামরিক কর্মকাণ্ড একটা সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল। দাউদ মোগল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটি দল যারা খান জাহানের পিছনের দিকে বেশ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। এই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও ১৫৭৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৫৭৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আফগানদের সামরিক নিষ্ক্রিয়তা বোধগম্য নয়।

এক্ষেত্রে নিমাত আল্লা আমাদের মূল্যবান তথ্য যোগান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "যেহেতু মিয়া কাতলু খান জাহানকে এমন একটা আভাস দিয়েছিলেন যে সংঘর্ষ চলাকালে আমি মাঠ ত্যাগ করে যুদ্ধ তুঙ্গে থাকা অবস্থায় পালিয়ে যাব, তাই যখন উভয় পক্ষই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কাছাকাছি চলে আসে, তিনি তার লোকজন নিয়ে পালিয়ে যান।[১১৩] এই বিবৃতি থেকে জানা যায় যে কাতলু খান খান জাহানের সাথে ষড়যন্ত্র

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। কাতলুখান পরে তাকে ঘুষের বিনিময়ে উড়িষ্যা দিয়ে দেন। ভট্টশালীর মতে,[১১৪] দাউদের পতনের পূর্বেই শ্রীহরি ও তার ভাইয়েরা মোগলদের সাথে যোগ দেয় যা দাউদ জানতেন কিন্তু অবিশ্বাস করেছেন। শ্রীহরির পক্ষ ত্যাগ দাউদকে ভীষণভাবে হতাশ করে আর তিনি পাহাড়ে তার গোপন আস্তানা থেকে বের হয়ে সমতলে মোগলদের সাথে মিলিত হন। রহিম যথার্থই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে,[১১৫] আস্থাভাজন শ্রীহরির স্বপক্ষ ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতা দাউদকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং তিনি সন্দেহ করেন তার প্রধানদের আরো কেউ হয়তো একই খেলা খেলবে। তাই তিনি স্বপক্ষ ত্যাগের মাধ্যমে তার শক্তি নিয়ে খেলার চেয়ে মোগলদের সাথে খোলাখুলি সংঘর্ষের ঝুঁকি নেওয়াটা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। এছাড়া আর কোনো বিবেচনা ছিল না যা দাউদকে প্ররোচিত করেছিল তার শক্তিশালী ও কৌশলগত অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। কারণ এ অবস্থানে তিনি সফলভাবে মোগল সেনাধ্যক্ষদের তাদের সৈন্যসহ সাত মাস আটকে রেখেছিলেন এবং দ্বন্দ্বে মোগলরা দাউদকে তার শক্তিশালী কৌশলগত অবস্থান ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। কূটনীতি এবং কৌশলগত উভয়দিক থেকেই মোগলরা বিজয়ী হয়। খান জাহান এবং মুজাফ্ফর খান ভাগলপুর থেকে সামনে অগ্রসর হন এবং রাজমহল পর্বতমালার সমতলে তাঁবু স্থাপন করেন। এখানে তারা দাউদের মুখোমুখি হন। দাউদ অবশ্য তার চাচাতো ভাই জুনায়েদ কররানীর উপর আস্থা রেখেছিলেন। জুনায়েদ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাউদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মোগল পক্ষে কমান্ডে ছিলেন খান জাহান। ডানদিকের নেতৃত্বে ছিলেন মুজাফ্ফর খান। বামদিকটা ছিল টোডরমলের অধীন। আলতামাছ বা সেনামুখের পেছনের প্রধান অংশ ছিল ইসমাইল কুলী খান, কিয়া খান ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে। সাহাম খান, মুরাদ খান ও অন্যান্যরা সেনাদলের অগ্রভাগের নেতৃত্বে ছিলেন। আফগান পক্ষে কেন্দ্রিয় কমান্ডে ছিলেন দাউদ খান নিজেই। কালাপাহাড় ডান দিকের নেতৃত্বে আর জুনায়েদ বাম দিকের নেতৃত্বে ছিলেন। সেনামুখের নেতৃত্বে ছিলেন খান জাহান এবং উড়িষ্যার গভর্নর কাতলু খান।[১১৬]

১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই যুদ্ধ শুরু হয়। ভট্টশালীর মতে, ট্র্যাঙ্করোডের উভয়দিকেই যুদ্ধ মারাত্মক রূপ নেয়। পরিখার পুরোনো লাইন বরাবর উত্তরে উদয়নালায় তা অতিক্রম করে।[১১৭] জুনায়েদ কররানী যদিও আগের রাতে মোগল কামানের গোলার আঘাতে আহত হয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধে তার সেনাদের নেতৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। যুদ্ধেই তিনি নিহত হন। একইভাবে কালাপাহাড়ও যুদ্ধরত অবস্থায় আহত হন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে যান।

জুনায়েদ কররানীর মৃত্যু এবং কালাপাহাড়ের পলায়ন আফগানদের দুর্বল করে দেয়। মোগল সৈন্যদের সম্মুখভাগ এবং আলতামাছ এর আক্রমণে আফগান প্রধান খান জাহান নিহত হন। এর পরই আফগান কেন্দ্রীয় সেনাদল কোনো বিরোধিতা ছাড়াই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মসমর্পণ করে। জীবন রক্ষার্থে দাউদ পালিয়ে যান। অবশ্য তার ঘোড়া জলাভূমিতে আটকে যায় এবং তিনি ধরা পড়েন। খান জাহানের নিকট তাকে বন্দি অবস্থায় আনা হয়। এই শেষ ট্রাজিক দৃশ্যটি ভট্টশালীর ভাষায় জীবন্ত ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন, 'খান জাহান কড়া ভাষায় দাউদকে তার শপথ ও চুক্তি ভঙ্গের জন্য ভর্ৎসনা করেন। আত্মসংবরণ করে দাউদ জানান যে চুক্তি ছিল খানই খানান মুনিম খানের সাথে এবং নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় এখন এসেছে। দাউদ একজন সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাকে হত্যা করার কোনো সিদ্ধান্ত খান জাহানের ছিল না। রোদে তৃষ্ণার্ত হয়ে দাউদ পানি চাইলে একজন খলনায়ক তার জুতায় পানি ভরে এনে তাকে দিলে তিনি তা পান করতে অস্বীকৃতি জানান। তার ব্যক্তিগত পানপাত্র থেকে দাউদকে পানি দেওয়ার উদার মানসিকতা খান জাহানের ছিল। তিনি তার জীবন রক্ষা করতে পারেননি যেহেতু সকল অমাত্যই তার মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিল। জল্লাদ তার তরবারী দিয়ে ঘাড়ে দুইবার ব্যর্থ আঘাত করে এবং কেবল তৃতীয় আঘাতেই তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছিন্ন মাথাটি সৈয়দ আব্দুল্লাহ খান এর মাধ্যমে মোগল সম্রাট আকবরের কাছে পাঠানো হয়। আকবর বাংলার দিকে এক ধাপ এগিয়ে এসেছিলেন। কাতলু খান এবং শ্রীহরি তাদের অবৈধ সম্পদ উপভোগ করার জন্য যথাক্রমে উড়িষ্যা ও যশোর চলে আসেন।[১১৮] আর এ ভাবেই বাংলায় সোলায়মান কররানীর শাসনের অবসান ঘটে। রাজমহলের যুদ্ধ অবশ্য বাংলায় আফগান শাসনেরও অবসান ঘটায়।

পাদটীকা ও সূত্র সমূহ

১. সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের সময়ের তাজ খান কররানী শিলালিপিসমূহ 'শিলালিপি', খণ্ড-৪ পৃ. ২৪৮

২. রহিম, পৃ. ১৬৯

৩. আকবরনামা, খণ্ড-৩ পৃ. ৬৪৭। আবুল ফজল বলেন: 'সেই ভাটি অঞ্চলে তিনি (সোলায়মান) ক্রমাগত ভাবে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন এবং বিশাল বাহিনী নিয়ে সেই দেশে যান এবং অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর আত্মসমর্পণ করেন। অল্প সময় পরে তিনি আবারও বিদ্রোহ করেন। তারা চাতুরীর মাধ্যমে তাকে আটক করেন এবং কসাই খানায় প্রেরণ করেন।' রহিমের মতে এই ঘটনাটি ১৫৪৮ সালে সংঘটিত হয়। (রহিম, পৃ. ১৬৯)

৪. নিমাত আল্লা , খণ্ড ১, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

৫. চার্লস স্টুয়ার্ট, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯০৩ পৃ. ১৪৯। এইচবি ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১

৬. নিমাত আল্লা খণ্ড-১ পৃ. ৪০৯-৪১০। (এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে) ডর্ন কর্তৃক বিবৃত কাহিনীটি (পৃ. ১৭৯-১৮০) এরূপ গঙ্গা নদীতে একটা মারাত্মক সংঘর্ষ হয় যেখানে কররানীদের আবারও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় এবং তারা গৌড় ও বাংলায় পিছু হটে যায়। রাম ও ফতেহ খান বাটনীর প্রপিতা পূর্বোক্ত স্থানের গর্ভনর সেলিম খান কাকর তাদের আগমনের বিবরণ পেয়ে ছোটো একদল অনুচর সহ তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসেন কিন্তু তাজ এটাকে একটি সুন্দর সুযোগ পেয়ে উভয় প্রধানকে হত্যা করেন। ফলে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৌড়ে এক ভয়াবহ হৈচৈ সৃষ্টি হয় এবং কাকর ও বাটনীরা তাদের সেনা সামন্ত জড়ো করেন এবং কররানীদের সাথে লড়াই করতে যান। অবশ্য আদলীর নামে তাজ একটি ফরমান জারি করেন এবং প্রচার করেন যে তিনি শুধুমাত্র এই ফরমান অনুযায়ী কাজ করেছেন। এই কৌশলে হৈচৈ থেমে যায় এবং অমাত্যদের বড় একটা অংশ কররানীদের সাথে অংশ নেন। সেলিমের মৃত্যুতে তাজ বিপুল পরিমাণ হাতি এবং চাকর বাকর অর্জন করেন এবং নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতায় আসীন করেন। এরপর তিনি তার ভাই সোলায়মানকে গৌড়ে ছেড়ে আসেন এবং নিজে হাজীপুরের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন।

৭. রিয়াজ, পৃ. ১৫১

৮. উপরে বর্ণিত ঘটনা সমূহ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে

৯. আকবরনামা, ইংরেজি অনুবাদ, ২য় খণ্ড পৃ. ৩২৫

১০. ইনস্ক্রিপসনস, পৃ ২৪৬। শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ আছে ৯৬৭/১৪৫৯ খ্রি. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের শাসনকালে আজমল কররানীর পুত্র মসনদে আলা তাজ খান কররানী একটি মসজিদ নির্মাণ করেন

১১. রহিম পৃ. ১৭২

১২. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৭৪

১৩. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৭১-১৭২

১৪. রহিম পৃ. ১৭৪

১৫. ভট্টশালী 'বেঙ্গল চীফস স্ট্রাগল ফর ইনডিপিন্ডেন্স'-বেঙ্গল :পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট গ্রন্থে, খণ্ড-৩৮, ১৯২৯, পৃ. ১৩৭

১৬. আকবরনামা খণ্ড-২, পৃ. ৩১৫ রহিম, পৃ. ১৭৪ তিনি লিখেছেন, "এটাই সেই সময় ছিল যখন সূর বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং উত্তর ভারত পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ চেষ্টা করে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সূর বংশের বিলুপ্তি সোলায়মানকে আফগানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই সুযোগ এনে দেয় "

১৭. চালর্স স্টুয়ার্ট হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯০৩, পৃ. ১৭৩

১৮. বাদাউনী, ২য় খণ্ড পৃ. ১৮-১৯, রহিম, পৃ. ১৮১

১৯. রহিম, পৃ. ১৮১

২০. আকবরনামা, খণ্ড-২, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫, রহিম, পৃ. ১৭৬

২১. উপরোল্লিখিত, পৃ. ২৫৮

২২. আকবরনামা, খণ্ড-২, পৃ. ৩১৫

২৩. উপরোল্লিখিত, খণ্ড-২, পৃ. ৩২৫

২৪. উপরোল্লিখিত, খণ্ড-২, পৃ. ৩২৫-৩২৬

২৫. উপরোল্লিখিত, খণ্ড-২, পৃ. ৩২৫-৩২৬

২৬. এইচবি, খণ্ড-২, পৃ. ১৮৩

২৭. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৮৩

২৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৮৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাস, কলকাতা :খণ্ড-২; ১৯৭৪ খণ্ড -২ পৃ. ২৮৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৯. এইচবি খণ্ড-২ পৃ. ১৮৩। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পুরাতন সংস্করণ খণ্ড-৬৯, অংশ-১ পৃ. ১৮৯
৩০. নিমাত আল্লাঃ খণ্ড-১ পৃ. ৪১৩-৪১৫। বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট ১৯৫৩, পৃ ২২
৩১. ভট্ট শালী :বেঙ্গল চিফস স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেস ইন বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট খণ্ড ৩৫ ১৯২৮ পৃ. ৩২। তরফদার পৃ. ৪০-৪৩। গাইট; হিষ্ট্রি অব আসাম : পৃ. ৪৭
৩২. এইচ.বি ১১ খণ্ড পৃ. ১৮৪
৩৩. তরফদার, পৃ. ৪০-৪১
৩৪. গাইট, হিষ্ট্রি অব আসামঃ পৃ. ৪৯- ৫০
৩৫. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৪৮
৩৬. গাইটঃ হিষ্ট্রি অব আসাম, পৃ. ৪৯-৫০
৩৭. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৫০-৫১
৩৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৫১
৩৯. এইচ বি ২য় খণ্ড , পৃ. ১৮৪
৪০. গাইট, হিস্ট্রি অব আসাম, পৃ. ৫২-৫৩। তিনি লিখেছেন সুদূর তেজপুর পর্যন্ত মোহামেডানেরা ব্রহ্মপুত্র আরোহণ করেছিল কিন্তু দেশটির স্থায়ী দখল নিতে তারা কোনো চেষ্টা করেননি এবং কামাখ্যা, হাজো ও অন্যান্য জায়গার মন্দির সমুহ ধংসের পর বাংলায় ফিরে যান। মোহামেডান সেনাদলের প্রধান হিসেবে সব স্থানীয় প্রথারই মতো হচ্ছে বিশ্বাস ঘাতক কালাপাহাড়ের দিকে।
৪১. এইচ বিঃ ১১ খণ্ড, পৃ. ১৮৪
৪২. এন বি রায় মনে করেন যে কররানীরা তাদের শক্তি কুচ সীমান্ত থেকে উড়িষ্যার পুরীতে এবং সনে থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। সূত্র এইচবি, খণ্ড -১১ পৃ. ১৮১; বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট খণ্ড, ৩৮, ১৯২৯. পৃ. ২৩
৪৩. পার্চাস, হিজ পিলগ্রিমস, খণ্ড-১০, পৃ. ১৩৭
৪৪. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬৪, পৃ. ৩০
৪৫. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৫, পৃ. ৩০৩, রহিম, পৃ. ১৭৫
৪৬. নিমাত আল্লা, পৃ. ৪১৫; রহিম, পৃ. ১৭৫
৪৭. বাদাউনী, মুন্তাখাব আল তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড পৃ. ২০০-২০১
৪৮. এস.সি.মিত্র; যশোর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩, রহিম, পৃ. ৭১
৪৯. আকবরনামাঃ খণ্ডঃ ৩, পৃ. ২৮, ১০০-১০১
৫০. রহিম, পৃ. ১৮৫
৫১. ইনস্ক্রিপশনসঃ পৃ. ২৫০-২৫৪
৫২. ইনস্ক্রিপশনস এ উদ্ধৃত
৫৩. র‍্যাভেন শ', গৌড়ঃ ইটস রুইন্স এন্ড ইনস্ক্রিপশন্স : পৃ. ৪৪
৫৪. দাউদী, পৃ. ২০৪-২০৫। এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে। যখন 'হযরত-ই-আলা' উপাধি ধারণকারি মিয়া সোলায়মান মৃত্যুবরণ করেন, তার জ্যেষ্ঠপুত্র মিয়া বায়েজিদ তার উত্তরাধিকারী হন। যেহেতু তিনি গর্ববোধকারী ছিলেন, তিনি তার পিতার নীতি থেকে দূরে সরে যান। তার পিতা স্বাধীন আফগানদের কূটনীতির চালে সবসময় মুগ্ধ রাখতেন। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তে তিনি সংকীর্ণমনা এবং এই আফগানদের বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। আরো দেখুন, জেএএসবি, ১৮৭৫ পৃ. ৩০৪-৩০৫, রিয়াজঃ পৃ. ১৫৪ পাদটীকা-১।

৫৫. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৫ পৃ. ৩০৪-৩০৫; রিয়াজ পৃ. ১৫৪ পাদটীকা-১

৫৬. নিমাত আল্লা, পৃ. ৪১৬, এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে। "অমাত্য ও সেনাপতিরা মিয়া সোলায়মানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিয়া বায়েজিদকে পদোন্নতি দেন এবং তার নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা খোদাই করান"

৫৭. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৪১৬, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৭৫, পৃ. ৩০৪-০৫ রিয়াজ পৃ. ১৫৪ পাদটীকা-১ দাউদি, পৃ. ২০৫

৫৮. রহিম, পৃ. ১৮৬ দাউদী,পৃ. ২০৫-২০৬ রিয়াজ, পৃ. ১৫৩-১৫৪। ভট্টশালী বেঙ্গল ইটস স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্টঃ খণ্ড-৩৫,১৯২৮, পৃ. ১৪০ ৫৯. টান্ডা, খাসপুর তান্ডা নামেও পরিচিত। পুরাতন মালদা জেলার গৌড়ের পুরাতন নগরীর কাছে অবস্থিত। এটা গৌড়ের প্রায় বিপরীতে গঙ্গা নদীর পশ্চিম দিকে মালদা শহরের দক্ষিণ পূর্বে ১৫ মাইল দুরে অবস্থিত। ১৮২৬ সালের দিকে তান্ডা বন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এটা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে এটা লক্ষীপুর থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে ধূলার স্তূপ হিসেবে বিদ্যমান। দেখুন রিয়াজ পৃ. ১৫২ পাদটীকা-১ জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৫। পৃ. ২১৫

৬০. সুলতানী আমল পৃ. ৩১৯

৬১. আকবর নামাঃ ৩য় খণ্ড,পৃ. ২২৬-২২৭

৬২. রহিমঃ পৃ. ১৮৬

৬৩. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৮৪। রিয়াজ পৃ. ১৫৪

৬৪. আকবর নামা ইংরেজি অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২-২৩

৬৫. দাউদী, পৃ. ২০৬। এখানে ফার্সি উদ্ধৃতি আছে

৬৬. উপরোল্লিখিত, পৃ. ২০৬

৬৭. উপরোল্লিখিত, পৃ. ২০৬

৬৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ২০৬। এখানে একটি ফার্সি উদ্ধৃতি আছে

৬৯. উপরোল্লিখিত, পৃ. ২০৬। এখানে একটি ফার্সি উদ্ধৃতি আছে। আরো দেখুন; আকবর নামাঃ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২

৭০. ভট্টশালী বেঙ্গল ইটস স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপিন্ডেন্স ইন বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্টঃ খণ্ড- ৩৫, ১৯২৮, পৃ. ১৪১

৭১. রহিম, পৃ. ১৮৯

৭২. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৮৯

৭৩. দাউদী, পৃ. ২০৭। এখানে একটি ফার্সি উদ্ধৃতি আছে। রহিমঃ পৃ. ১৮৯। ভট্টশালী বেঙ্গল ইটস স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৩৫, ১৯২৮, পৃ. ১৪১

৭৪. আকবর নামাঃ ৩য় খণ্ড ইংরেজি অনুবাদঃ পৃ. [illegible]৭

৭৫. সুপরা, পৃ. ১৩[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭৬. আকবর নামা: ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৬
৭৭. রিয়াজ:পৃ. ১৫৬
৭৮. আকবর নামা: ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১
৭৯. উপরোল্লিখিত, : ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬
৮০. নিমাত আল্লা: পৃ. ৪১৭
৮১. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট: খণ্ড-৩৫ কলিকাতা ১৯২৮, পৃ. ১৪২
৮২. রহিম: পৃ. ১৯৭
৮৩. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৯৮
৮৪. রাখালদাস : বাঙলার ইতিহাস: ২য় খণ্ড, কলিকাতা: ১৯৭৪,পৃ. ২৯৩
৮৫. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট : খণ্ড-৩৬, ১৯২৮, পৃ. ৩। রহিম, পৃ. ১৯৪
৮৬. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৯৯-২০০. জে.এন.সরকার লেখেন :আমি তাবাকাত এ প্রাপ্ত টোডরমলের প্রথম যাত্রাবিরতির স্থানের নাম দেবরা-কাসারি বা দেবরা কাসাই পেয়েছি। মেদিনীপুর শহরের ১৫ মাইল পূর্বে দেবরা অবস্থিত এবং দেবরার ৪ মাইল পশ্চিমে কাসারি অবস্থিত। এই দুই গ্রামের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ রাস্তাটি পূর্ব পশ্চিমের রাস্তায় আড়াআড়ি চলে গেছে। কাসারির অধিকতর বিখ্যাত শহরটি মেদিনীপুর শহরের ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। টোডরমল যে পথ দিয়ে গেছেন এটি তা হতে পারে না। বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট; ৫০ খণ্ড ১৯৩৫ পৃ.৪
৮৭. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট; খণ্ড ৩৬, ১৯২৮, পৃ. ১৩
৮৮. উপরোল্লিখিত, খণ্ড ৩৬, ১৯২৮ পৃ. ২-৩
৮৯. রহিম: পৃ. ১৯৯-২০০
৯০. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট : খণ্ড-৩৬, ১৯২৮, পৃ. ৩-৪
৯১. উপরোলিখিত, পৃ. ৬, বিশ্বভারতী পত্রিকা খণ্ড-১৪ পৃ. ২৭৬
৯২. রহিম :পৃ. ১৯৯-২০০
৯৩. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৩৬, ১৯২৮, পৃ. ৩, ৪
৯৪. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৬, বিশ্বভারতী পত্রিকা: খণ্ড-১৪ পৃ. ২৭৬
৯৫. উপরোল্লিখিত, খণ্ড: ৩৬ ১৯২৮,পৃ. ৫,৬
৯৬. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৬। রহিম : পৃ. ২০১,২০২
৯৭. জে. এন, সরকার : বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৫০,১৯৩৫,পৃ. ৪
৯৮. উপরোল্লিখিত, খণ্ড -১,১৯৩৫, পৃ. ৪ রহিম: পৃ. ২০২
৯৯. আকবর নামা খণ্ড -৩ পৃ. ১৮৪, ১৮৫, রহিম, পৃ. ২০৩
১০০. বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৩৬, পৃ. ৭
১০১. উপরোল্লিখিত, খণ্ড: ৩৬, পৃ. ৭
১০২. উপরোল্লিখিত, খণ্ড: ৩৬, পৃ. ১৯
১০৩. রহিম পৃ. ২০৩
১০৪. বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৩৬, ১৯২৮, পৃ. ৮, রহিম, পৃ. ২০৪
১০৫. উপরোল্লিখিত, খণ্ড: ৩৬, ১৯২৮,পৃ. ৯
১০৬. উপরোল্লিখিত, খণ্ড: ৩৬, ১৯২৮, পৃ. ৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০৭. উপরোল্লিখিত, খণ্ড: ৩৬, ১৯২৮, পৃ. ১০
১০৮. উপরোল্লিখিত, খণ্ড ৩৬, ১৯২৮, পৃ. ১০
১০৯. উপরোল্লিখিত, খণ্ড ৩৬, ১৯২৮, পৃ. ১০,১১। ১১পৃষ্টার পদটীকা ৭ দেখুন
আব্দুল লতিফ বলেন যে ভাটি বা উড়িষ্যার দিকে গেলে বাংলার সুলতানের একই ভাবে একটি 'পাছ-মহল' (পিছনের অবস্থান) ছিল
সূত্র জে. এন. সরকার 'আব্দুল লতিফ'স ট্রাভেলস ইন বিহার' একটি প্রবন্ধ যা জার্নাল অব দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটি তে প্রকাশিত হয়। খণ্ড-৫, ১৯১৯, পৃ. ৬০১
১১০. আকবর নামা: ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০
১১১. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৮০
১১২. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৮০
১১৩. নিমাত আল্লা: খণ্ড-১, পৃ. ৪১৯,৪২০। এখানে একটি ফার্সি উদ্ধৃতি আছে
১১৪. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৩৬, ১৯২৮ পৃ. ১৬। ভট্টশালী লিখেছেন 'প্রতাপাদিত্য চরিত' থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে যখন দাউদ নিজেকে রাজমহলে পরিখায় আবদ্ধ করেন তখন শ্রীহরি এবং তার ভাইয়েরা সন্ন্যাসী হয়ে উত্তর বঙ্গের কোনো জায়গায় গোপনে লুকিয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে টোডরমল এবং খান জাহান (বসু কর্তৃক ওমরাও-সিং হিসেবে আখ্যায়িত) রাজমহলে তাবু গাড়েন। এখান থেকে তারা গৌড়ের দিকে অগ্রসর হয়। সেখান থেকে লুট পাট করা হয়েছিল কিন্তু পর্যাপ্ত ধন সম্পদ আহরণে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা ঘোষণা দেন যে যদি কোনো ব্যক্তি রাজকীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং দাউদ সরকারের সময় যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাকে সেখানে পুনঃবহাল করা হবে। শ্রীহরি এবং তার ভাই তখন রাজমহলে গেলেন এবং টোডরমলের ও খান জাহানের নিকট গোপনে এক লোক পাঠালেন এবং নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ায় দেখা করলেন। শ্রীহরির ভাইয়েরা এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন এবং রাষ্ট্রীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি সহ তথ্য প্রদান করলেন যে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব দিকে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে যশোর রাজ্যের মালিকানায় তাদের অবস্থান ও অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না দাউদের ভৃত্য শ্রীহরির স্বপক্ষ ত্যাগের কথা রাজমহলের বাজার থেকে জেনেছিলেন এবং সে মতে তার প্রভুকে তা জানিয়েছিলেন। বসু থেকে উদ্ধৃতি দাউদ বলেন, এটা সত্য হতে পারে না। যদি তা হতো, তাহলে বিক্রমাদিত্য অবশ্যই আমাকে জানাতো, ভৃত্যটি বলেন ; এটা তাই হওয়া উচিৎ মহারাজ কিন্তু এখন সময় যে বিশ্বাসঘাতকদের। অধিকন্তু তারা হিন্দু এবং বিশেষভাবে ঈর্ষাপরায়ণ। যদি তারা স্বাধীন কর্তৃত্ব পেয়ে যায় তাহলে আপনার প্রতি তাদের পূর্ণ অনুগত্য রাখবে কেন?
১১৫. রহিম, পৃ. ২০৬, এখানে রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য থেকে ইংরেজি অনুবাদ আছে। পৃ. ৩২ -৩৮ রহিম পৃ. ২০৬ এর উদ্ধৃতি
১১৬. এখানে একটি ইংরেজি উদ্ধৃতি আছে
১১৭. বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ১৯২৮, খণ্ড-৩৬ অংশ-১ পৃ. ১৮
১১৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১১৮-১১৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়
বাংলায় আফগান প্রশাসন

সাধারণ মানুষ হলেও শেরশাহ তার পিতার জায়গির খাসপুর এবং তান্ডায় ভূমি প্রশাসনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার বড় ধরনের সাফল্যও ছিল। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে বিহারের শাসক বিহার খান লোহানীর সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করেন। অপরিহার্য মনে হওয়ায় স্বামী বিহার খান লোহানীর মৃত্যুর পর স্ত্রী দুদু বিবি শেরশাহকে চাকুরিতে বহাল রাখেন। বালক-সুলতান বিহার খানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিহারের শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং প্রশাসনে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কিন্তু ১৫৩৩ সালে বিহারে সুলতান মাহমুদ শাহের পরাজয় এবং ১৫৩৪ সালে সুলতান জালাল খান লোহানীর পলায়নের সময় থেকে বিহার এবং বাংলার অধিকৃত অংশে শেরশাহ হযরত-ই-আলা (মহামান্য) ছাড়া অন্য কোনো বড় ধরনের উপাধি ধারণ না করেই প্রকৃত অর্থে শাসন করছিলেন।[১] তিনি তার নিয়ম কানুন প্রবর্তন করে এবং পদ্ধতিগতভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করেন। কিন্তু যেহেতু ১৫৩৩ সাল থেকে ১৫৩৯ সাল ছিল নিয়মিত যুদ্ধের বছর, মোগল, আফগান আর বাঙালির দ্বারা বিহার ও বাংলার সীমানা দখল ও পুনঃদখলের বছর, শেরশাহ তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তার আওতাধীন এলাকা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকেন।

সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জির লেখকেরা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি সম্মানীয় কৃষক ও প্রজাদের কল্যাণের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। দাউদী[২] বলেন যে, এই সময় তিনি ডাকাতি ও লুটে জড়িত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি জনগণের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাই খিদির খান সুর্ককে যখন তিনি বাংলার প্রশাসক নিয়োগ করেন তখন প্রশাসনের সমস্যাবলীর কথাও চিন্তা করেছিলেন এবং লাহোরের সাথে সোনারগাঁ সংযোগকারী ট্র্যাংক রোড নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। দাউদী লিখেছেন, "সিংহাসনে আরোহণের দিনেই শেরশাহ আদেশ দেন সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু নদী, যা নীলাব নদী নামে পরিচিত এবং যার দূরত্ব ১৫০০ করোহ, পর্যন্ত একটা সড়ক নির্মাণ করা হোক। তিনি আরো নির্দেশ দেন যে সড়কের প্রতি করোহ পর পর একটি সড়ক সরাইখানা নির্মাণ করা হোক।"[৩] কিন্তু শেরশাহের প্রশাসনিক নির্দেশনা কতটুকু কার্যকর হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা বেশ দুষ্কর। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে খিদির খানের কর্তৃত্ব সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

~ www.amarboi.com ~

সুতরাং এটার সম্ভাবনাই প্রবল যে, সড়ক নির্মাণ কার্যক্রমটি এই পর্যায়ে গৌড় থেকে লাহোর পর্যন্ত সীমিত ছিল। মুস্তাকী বলেন, "তিনি গৌড় থেকে রোহ এর সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করেন যার পাশে ছিল সরাইখানা এবং বাগান যেখানে তিনি ফলবান ও ছায়াদানকারী বৃক্ষরোপণ করেছিলেন।[৪] খিদির খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে শেরশাহ বাংলাকে তার বিশ্বস্ত আফগান প্রধানদের মধ্যে বিভক্ত করে দেন এবং কাজী ফজিলাতকে আমিন বা ট্রাস্টি নিযুক্ত করেন। আমিন বা আমিরের ক্ষমতা প্রসঙ্গে এবং বাংলায় জায়গির পাওয়া গোষ্ঠী প্রধানদের আলোচনার পূর্বে আমরা দেখি সেই প্রধানদের সংখ্যা কত ছিল যারা বাংলাকে "মুলুক আল তাওয়াইফ" বানিয়েছিলেন, স্বাধীন ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন এবং সমগ্র অঞ্চলটি তাদের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন।

বাংলাকে 'মুলুক আল তাওয়াইফ' বানানো জায়গিরদারদের সংখ্যা বা নাম কোনোটাই ইতিহাস লেখকেরা সরবরাহ করতে পারেননি। সারওয়ানী এবং আব্দ আল্লা বলেন 'অল্প কয়েক জনের মাধ্যমে' এবং নিমাত আল্লা বলেন, 'তিনি বাংলাকে তার অল্প কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর (উমারা) দের মধ্যে বিভক্ত করেন।' তাই আমরা 'উমারা'দের কোনো সঠিক সংখ্যা জানতে পারি নাই যাদের মধ্যে বাংলা রাজ্যকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাপঞ্জি রচয়িতারা শেরশাহের প্রশাসনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তার সাম্রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ 'সরকার' গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। আফগানদের নিকট থেকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর যেহেতু মোগল শাসনকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাজন যেমন আরশা, ইকলিম ও ইকতা লক্ষ্য করা যায় না, তাই এটা বুঝা যায় যে শেরশাহের সময় প্রশাসনের সর্ব বৃহৎ বিভাজন ছিল 'সরকার'। বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া বিশ্বস্ত সহচর (উমারা) দের সংখ্যা বিষয়ে ইতিহাস লেখকদের বক্তব্য হচ্ছে তাদের সংখ্যা 'অল্প কয়েকজন'।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে,বাংলাকে বিভক্ত করে দেওয়া জায়গিরদারদের এমন প্রচণ্ড ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা বিশেষত পূর্ববঙ্গের অনুপ্রবেশকারীদের কঠোর হস্তে দমন করতে পারে। আমরা যদি সারওয়ানী, নিমাত আল্লা, আবদ আল্লা ও রিজক আল্লা মুশতাকীর লেখাগুলো বিস্তারিতভাবে পাঠ করি তাহলে দেখতে পাই যে বিভিন্ন 'সরকার' এর দায়িত্ব পাওয়া কিছু লোক, যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার বাইরে অশান্ত এলাকা থেকে নেওয়া হয়েছিল। তারা তাঁদের সদস্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। আরো ভালো উপলব্ধির জন্য আমরা সারওয়ানীর নিম্নলিখিত দুটো উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন "আজম হুমায়ুন নামে পরিচিত আজম হায়াত খান নিয়াজিকে রোহতাস দুর্গের মধ্যে ৩০,০০০ অশ্বারোহীসহ নিয়োগ করা হয়েছিল এবং কাশ্মীর ও গাক্ষার অঞ্চলের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল...। হামিদ খান কাকার নগরকোট, জশওয়াল, দিখওয়াল ও জম্মুদ সহ অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল সমূহ এমন দৃঢ়ভাবে শাসন করেছিলেন যে তার বিরুদ্ধাচরণ করা কারোর সাহস ছিল না এবং তিনি জমি পরিমাপ করে পাহাড়িদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। সরহিন্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরকার জায়গির দেওয়া হয়েছিল মসনদ-ই-আলি খাওয়াশ খানকে; দিল্লির 'সরকার' এ মিয়া আহমেদ সরওয়ানীকে আমিন হিসেবে এবং আদিল খান ও হালিম খানকে যথাক্রমে শিকদার ও ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। বিদ্রোহ ও সমস্যা সৃষ্টিকারীতে পূর্ণ সাম্ভাল এর সরকার প্রধান হিসেবে নিযুক্তি পান শক্তি সামর্থ্যে সিংহ মসনদ-ই-আলী ঈসা খান যিনি সেই অঞ্চলের জমিদারদের দর্প এমনভাবে চূর্ণ করেছিলেন যে, তারা বিদ্রোহ করার সাহসও পায় নি। এমন কি যখন তাদের নিজেদের বনাঞ্চল ধ্বংস করতে বলা হয়েছিল তখনও। শহরের উপকণ্ঠের কৃষকেরা জমির মাপ অনুযায়ী রাজস্ব পরিশোধ করতো। কনৌজ এর শিকদার পারাক নিয়াজী বিদ্রোহী এবং ডাকাতদের এমনভাবে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল যে তারা তার আদেশের বিরুদ্ধে অবস্থানের সাহসও করেনি।

যেহেতু শেরশাহের নিকট জানা ছিল যে যমুনা এবং চাম্বাল নদীর তীরের কিছু অংশে জমিদারদের বিদ্রোহীদের হোতা বাস করেন, তিনি সরহিন্দ 'সরকার' এর নিকট থেকে ১২,০০০ অশ্বারোহী সেনাদল হাটকান্ট ও এর আশে পাশে পরগনায় মোতায়েন রেখেছিলেন। এই এলাকার জমিদার ও কৃষকদের তিনি এমন শাস্তি দিতেন যে অবাধ্যতা প্রদর্শনকারী একজনও জীবিত থাকত না।[৫] সারওয়ানী এরপর তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। বাংলা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বাংলাকে ছোটো ছোটো এস্টেটে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং কাজী ফজিলাত, যাকে পাপাচারী ও ভবঘুরেরা কাজী ফদিহাত নামে অভিহিত করতো, আমিন ও বাংলার ট্রাস্টি নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৬]

উপরে উল্লেখিত সারওয়ানীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই [৭]

ক) শেরশাহ খিদির খানের বিদ্রোহ ভনিতায় বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন এবং সমস্যা নিরসনে নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন।

খ) শেরশাহ কেবল বাংলাকেই 'মুলুক আল তাওয়াইফ' বা স্বাধীন রাজ্য তৈরি করেছিলেন

গ) এমন একজন গোষ্ঠী প্রধানদের নাম ও তিনি যোগান দেন নি যিনি শেরশাহ কর্তৃক সৃষ্ট

ঘ) তিনি তাদের সাফল্যেরও কোনো বর্ণনা দেন নি যেমনটা তিনি করেছেন এ ধরনের অন্যান্য নিযুক্তির ক্ষেত্রে এবং সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশের ক্ষেত্রে। কিন্তু কেন? এটা এই কারণে যে, হুসেন শাহী রাজত্বকালে সৃষ্ট বাংলার গোষ্ঠী প্রধানদের নিয়ন্ত্রণে শেরশাহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রধানেরা শেরশাহকে ক্ষমতা দখলকারী *(Usurp)* মনে করতেন। তার নিজের সৃষ্ট গোষ্ঠী প্রধান যারা বাংলার ও অন্যত্র তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়ানোকে উৎসাহ দিত, তাদের বিরুদ্ধেও তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে এই যে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলার বিদ্রোহ দমন ও তার নিজ কর্তৃত্ব সুসংহত করা পূর্ণতা লাভ করেনি। এর প্রমাণ হচ্ছে 'বারবাক আল দুনিয়া ওয়া আল দিন বিন হুমায়ন শাহ 'এর মুদ্রা এবং রাজা সুলায়মানের বিদ্রোহী কার্যকলাপ যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' বাংলাকে ১৯টি সরকার এ বিভক্ত দেখিয়েছেন কিন্তু ভট্টশালী ও কানুনগোর মতো ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন যে, বাংলাকে ১৯টি সরকার এ বিভক্তি প্রকৃতপক্ষে শেরশাহ করেছিলেন। আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে পুরাতন ব্যবস্থাকেই অনুকরণ করেছেন, কারণ আকবর ১৯টি সরকার দিয়েও পুরো বাংলাকে তার বশ্যতায় আনতে পারেননি। কিন্তু শেরশাহ কর্তৃক তখনও বশ্যতায় না আসা একটি দেশকে ১৯টি সরকার বা ১৯ জন গোষ্ঠী প্রধানদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। এটা সত্য যে, শেরশাহ বাংলায় প্রথম সরকার ব্যবস্থার প্রশাসন প্রবর্তন করেন। ভট্টশালী ও কানুনগোর বিবেচনা মতো শেরশাহের শাসনের শুরুতে বাংলাকে ১৯টি সরকার এ বিভক্ত করার তথ্যটি সঠিক নয় কারণ উক্ত সংখ্যাটি অর্জিত হয়েছিল তখনই যখন পুরো বাংলাকে বশ্যতায় এনে আফগান কর্তৃত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল। একই ভাবে বাংলাকে ১৯ জন গোষ্ঠী প্রধানের মধ্যে বিভক্ত করার কানুনগো ও ভট্টশালীর তথ্যটিও সঠিক নয়।

সরকার-এ-আলী বা সরকার প্রধানের সংখ্যা ১৯ এ উন্নীত হয়েছিল একটি ধারাবাহিক পদ্ধতিতে। এন.বি. রায়-এর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে "শেরশাহ এই রাজনৈতিক অসুস্থতাকে সারিয়ে তুলতে বাংলাকে তার অনুগতদের অধীনে কয়েকটি 'ফাইফ' (জায়গির) এ বিভক্ত করেন।"[৮] পি. শরণের মতানুসারে, "বাংলা রাজ্যের বাইরেও শেরশাহ কয়েকটি সরকার গঠন করে একটি অঞ্চল গড়ে তোলেন যাদের প্রধান ছিল এক একজন গোষ্ঠীপ্রধান যারা রাজনৈতিক সমমর্যাদা সম্পন্ন কিন্তু পরস্পর থেকে স্বাধীন।"[৯]

আমরা যদি 'মুলুক আল তাওয়াইফ' কে বিশ্লেষণ করি যার মাধ্যমে এটা নির্দেশিত করা হয় যে শেরশাহ ইচ্ছকৃতভাবেই উচ্চমর্যাদা দিয়ে প্রধানদের সৃষ্টি করেছিলেন যাতে কর্তৃত্বের দাবীদার অন্যদের দমন করা যায়, তাহলে পি. শরণের পর্যবেক্ষণটি সঠিক মনে হবে। কিন্তু যখন ইসলাম শাহ কাজী ফজিলাতকে সরিয়ে সকল সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা দিয়ে বাংলায় একজন শক্তিশালী গভর্নর নিযুক্ত করলেন, শেরশাহের মনোনীত গোষ্ঠী প্রধানরা তা মেনে নিয়েছিলেন। এটা একটা তুলনীয় বিষয়। বাংলার গভর্নর হিসেবে মুহম্মদ খান সুরের নিযুক্তি পি. শরণের যুক্তিকে সমর্থন করে না। সুতরাং এটা বলাই যুক্তিযুক্ত যে শেরশাহ বাংলার সরকার পদ্ধতির প্রশাসন প্রবর্তন করেছিলেন এবং সরকার-এ-আলী কে প্রতিটি সরকার জায়গির হিসেবে দিয়েছিলেন। তারা শেরশাহের শাসন কাঠামোয় এমন পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যেন বাংলার অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলায় আমিন নিয়োগ বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রশ্ন হলো তিনি কী একজন 'আমিন' না একজন 'আমির'? তার ক্ষমতা ও কাজ কী কী? সারওয়ানী ও নিমাত আল্লা উভয়েই মত দেন যে, শেরশাহ কাজী ফজিলাত কে 'আমিন-ই-বাঙ্গালা' নিযুক্ত করেছিলেন। এলিয়ট 'আমির' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি সারওয়ানীর বক্তব্যকে এভাবে অনুবাদ করেছেন, "এবং তিনি বাংলা রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং কাজী ফজিলাতকে, যিনি কাজী ফাজিহাত নামেই সমধিক পরিচিত, বাংলার ব্যবস্থাপক (আমির) নিযুক্ত করেন।"[১০] অন্য আরেক জায়গায় তিনি সারওয়ানীর বক্তব্য এভাবে অনুবাদ করেন, "তিনি বাংলা রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেন এবং কাজী ফজিলাতকে পুরো রাজ্যের 'আমির' নিযুক্ত করেন।"[১১] আমির বা আমিন নিয়োগের বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে পি. শরণ লিখেছেন, "উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এলিয়টের পাণ্ডুলিপিতে 'আমির' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, আমিন শব্দটি নয়। কিন্তু ভারত ও ইংল্যান্ডের সমস্ত পাণ্ডুলিপিতে আমি 'আমিন' শব্দটি পেয়েছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে 'তারিখ-ই শেরশাহী'র (OR1782) একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এলিয়টের কাছে আছে এবং যেটা তার মুন্সি নকল করেছিলেন, সেখানেও আমিন শব্দটি আছে, আমির শব্দটি নয়।[১২]

সুতরাং আমরা অনেকটা নিরাপদেই ধরে নিতে পারি যে, শেরশাহ বাংলায় আমিন নিযুক্ত করেছিলেন, আমির নয়। অধিকন্তু শেরশাহ আহমেদ খান সারওয়ানীকে দিল্লি থেকে রোহিলাখণ্ডের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত এবং মসনদে আলী ঈশা খানকে রোহিলাখণ্ডের থেকে জৌনপুরের অযোধ্যা পর্যন্ত অঞ্চলের আমিন নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে এ জন্য আমিন নিযুক্ত করা হয়েছিল যে এই এলাকার প্রধানবৃন্দ ও স্থানীয় কৃষকেরা শেরশাহের নিকট তাদের উপর নাজির খানের বিভিন্ন অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছিলেন। সারওয়ানীর ভাষ্য হচ্ছে, "যেহেতু এলাকাটি আইন শৃঙ্খলাহীন ছিল এবং বিদ্রোহী লোকজন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, শেরশাহ কুতুব খান নাইবকে নির্দেশ দেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ন্যায় বিষয়ক ব্যক্তি খুঁজে বের করতে যিনি এই বিদ্রোহীদের দমন করে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি করতে পারেন।"[১৩] সুতরাং উজানের এলাকার জন্য শেরশাহের এমন একজন আমিনের প্রয়োজন ছিল যিনি বিদ্রোহ দমন, আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট সাহসী হবেন।

শেরশাহ বাংলায় অনুপ্রবেশকারী উপাদানে পরিপূর্ণ দেখতে পেলেন। এদের মধ্যে রয়েছে অমাত্যবৃন্দ, রাজকুমারবৃন্দ এবং পরাজিত সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের অনুগত আফগানবৃন্দ যারা বাংলাকে নিজেদের নিরাপদ আশ্রয় বানিয়ে ফেলেছিল। পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে প্রতিবেশী শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রধানেরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে এদের সাথে যোগ দিয়েছিল। এমতাবস্থায়, শেরশাহ পরিপূর্ণভাবে এবং শক্তির সাথে তার কর্তৃত্ব আরোপ করলেন। প্রথমে তিনি তার অমাত্যদের সংযত করলেন এবং তারপর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা এলাকাগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিলেন।[১৪] লাগামহীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে একজন গভর্নর নিয়োগ ব্যর্থতায়

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পর্যবসিত হলো। বাংলাকে সমগ্র ভারত বর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোয় আনতে সেখানে একজন লৌহমানব প্রয়োজন ছিল। যেহেতু খিদির খান তাঁকে পিছন থেকে টানছিলেন, শের খান রাজ্য গভর্নর নিয়োগে পুরোনো পদ্ধতিকে পরিহার করলেন। তিনি মসনদে আলী ঈশা খানের মতো নয় বরং কাজী ফজিলাতের মতো একজন বিখ্যাত পণ্ডিত যিনি তার গুণাবলী, সততা এবং বিশ্বস্ততার জন্য পরিচিত, তাকেই বাংলার আমিন এর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন।[১৫] তিনি তার সাহস ও রাষ্ট্রনায়ক সুলভ গুণের জন্য খ্যাত ছিলেন না। কাজী যে বাংলায় কাজী ফজিহাত (ঝগড়াটে কাজী) নাম অর্জন করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে, শেরশাহ অমাত্যদের তার নিয়মকানুন মানতে সংযত করেছিলেন এবং কীভাবে তার নতুন ব্যবস্থা কাজ করছে তা দেখতে কাজীর নিকট প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি প্রশাসনের মূলদণ্ড নিজ হাতে রেখে নবসৃষ্ট গোষ্ঠি প্রধানদের পরিচালনার জন্য কাজীকে চাপিয়ে দেন। তাই শেরশাহের তত্ত্বাবধানে আমিন ছিলেন সরকার প্রধানদের উপরে উপাধিধারী প্রধান। এটা অনেকটা আধুনিক ভারতে রাজ্যসমূহের গভর্নরের মতো। তাই কানুনগো যথার্থই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে 'এই অফিসের কোনো সামরিক ক্ষমতা ছিল না এবং বড় ধরনের কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল না। একই মর্যাদার একাধিক কর্মকর্তার মধ্যে স্বাভাবিক কোনো বাদ বিসংবাদ পর্যবেক্ষণ ও মিটমাট করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিল না।'[১৬]

বাংলায় বহু গোষ্ঠী প্রধানদের উপর একজন আমিন এর নিযুক্তি প্রমাণ করে যে রাজ্য হিসেবে বাংলার অখণ্ডতা, একতা ও সুবিধার জন্য 'সরকার' পদ্ধতি তখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। এটা ঢিলেঢালাভাবে প্রতিপালন করা হতো। বাংলায় তার শাসনকে স্থায়ী রূপ দিতে এবং তার আইন কানুন প্রসারের লক্ষ্যে শেরশাহ আফগান গোষ্ঠী প্রধান ও অমাত্যদের প্রত্যেককে এক একটি সরকার জায়গির প্রদান করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক আফগান প্রধানকে তিনি এটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেন যে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যেমন ক্ষমতা ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তেমনি একই গুরুত্ব সহকারে তাদের দায়িত্বও কর্তব্য রয়েছে। দায়িত্বে সামান্য অবহেলা দেখার সাথে সাথে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অবাধ্যতা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দায়িত্বহীনতা ও অবিচার কখনোই সহ্য করা বা এড়িয়ে যাওয়া হয় নি। অসাধারণ শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল এবং ছোটো ছোটো বিষয়েও ব্যক্তিগত দৃষ্টির মাধ্যমে তিনি আফগান প্রধানদের অবনত থাকার মতো ভীত করে তুলেছিলেন এবং সকল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রকৃত একজন জায়গিরদের পরিণত করেছিলেন। আর এভাবেই তিনি সুলতানের প্রতি প্রধানদের আনুগত্যের একটা ঐতিহ্য তৈরি করেন যদিও তিনি নিজেই তাদের দলের মাত্র একজন সদস্য ছিলেন। 'সরকার' পরিচালনায় তার নীতি গ্রহণের ক্ষেত্র তিনি এভাবেই প্রস্তুত করেছিলেন।

জায়গির লাভ করায় আফগান প্রধানেরা নিজ নিজ এলাকায় উপজাতীয় ধারায় বসতি স্থাপন করেন। তারা জায়গিরকে তাদের প্রতি সুলতানের অনুগ্রহ না ভেবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেদেরই অধিকারী হিসেবে মনে করেন। শেরশাহ নিজেই উত্তরাধিকারী সূত্রে তার পিতার সাসারামের জায়গির ভোগ করেন। একইভাবে বাংলায় অন্যান্য আফগান প্রধানরাও উত্তরাধিকারী সূত্রের জায়গির ভোগ করতে থাকেন।

জায়গিরদারেরা তাদের প্রাপ্ত জায়গিরের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকেন। তাদের অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে তারাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। পিতার সহকারি হিসেবে শেরশাহ জমিদার, সৈন্য ও কৃষকদের সাথে নতুন সমঝোতা করেন। জায়গিরদারেরা তাদের প্রাপ্ত এলাকা নিজ সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারতেন যেমনটি শেরশাহের পিতা হাসান খান সূর তার জীবদ্দশায় নিজ সন্তানদের পৃথক পৃথক জায়গির প্রদান করেছিলেন। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং প্রয়োজনে সুলতানকে সহায়তার জন্য জায়গিরদাররা নিজস্ব সেনা রাখতে পারতেন। শেরশাহের পিতা হাসান খান সূর ৫০০ অশ্ব রেখেছিলেন। বড় বড় জায়গিরদাররা তাদের সামরিক কর্তৃত্ব কয়েকজন অধীনস্থ প্রধানের উপর জায়গিরসহ ন্যস্ত করতে পারতেন। আর এভাবে তাদের অনুগত সামরিক সহযোগী তৈরি করতেন। হাসান খান সূর ছিলেন জামাল খান লোদীর এ রকমই একজন জায়গিরদার যিনি ৫০০ ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

জায়গিরদারদের সৈন্য সংগৃহিত হতো নিজ গোত্রের লোকের মধ্যে থেকে। তারা তাদের ফিফ (fiefs) পরিশোধ করতো। নিজ গোত্রের বেতনভুক্ত লোক হওয়ায় সৈন্যরা স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠী প্রধান ও জায়গিরদারদের সাথে থাকতো। উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়ে আফগান প্রধানদের বিশাল প্রভাব ছিল। মোগলদের বিরুদ্ধে আফগান স্বার্থরক্ষার কাজে আগ্রহী ভূমিকা নিয়েই শেরশাহ আফগানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আফগান প্রধানদের এক সভায় তাকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। শেরশাহ তার জেষ্ঠ্যপুত্র আদিল শাহকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু শেরশাহের মৃত্যুর পর আফগান প্রধানেরা তার দ্বিতীয় পুত্রকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন।

বাংলায় 'সরকার' এর রাজনৈতিক প্রধান ছিল জায়গিরদাররা যারা একে অপরের সমান মর্যাদাসম্পন্ন, স্বশাসিত ও স্বাধীন ছিলেন। নির্বাহী ও রাজস্ব ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে শিকদার-ই-শিকদারান এবং মুন্সিফ-ই-মুন্সিফান এর হাতে। এই দুই জনের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে কাজী চূড়ান্ত রায় প্রদান করতেন।

আমরা তাই উপসংহার টানতে পারি যে শেরশাহ বাংলাকে মুলুক-আল-তাওয়াইফ রাজ্য বানিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের একটি কনফেডারেশনের রূপ দান করেছিলেন। তিনি বাংলাকে 'সরকার' নামক প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করেছিলেন এবং সেখানে এক নতুন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।[১৭] তিনি রাষ্ট্র কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন এই স্বীকৃতি দিয়ে যে শাসকের উদ্বেগের বিষয় শুধু নীতি নির্ধারণ এবং রাজস্ব সংগ্রহে সীমিত নয় বরং সবার উপরে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে জনসেবা করা এবং তাদের উন্নতি/সমৃদ্ধির জন্য আরো উপায় উদ্ভাবন করা।

আমাদের দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর তাই শেরশাহ বাংলায় প্রবেশ করেন ১৫৪১ সালে শাহ আলম হিসেবে কিন্তু উত্তর ভারতে তার রাজধানীতে ফিরে যান 'আল খলিফা আমির আল মুমিনিন' (খলিফা এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিশ্বাসীদের দলনেতা) এবং খলিফাতুজ্জামান (বিশ্বাসীদের নেতা) হয়ে যেমনটি তার মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়।[১৮]

সুতরাং শেরশাহ বাংলায় একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু বা প্রবর্তন করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল বাংলায় আফগান শাসনকে নির্বিঘ্নে পরিচালিত করা। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমনটা আমরা আগে দেখেছি, তিনি বিশৃঙ্খল অবস্থা এড়াতে স্থানীয় উদ্যোগ চেয়েছিলেন। তিনি এমন মানুষকে 'আমিন' নিয়োগ দিয়ে সন্তুষ্ট হলেন যার প্রতি তার ছিল অগাধ আস্থা। বাংলায় কাজী ফজিলাত ছিলেন তেমনি এক ব্যক্তি। ক্রমশ ক্ষমতা সুসংহত করার পাশাপাশি বাংলায় শেরশাহের প্রশাসনিক দৃঢ়তা আরো মজবুত হয়। তাই ১৫৪১ সালে শেরশাহ বাংলার প্রশাসনকে সুসংগঠিত করেছিলেন যার এক বৃহৎ অংশই ছিল ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির উপর নির্ভরশীল যেমনটা আমরা সারওয়ানীর নীচের উদ্ধৃতিতে দেখতে পাই "প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় এবং রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নীতিকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল যে প্রত্যেক পরগনায় হিন্দিতে এবং ফার্সিতে লেখার জন্য একজন শিকদার, একজন আমিন, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং একজন ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হয়েছিল। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা প্রতি বছর চাষাবাদী জমি পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করবে যাতে 'মুকাদ্দাম' এবং 'উম্মাল'রা অসহায় কৃষকদের নির্যাতন না করে। কারণ কৃষকেরাই সমৃদ্ধির মেরুদণ্ড। উল্লেখ্য, শেরশাহের সময়ের আগে বাৎসরিক ভিত্তিতে জমি পরিমাপের বিধান ছিল না।

রাজ্যের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পরগনায় একজন করে কানুনগো ছিল। পরগনা এবং তার জনগণের দেখাশোনা করা, জনগণকে ভয়ভীতি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা এবং রাজস্ব আত্মসাৎ থেকে পরগনাকে রক্ষাকল্পে প্রত্যেক সরকার এ একজন প্রধান শিকদার এবং একজন প্রধান মুন্সিফ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের পরগনার সীমানার মধ্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তারা তার সমাধান করবেন যাতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোনো ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। কোনো ব্যক্তি অবাধ্য বা বিদ্রোহী হয়ে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে সেটা নিবৃত করবে অথবা এমন ভাবে শাস্তি প্রদান করে নিধন করবে যাতে তাদের ঐ অবাধ্যতা বা বিদ্রোহী মনোভাব অন্যদের মধ্যে বিস্তার না করে।"[১৯]

এবার আমরা শেরশাহের 'সরকার' প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করব। সুলতান সিকান্দার লোদীর সময়ে 'সরকার' হয় একজন ফৌজদারের অধীনে না হয় সামরিক দায়িত্ব হিসেবে অথবা রাজবংশের কোনো রাজকুমারের অধীনে অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল। সারওয়ানীর উপরোক্ত তথ্য সূত্র মতে শেরশাহ প্রধান শিকদার এবং

আমাদের দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রধান মুন্সিফ হিসেবে আরো দুজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আর প্রত্যেক 'সরকার' এর উপর একজন কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং 'সরকার' হচ্ছে বিরাট একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক যা কয়েকটি পরগনা নিয়ে সৃষ্ট।[২০] শেরশাহ প্রত্যেক সরকারের উপর একজন করে শিকদার ই শিকদারান, মুন্সিফ ই মুন্সিফান এবং কাজী নিযুক্ত করেন। শিকদার ই শিকদারান হচ্ছে সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। কিন্তু যেহেতু ইসলামে বিচারক কে নির্বাহী কর্মকর্তার উপরে অবস্থান দেওয়া আছে তাই কাজী প্রধান শিকদারের কর্তৃত্বের আওতা বহির্ভুত ছিলেন এবং প্রধান শিকদারের দায়িত্ব হচ্ছে কাজীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। সুলতানের বিধি বিধানসমূহ কাজী ঘোষণা দেন। প্রধান শিকদার রাজকীয় আদেশ বলবৎ করেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। তিনি সাধারণত উচ্চ সামরিক পদমর্যাদার ব্যক্তি। তার কর্তৃত্বাধীনে একদল সৈন্য থাকে যারা মূলত সরকার এ পুলিশের দায়িত্ব পালন করে এবং 'মহল' থেকে রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতা করে। আইন শৃঙ্খলার পরিপন্থি অপরাধমূলক বিষয়গুলোও তিনি বিচার করেন। তার অধীনস্থ কর্মচারীদের কাজ কর্মও তিনি তদারক করেন।

বাংলার প্রধান শিকদারদের[২১] অধীনে কোনো নিয়মিত বাহিনী ছিল না। তারা ছিল 'আমিন-ই-বাংলা'[২২] এর অধীনে যিনি কোনো সামরিক কমাণ্ডার ছিলেন না বরং ব্যাপক অর্থে একজন কাজী ছিলেন।

বাৎসরিক ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল রাজকীয় বাহিনীর ফাঁড়ি বা থানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় প্রশাসন কার্যক্রমে শেরশাহের নিয়ন্ত্রণ আরো সুসংহত ও সম্প্রসারিত হয়। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গৌড় কে বাংলার রাজধানী হিসেবে পরিত্যাগ করেননি বরং কাজী ফজিলাতকে সেখানে তার বেসামরিক ভাইসরয় হিসেবে রেখে যান প্রাদেশিক প্রশাসনকে সুন্দরভাবে চালানো এবং জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে। কিন্তু কোনোভাবেই সমমর্যাদার গোষ্ঠী প্রধানদের দ্বন্দ্বের সমাধানে সামষ্টিক স্বৈরাচরের ভূমিকা পালনে তাকে নির্দেশনা দেন নি। আর তাই কানুনগোর মতে "বাংলার ক্রমাগত বিদ্রোহের অশুভ শক্তির ভিত্তিমূলে শেরশাহ আঘাত করেছিলেন।"[২৩]

প্রধান শিকদারের পর মুন্সিফ ই মুন্সিফান ছিলেন মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থানে। তিনি রাজস্ব প্রশাসন তত্ত্বাবধান করতেন এবং তার অধীনস্থ এলাকার পরগনাসমূহের রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান করতেন। মুন্সিফ এর অসামরিক অর্থ বিচারক এবং মুন্সিফই মুন্সিফান সাধারণ মামলার ক্ষেত্রে সরকার এ একজন প্রধান বিচারক। তিনি রাজস্ব আদায় ও নিরূপণ সংশ্লিষ্ট মামলা সমূহের বিচার করতেন। তিনি রাজস্ব কর্মচারীদের ত্রুটি সমূহ থেকে 'রায়ত'দের মুক্ত ও রক্ষা করতেন।

পরগনা হচ্ছে সরকারের পরে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক এবং একগুচ্ছ গ্রাম নিয়ে গঠিত। এটা সরকার ও পরগনার মধ্যে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর এবং এই দুই স্তরের মধ্যে আর কোনো প্রশাসনিক একক ছিল না। এটা মূলত রাজস্ব প্রশাসনের একক যার প্রাথমিক বিষয় হচ্ছে জমির পরিমাপ, মূল্যায়ন ও রাজস্ব আহরণ। শেরশাহের সময়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরগনার সরকারি কর্মচারী ছিল একজন আমিল, একজন শিকদার, একজন ফতেহদার (কোষাধ্যক্ষ) এবং দুইজন কেরানী যার একজন কাগজ-ই-খাম অর্থাৎ খসড়া করতেন এবং অন্যজন ফার্সি ভাষায় তার দ্বিনকল করতেন।

শিকদার ছিলেন পরগনার প্রধান সরকারি কর্মচারী। তিনি এলাকার একজন নির্বাহী, সামরিক ও পুলিশ অফিসার। তিনি রাজকীয় নির্দেশনা (ফরমান) বলবৎ করতেন, শান্তি রক্ষা করতেন এবং অবাধ্য প্রজা বা জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহে রাজস্ব কর্মচারীদের সহায়তা করতেন।

'আমিল' পরিভাষাটি বর্ণী[২৪] কর্তৃক মুতাসাররিফ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্বাসীয় যুগে শব্দটির প্রচলন ছিল। কোরেশীর মতে[২৫] শেরশাহের অধীনে আমিল বা মুতাসাররিফ শিকদার হিসেবে পরিচিত ছিল। তিনি পরগনার প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতেন এবং রাজস্ব নির্বাহী উভয় কার্য নিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন।[২৬]

আমিন: কোরেশী বলেন, 'আমিন, মুশরিফ এবং মুন্সিফ সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রচলিত ছিল। শেরশাহের অধীন মুশরিফকে আমিন অথবা মুন্সিফ বলা হতো।[২৭] সেই মতে আমিন পরগনার রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান ছিলেন। তিনি জমির পরিমাপ, রাজস্ব মূল্যায়ন ও সংগ্রহের জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি রাজস্ব কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করতেন। মুন্সিফ নামটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে আমিন ছিলেন পরগনার সাধারণ এবং রাজস্ব বিষয়ক বিচারক। তিনি সত্যিকার অর্থে শিকদারের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন না যদিও তিনি কখনো কখনো অবাধ্য জমিদার ও কৃষকের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ে শিকদারের সামরিক বা পুলিশি সহায়তা নিতেন।

সারওয়ানীর মতে[২৮] সরকার এবং পরগনার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সুলতান সরাসরি নিয়োগ দিতেন এবং তাদেরকে ২/৩ বছর পরপর বদলী করা হতো। কিন্তু কানুনগো এই মত পোষণ করেন যে শিকদার, আমিন, কোষাধ্যক্ষ এবং পরগনার সংস্থাপন লেখকদের নিয়োগ সম্ভবত প্রধান শিকদারের নিকট ন্যস্ত ছিল।[২৯] কিন্তু শেরশাহকে পরগনার কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে দেখা গেছে ;এটাই সম্ভব যে তাদের নিয়োগ কেন্দ্রীয় ভাবেও হতো।

ফতাহদার, খাজাঞ্চি বা খাজানাদার ফতাহ অর্থ হাতব্যাগ এবং ফতাহদার বলতে বোঝায় কোষাধ্যক্ষ যা খাজাঞ্চি বা খাজানাদারের সমার্থক শব্দ। ফতাহদার হচ্ছেন পরগনার কোষাধ্যক্ষ এবং তিনি হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি রাজস্ব হিসেবে আদায়কৃত অর্থের নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করতেন।

কারকুনস: রহিমের ভাষ্যমতে কারকুন হচ্ছে লেখক, একজন বাংলা/হিন্দিতে এবং অন্যজন ফার্সি ভাষায়। তাদের দায়িত্ব ছিল তাদের এলাকায় কর্মকর্তাদের আচরণ ও জনগণের অবস্থাসহ সব বিষয়ের বিবরণী প্রস্তুত করে সুলতানকে অবহিত করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোরেশী বলেন, "কারকুনরা রাজ্য ও কৃষকদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে বই লিখতেন অর্থাৎ হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন।"[৩০]

কানুনগোঃ আক্ষরিক অর্থে কানুনগো হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যাদাতা কিন্তু বাস্তবে তারা ছিলেন রেকর্ড কিপার। বাংলায় কানুনগোর কার্যক্রম চালু করেন শেরশাহ যখন সরকারিভাবে জমি পরিমাপের কাজ এবং খাজনা/রাজস্ব পরিশোধের তালিকা প্রস্তুত করা হতো। নামের অর্থানুসারে কানুনগো ছিলেন এলাকার রাজস্ব বিধি বিধানের তথ্যাগার। তাকে রাজস্ব বিধিবিধান এবং স্থানীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হতো যেন তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরগনার রাজস্ব প্রশাসন সুন্দরভাবে চালাতে কাজে লাগাতে পারে এবং একই সাথে রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।[৩১] আবুল-ফজলের মতে কানুনগো হচ্ছে কৃষিজীবিদের আশ্রয়স্থল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কানুনগো সরকারের নিকট কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং তাদের স্বার্থ দেখাশোনা করতেন। তিনি আধাসরকারি উত্তরাধিকারী কর্মকর্তা যিনি পরগনার লোকদের মধ্যে থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। তিনি সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারী। কানুনগোর অবস্থান এবং কর্তব্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন "প্রত্যেক জেলায় (পরগনায়) একজন করে (কানুনগো) আছেন। বর্তমানে কানুনগোর অংশ (উৎপাদিত পণ্যের ১ শতাংশ) প্রদান করা হয় এবং তিন শ্রেণির লোককে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয়ভাবে বেতন দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণির বেতন ৫০ রূপি, ২য় শ্রেণির বেতন ৩০ রূপি এবং ৩য় শ্রেণির বেতন ২০ রূপি। তাদের একই পরিমাণ ব্যক্তিগত সহায়তাও আছে।"[৩২] কানুনগো বলেন, "মোগল শাসন কালে স্থানীয় চৌধুরী এবং কানুনগোর স্বাক্ষর ছাড়া সুবাহদারের নিকট স্বাক্ষর অনুমোদনের জন্য কোনো রাজস্ব দলিল উপস্থাপন করা যেত না।[৩৩] চৌধুরী ছিলেন বংশানুক্রমিক কর্মকর্তা।[৩৪] তারা ছিলেন একটি সংঘের প্রধান যিনি ঐ শহরের কোনো সংঘের কোনো সদস্য অপরাধ করলে তার জন্য দায়ী থাকতেন। গ্রামাঞ্চলে চৌধুরীরা সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করতেন। জনগণ যেভাবে চৌধুরী শব্দটি নামের শেষে যোগ করতেন তাতে মনে হয় যদিও পদটি বেতনভুক্ত নয় তবুও তা গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ও সম্মান বহন করে। আর তাই চৌধুরী হচ্ছে আধা সরকারি স্থানীয় কর্মকর্তা যিনি জমির পরিমাপে 'রায়ত'কে প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা তাকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হতো।[৩৫]

পাটোয়ারীঃ বর্ণির তথ্যানুসারে পাটোয়ারী ছিলেন গ্রামীণ হিসাব রক্ষক যিনি রাজস্ব সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ করতেন।[৩৬] বাংলায় শেরশাহ এই অফিসের প্রবর্তন করেন।[৩৭] বাংলায় বিশেষত পূর্ববঙ্গে মুসলিম পাটোয়ারী পরিবারের বিশেষ অস্তিত্ব থেকে গ্রামাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে পাটোয়ারীর অবস্থান প্রমাণিত হয়।[৩৮]

বাংলায় 'মুকাদ্দাম' হয়ে গেছেন মণ্ডল এবং 'মুদাব্বির' হয়ে গেছে মাতব্বর। তারা বাংলায় গ্রামে উপাধিধারী প্রধান। তারা গ্রাম্য প্রধানদের মধ্য থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত আধা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরকারি গ্রামীণ কর্মকর্তা। তারা গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পরগনা কর্মকর্তাদের সহায়তা করতেন।

রাজস্ব সংশ্লিষ্ট আর একটি কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মহল্লা নবীশ। কানুনগোর মতে এই অফিসটি বাঙালিত্ব দেওয়া হয়েছে মহলানবীশ নামে।[৩৯] তিনি আরো বলেন যে মহলানবীশ ছিল সামরিক বিভাগের একজন কেরানী যার কাজ ছিল হুলিয়া বা সৈন্যদের দৈনন্দিন বিবরণী লিপিবদ্ধ করা।

বারিদ:[৪০] তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকেরা দিল্লির সুলতানদের তথ্য সেবা বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তথ্য আদান প্রদান ছিল দুই ধরনের এক, ঘোড়ার মাধ্যমে এবং দুই ডাক হরকরার মাধ্যমে। সুলতানেরা সমগ্র রাজ্য জুড়েই বারিদ (সংবাদ লেখক) নিয়োগ দিয়েছিলেন যারা উপরোক্ত দুটি মাধ্যমে সুলতানদের তথ্য যোগান দিতেন। তারা রাজ্যে আগত বিদেশিদের সম্পর্কে বা বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে, এমন কি বাজারে গল্প গুজব এবং জনগণের অনুভূতি সম্পর্কেও জানাতেন। সকল সাম্রাজ্যেই দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের বিষয়টি দক্ষতার বিভিন্ন মাত্রায় সম্পন্ন করা হতো। সূর আফগানেরা ডাক ব্যবস্থার সেবাকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন।[৪১]

গোয়েন্দা: বারিদ পদটির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এজেন্ট ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার যারা কেন্দ্রীয় সরকারকে সব বিষয়ে সংবাদ যোগান দিতেন।[৪২] এই ব্যবস্থার একটা অতি প্রশংসনীয় দিক ছিল এই যে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানতেন যে তাদের কার্যক্রমসমূহ সুলতান ও তার মন্ত্রীদের নিকট লুকায়িত নেই। ব্যাপক অর্থে সংবাদ লেখকদের দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল বারিদ যারা আধুনিক সংবাদ প্রেরকদের সঙ্গে তুলনীয় এবং নিয়মিত চিঠি প্রেরণ করতেন এবং বিশেষ প্রতিনিধি বা গোয়েন্দা যাদের বিশেষ বিশেষ মিশনে প্রেরণ করা হতো। কানুনগোর মতে, 'বাংলায় আফগান শাসনকালে রাজস্ব আদায় ও মূল্যায়নের জন্য একটি পরগনাকে কয়েকটি 'দেহী' এবং একটি 'দেহী' কে মৌজায়[৪৩] বিভক্ত করা হয়েছিল।

রাস্তার দূরত্ব এবং বিভিন্ন সমস্যা সব সময়ই দিল্লি ও বাংলার শাসকেরা অনুভব করতেন। রাস্তার প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা একদিকে যেমন বাংলার শক্তিশালী গভর্নরদের বিদ্রোহে উৎসাহ যোগাত অন্যদিকে যখন কোনো বিদেশি শক্তি দেশটি দখলের চেষ্টা করতেন তখন স্থানীয় শাসকদের জন্য এটা আত্মরক্ষার একটা বড় অস্ত্র হয়ে উঠত। অসংখ্যা নদী নালার কারণে বাংলার একটা ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। সেই কারণে কোনো অভিযানের সময় দিল্লির শাসকদের দ্বারা নির্মিত রাস্তাসমূহ শান্তিকালীন সময়ে তেমন যত্ন নেওয়া হতো না। প্রবল বৃষ্টি এবং বন্যা প্রায়ই রাস্তাঘাট ভাসিয়ে নিয়ে যেত। ব্যবহারযোগ্য যে পথগুলো থাকত তাও চোর ডাকাতদের ভয়ে লোকেরা ব্যবহার করত না। শেরশাহ বাংলাকে উজানের ভারতবর্ষের সাথে সংযুক্ত করেন সোনারগাঁও হতে গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোডের মাধ্যমে এবং রাল্টারকে চট্টগ্রাম হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিল্লি হয়ে এটক পর্যন্ত। কানুনগো লিখেছেন "শেরশাহের গ্রাণ্ড ট্র্যাংক রোডের পূর্ব দিকের শেষ সীমানা ছিল সোনারগাঁ। সোনারগাঁ থেকে এটা উত্তরদিকে আধুনিক নারায়ণগঞ্জের পাশ দিয়ে চলে যায়, তারপর ঢাকার সোজা উত্তর দিকে এবং ঢাকা থেকে ভাওয়াল জমিদারী হয়ে ময়মনসিংহের শেরপুর আতিয়ায় চলে যায়। শেরপুর-আতিয়া থেকে রাস্তাটি পাবনা জেলার যমুনা নদীর তীর বরাবর সোজা পশ্চিমে শাহজাদপুরের দিকে যায়। সেখান থেকে যমুনা পার হয়ে পশ্চিম তীর বরাবর সোজা উত্তরে বগুড়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব থেকে ৩০ মাইল দূরে শেরপুর মুর্ছা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শেরপুর মূর্ছা থেকে রাস্তাটি রাজশাহী জেলার মধ্য দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে গৌড় পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আগমহলের (রাঁজমহলে) বিপরীতে সোজা দক্ষিণ দিকে গঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে রাস্তাটি অন্য রাস্তার পাশ দিয়ে বিহারের গরহী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মেঘনা নদীর অপর দিকে চট্টগ্রামের সুদূর চকরিয়া পর্যন্ত মাতামুহুরীর দিকে রাস্তাটি চলে যায়।"[৪৪] মহানন্দা নদীর পূর্ব দিকে শেরপুর-মূর্ছা থেকে তাজপুর-পুর্ণিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি শেরশাহ সংস্কার করেন। এই রাস্তাটি দ্বারভাঙ্গা এবং গোরখপুরের মধ্য দিয়ে বাংলাকে অযোধ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করে। রাস্তাটির নিরাপত্তার জন্য শেরশাহ প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দাদের স্ব স্ব এলাকায় পুলিশের দায়িত্ব পালনের জন্য সমন্বিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। রাস্তাগুলোর নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় জমিদার ও গ্রাম প্রধানদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৪৫]

সরাইখানা: শেরশাহ সরাইখানা তৈরির মহানায়ক ছিলেন। তার গ্রাণ্ড ট্র্যাংক রোডের প্রত্যেক 'করোহে' তিনি একটি করে সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্যেক সরাইখানায় একটি মসজিদ, একটি কূপ এবং মুসলিম ও হিন্দুদের জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা ছিল। পর্যটকদের গরম পানি এবং শোবার ব্যবস্থা ও তাদের ঘোড়ার জন্য শুকনা খাবার যোগান দেওয়া হতো। প্রত্যেক সরাইখানায় দুইজন অশ্বারোহী এবং কিছু খানসামা নিয়োজিত থাকতো। শেরশাহের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত এক সরাইখানা থেকে অন্য সরাইখানায় তারা দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করত।

পূর্ববর্তী সুলতানদের দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত চিকিৎসা সাহায্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি শেরশাহ কোনো অবহেলা প্রদর্শন করেননি। আগের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল সমূহ তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেক সরাইখানায় সেবাসমূহ সম্প্রসারিত করেছেন। কোরেশী বলেন, "শেরশাহের সংস্কারগুলোর অধিকাংশই তার ইতিহাস পাঠ এবং পুরাতন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তিনি প্রত্যেক সরাইখানায় একজন আবাসিক চিকিৎসক নিয়োগ করেছিলেন যা তার স্বাস্থ্য সেবা খাতের ব্যাপক সহায়তার পরিচয় বহন করে।"[৪৭] হাসপাতাল কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, সার্জন এবং নার্স যারা অসুস্থদের সেবা করতেন; ওষুধ, খাবার এবং পানীয় সরবরাহ করা হতো। চক্ষু বিশেষজ্ঞও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪৮] কানুনগোর মতে, 'পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বসবাসকারী লোকদের দস্যুবৃত্তির কাজে বাংলায় বেশ কুখ্যাতি ছিল।'[৪৯]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নদী ডাকাতদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য শেরশাহ যুদ্ধ জাহাজ সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন যারা নদীর পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন। ডাকাত অধ্যুষিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তিনি সামরিক চেকপোস্ট বা থানা গড়ে তুলেছিলেন।[৫০] মৃত সুলতান মহম্মদ শাহের নিকট থেকে দখল করা নৌযান শেরশাহকে তাৎক্ষণিক নৌবহর গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। অধিকন্তু বাংলার নদীতে নৌযানের যেহেতু কোনো অভাব ছিল না তাই নৌবহর গড়ে তোলা কোনো সমস্যা ছিল না।

শেরশাহ তার যুদ্ধ জাহাজগুলোকে বন্দুক ও তার সময়ে প্রাপ্য ব্যবর্তনবলয় (swivels) দিয়ে কার্যকরভাবে সাজিয়েছিলেন এবং বাংলার নদী পথে দস্যুবৃত্তি নিবৃত্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার সময়ে পর্তুগিজদের দস্যুতা এবং বিকশিত ব্যবসা বাণিজ্যকেও প্রতিহত করেছিলেন। পর্তুগিজদের নীরবতা এবং চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বন্দর সমূহে পর্তুগিজ নৌবহরের অনুপস্থিতি বাংলার জলসীমায় শেরশাহের সাফল্যেরই মূর্তমান প্রত্যয়ন। কানুনগো বলেন, "বাংলার রাজকীয় নৌবহর অন্যান্য রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের মতই রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো।"[৫১] বাবুরের পর্যক্ষেণ হচ্ছে, বাংলার আরেকটি প্রথা হলো প্রাচীন কাল থেকেই পরগনাগুলোকে কোষাগারের ব্যয় বহন করতে হতো, আর এই ব্যয় বহনের জন্য অন্য কোনো স্থানে কর আরোপ করা হতো না।[৫২] স্থানীয় মাঝির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শেরশাহ এই নতুন কাজে আফগানদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি রাজকীয় নৌবহরে আফগানদের মাষ্টার (সারহাংস, আধুনিক ভাষায় সারেং) এবং কমান্ডার (সরদার) হিসেবে নিয়োগ দেন। 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' অনুসারে এই সারহংস এবং সরদাররা ছিলেন শেরশাহ কর্তৃক নিযুক্ত আফগান।[৫৩]

সারওয়ানীর মতে সীমান্ত অতিক্রমের সময় বাংলা থেকে আগত পণ্যসমূহকে গরহী গিরিপথে একবার মাত্র শুল্ক আদায় করতে হতো।[৫৪] কিন্তু তিনি বাংলার নৌবন্দর সমূহে সমুদ্র বাণিজ্যের উপর আবগারি শুল্ক বিষয়ে কোনো কিছু বলেন নি।[৫৫] শেরশাহ সড়ক ও নৌপথে মালামাল ও জনগণের চলাচল নিরাপদ করেছিলেন। জমিদার ও জায়গিরদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা সমূহের মধ্যে চলাচলকারী পণ্যের উপর যেন কোনো শুল্ক আদায় করা না হয় সেটাও নিয়মিতকরণ করেছিলেন। এভাবেই শেরশাহ সরকার ও পরগনা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাকে তার দিল্লি সাম্রাজ্যের সাথে অখণ্ডতায় আবদ্ধ করেছিলেন। সারা দেশব্যাপী পণ্য সরবরাহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যকে গতিশীল করেছিলেন এবং জনগণকে রাজনৈতিক ঐক্য প্রদান করেছিলেন। তিনি শুল্ক ব্যবস্থার ও সরলীকরণ করেছিলেন।

শেরশাহের সময়ে বাংলার সীমানাকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায় বাংলার পশ্চিম সীমান্ত শুরু হয় গরহী গিরিপথের পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পর্বতমালা এবং ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়ে; দক্ষিণ দিকে বীরভূম এবং আকবরের শাসনকালে শেরগড় পরগনা নামে পরিচিত শেখরভূম পর্যন্ত। উত্তর সীমান্ত বিস্তৃত ছিল পূর্ব দিকের কুশি নদীর উজান থেকে (বর্তমান জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি জেলা ব্যতীত) কুচবিহারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সীমান্ত পর্যন্ত। এখান থেকে সীমানা চলে যায় সোজা দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত। সিলেট, ত্রিপুরার পর্বতমালা, লুসাই রেঞ্জের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দক্ষিণপূর্ব সীমান্ত ছিল চট্টগ্রামের মাতামুহুরী নদী পর্যন্ত। দক্ষিণে এই সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিলো মেদিনীপুর জেলার হিজলী ও চন্দ্রকোনা।

ইসলাম শাহ তার পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত সরকার ও পরগনা ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বহাল রাখেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তার পিতার নীতি থেকে সরে এসে প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে নিজস্ব ধ্যান ধারণা এর সঙ্গে যুক্ত করেন।[৫৬] সরকারের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক দিয়ে শাসন করার ধারণাটা ছিল শেরশাহের। অপর পক্ষে ইসলাম শাহ মনে করতেন যে প্রদেশ এর মতো বড় একক দক্ষ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের জন্য অধিকতর ফলদায়ক। তাই তিনি প্রাদেশিক প্রশাসনের সূচনা করেছিলেন। শেরশাহ বাংলাকে সরকার এ বিভক্ত করেছিলেন এবং সমমর্যাদা দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সরকার প্রধান নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইসলাম শাহ তার বাবার ব্যবস্থাকে উল্টে দিয়েছিলেন এবং মুহম্মদ খান সূরকে বাংলার হাকিম (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। তিনি প্রদেশের যাবতীয় কর্ম ও অপকর্মের জন্য দায়ী ছিলেন যেমনটি ছিলেন না কাজী ফজিলাত।[৫৭] শিকদার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের আরো দায়িত্বশীল করার মধ্য দিয়ে ইসলাম শাহ পরগনা প্রশাসনকে দক্ষ করে তুলেছিলেন।[৫৮] শেরশাহের শাসন কালে গ্রাম্য প্রধান ও 'মুকাদ্দাম' কে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার এবং দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার একক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। 'মুকাদ্দাম' এর কাজে ব্যর্থ হলে শিকদার হস্তক্ষেপ করতেন এবং তাকে তিরস্কার করতেন। কিন্তু ইসলাম শাহ শিকদারকে পরগনার অপরাধের জন্য একক ভাবে দায়ী করেন। চুরি অথবা ডাকাতির জন্য তাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।[৫৯] ইসলাম শাহ কানুনগোকে আরো দায়িত্বশীল করে তোলেন। 'খুলাসাত আত তাওয়ারিখ'[৬০] এর সূত্রানুসারে তিনি কানুনগোকে রায়তদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন দেওয়া, জমি চাষ এবং ফসলের অবস্থা এবং তার এলাকাধীন অপরাধ ও অন্যান্য অপকর্মের প্রতিরোধের জন্য নিয়োগ দেন।

ইসলাম শাহ তার রাজ্যের সকল সরকারের প্রতি 'হুকুমনামা' জারি করেন। ৮০ পৃষ্ঠার এই হুমুকনামায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাধারণ প্রশাসনের মতো সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা ছিল।[৬১] এই হুকুমনামা সৈনিক, সাধারণ প্রজা, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। হুকুমনামাটি জনগণের সাথে কর্মকর্তাদের আচরণের একটি ব্যবহারিক দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কর্মকর্তারা এটা স্থানীয় সভায় পাঠ করতেন এবং এভাবে সেটি ব্যাপক স্থানীয় প্রচারণা লাভ করতো। কাজেই হুকুমনামাটি রাষ্ট্র ও জনগণের সাথে কর্মকর্তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। বাদাউনির মতে সরকার প্রধানেরা হুকুমনামাটি শুক্রবারে গ্রহণ করতেন। তারা নিজ নিজ সরকার এ ৮টি খুঁটি দিয়ে একটি তাঁবু গড়তেন এবং সিংহাসনের সামনে ইসলাম শাহের জুতা জোড়া তুনির মধ্যে একত্রে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাখতেন।[৬২] সদর, মুন্সিফ এবং আমিন অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে পদমর্যাদা অনুসারে একে একে তাঁবুতে প্রবেশ করতেন এবং কুর্নিশ করে তাদের আসন গ্রহণ করতেন। তারপর দবির (সচিব) আসতেন এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে হুকুমনামা পড়ে শোনাতেন। কেউ যদি এগুলোর বিরোধিতা করতো, দবির তার বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট অভিযোগ দিতেন এবং তাকে তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনসহ শাস্তি প্রদান করা হতো। এতে প্রমাণিত হয় কর্মকর্তা ও প্রধানদের উপর ইসলাম শাহের আচরণ কতটা শক্ত ছিল যে কর্মকর্তা ও প্রধানেরা তাকে মান্য করে চলতে শিখেছিলেন।

ইসলাম শাহ তার পিতার কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নত করেছিলেন। শেরশাহ দুই ক্রোশ (২ মাইল) দূরে দূরে সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য ইসলাম শাহ প্রতি দুই সরাইয়ের মধ্যে আর একটি করে সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পর্যটকের জন্য এতে প্রয়োজনীয় সব সুবিধার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক সরাইখানা থাকার জায়গা, কূপ ও রান্না করার ব্যবস্থা এবং রান্না করা ছাড়া খাবার ঘর ছিল। প্রত্যেক সরাইখানার সাথে একটি করে মসজিদ সংযুক্ত ছিল এবং মসজিদে একজন ইমাম, একজন মুয়াজ্জিন ও একজন খাদেম নিযুক্ত ছিল।[৬৩] রাজকীয় তাঁবুর পরিবর্তে প্রত্যেক সরাইখানা থেকে দরিদ্রদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা ইসলাম শাহ করেছিলেন। তার পিতার সময় রাজকীয় কোষাগার থেকে এ সাহায্যের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তিনি বুদ্ধিমান পর্যটক এবং দরিদ্রদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যবস্থা সরাইখানায় রেখেছিলেন।

ইসলাম শাহ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও শিক্ষা ফাউন্ডেশনের জন্য অনুদান এবং তার বাবার সময়ের বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ বজায় রেখেছিলেন। তিনি একজন ভালো কবি ছিলেন এবং অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখেছিলেন যা পণ্ডিতদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। কবি এবং পণ্ডিতব্যক্তিবর্গ তার সবসময়ের সহচর ছিল এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় তার বিরাট আগ্রহও ছিল। তার বাসার নিকটেই তিনি কবি ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য সুন্দর প্যাভিলিয়ন তৈরি করেছিলেন যেখানে তারা একত্রিত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন, বিতর্ক করতেন এবং সাহিত্যিক আড্ডা দিতেন; এমনকি বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বেরও আলোচনা করতেন।[৬৪]

আগের অধ্যায়ে যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর বংশগত বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। সূরদের (শামস আল দিন মুহম্মদ শাহ গাজীর বংশ) এবং কররানীদের দ্রুত সিংহাসন বদল ঘটেছিল। পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী (কররানীরা) মোগলদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এমতাবস্থায়, তাদের পক্ষে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আদৌ সম্ভব ছিল না। অন্তত আমাদের সূত্র সমূহ সে ধরনের কোনো প্রশাসনিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করেনি। বরং যা স্পষ্ট তা হচ্ছে, দিল্লির রাজকীয় সূর সুলতানেরা বিশেষত শেরশাহ, যে পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিলেন তারা তাকেই অনুসরণ করেছেন। সূর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(শামস আল দিন মুহম্মদ শাহ গাজীর স্থানীয় সূর বংশ) এবং কররানীদের অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার সূত্রপাত করতে হয়েছিল কারণ তারা দিল্লি থেকে স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা দিল্লির রাজকীয় সূর ঐতিহ্য ও হুসেন শাহী শাসকদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে পারতেন যেহেতু সেগুলো তখন তাদের স্মৃতিতে সচল ছিল।

দাউদ শাহ কররানী, লোদী খান, কাতলু খান, শ্রীহরি, গুজার খান প্রভৃতি মন্ত্রীদের সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য জানা যায় তা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণাটাই প্রবল হয়। তারা স্থানীয় সরকারে কোনো পরিবর্তন আনেন নি এবং শেরশাহ ও তার উত্তরসূরী হুসেন শাহী শাসকদের দ্বারা প্রচলিত পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই অক্ষত রেখেছিলেন। তাই যখন টোডরমল রাজস্ব নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে গেলেন তিনি পুরানো ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করেছিলেন।

পাদটীকা ও সূত্র সমূহ

১. রিজক আল্লা মুশতাকি তারিখ-ই-মুশতাকি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকায় রক্ষিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপির একটি রোটোগ্রাফ কপি, পৃ. ৯৫। কিয়ামুদ্দিন আহমেদ কৃত কর্পাস অব দি এরাবিক এণ্ড পার্সিয়ান ইনস্ক্রিপশনস ইন বিহার, পাটনা, ১৯৭৯, পৃ. ১১৬-১১৮

২. দাউদী, পৃ. ১২৮

৩. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১২৮

৪. রিজক আল্লা মুশতাকী তারিখ-ই-মুশতাকি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকায় রক্ষিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপির একটি রোটোগ্রাফ কপি, পৃ. ৯৭

৫. সারওয়ানী : খণ্ড-২, পৃ. ১৬৫-১৬৮

৬. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৬৯

৭. সুপরা : পৃ. ৮৪-১১২

৮. এইচ,বি : পৃ. ১৭৭

৯. পি. শরণ : দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মোগলস, বোম্বে, ১৯৭৩, পৃ. ৪৯

১০. এলিয়ট ও ডাউসন হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিষ্টোরিয়ানস। ইংরেজি অনুবাদ : তারিখ-ই-শেরশাহী। কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১০৮

১১. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৩৯। আরো দেখুন সারওয়ানী খণ্ড-২, পৃ. ১২৯-১৬৯

১২. পি. শরণ দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মোগলস ১৫২৬-১৬৫৮, বোম্বে, ১৯৭৩ পৃ. ৪৮, পাদটীকা-১৮

১৩. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ১৬৬-১৬৭

১৪. রিজক আল্লা মুশতাকী ওয়াকিয়াত-ই-মুশতাকী এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকায় রক্ষিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপির একটি রোটোগ্রাফ কপি, পৃ. ৯৮। তিনি বলেন যে, শেরশাহ বাংলায় এক বিশাল বাহিনী রেখেছিলেন। আরো দেখুন দাউদী, পৃ. ১৫৬। এটা আগের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫. রিয়াদ পৃ. ১৪৫

১৬. কানুনগোর 'শেরশাহ এণ্ড হিজ টাইম' কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৩১৪ তে আছে 'এই ১৯ জন প্রধান শিকদার যাদের অধীন নিজস্ব কোনো নিয়মিত বাহিনী ছিল না তারা ছিলেন আমিন ই বাংলার কর্তৃত্বাধীন। আমিন-ই-বাংলা কোনো সিপাহ সালার (সেনাপতি) ছিলেন না বরং ব্যাপক অর্থে কাজী ছিলেন... তিনি (শেরশাহ) কাজী ফজিলাত কে প্রাদেশিক সরকার সুন্দরভাবে পরিচালনা ও ঐক্য ধরে রাখার জন্য তার বেসামরিক ভাইসরয় হিসেবে রেখে যান। সমমর্যাদা সম্পন্ন ১৯ জন প্রধান শিকদারের মধ্যে কোনো মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই তাকে সামরিক একনায়কের ভূমিকা পালন করার জন্য নয়

১৭. রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ম কানুন আলোচনা করতে গিয়ে সারওয়ানী সরকার স্তর থেকে নিচের দিকে প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক সরকার এ একজন প্রধান শিকদার ও একজন মুন্সি নিযুক্ত করা হয়েছিল" কিন্তু প্রদেশ পর্যায়ে রাজ্যের গঠন সম্পর্কে তার বলার কিছু ছিল না। তার বর্ণনার পুরো বিষয়টা পর্যালোচনা করে তা থেকে যে বিষয়গুলো তুলে আনা যায় তাহলো প্রদেশ সম্পর্কে সেখানে কিছু নেই। এটা এ ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে শেরশাহের রাজ্যে সরকার ই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক একক

১৮. আই. এইচ কোরেশী দি এডমিনিস্ট্রেশন অব দি সুলতানাত অব দিল্লি, দিল্লি-১৯৭১, পৃ. ২৩১-২৩১, নির্ঘণ্ট- বি

১৯. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৬৫

২০. কানুনগো, পৃ. ৩১০, তিনি বলেন ...রাজস্বের উপর ভিত্তি করে ছোটো ও বড় ধরনের সরকার ছিল। এই সরকার গুলোর নাম স্পষ্টতই আইন-ই-আকবরী তে যা ছিল তাই। শেরশাহের দ্বারা সৃষ্ট নতুন সরকারের নাম ঐ সরকারের অধীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহকুমার নামানুসারে রাখা হতো

২১. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড পৃ. ১৬৫। তিনি লিখেছেন পরগনা এবং জনগণের স্বার্থ দেখার জন্য প্রত্যেক সরকার এ একজন প্রধান শিকদার এবং একজন প্রধান মুন্সিক নিযুক্ত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল যেন জনগণকে নির্যাতন এবং ভীত সন্ত্রস্ত করা না হয় আর রাজস্ব সংগ্রহে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না হয়। যদি পরগনার সীমানা এবং রাজার রাজ্যে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় যেন তারাই নিষ্পত্তি করে নেন এবং তা যেন কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় কোনো বিরোধের সৃষ্টি না করে

২২. কানুনগো, পৃ. ৩১৪

২৩. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৩১৪

২৪. আই.এইচ কোরেশী, পৃ. ২০৮, আরো দেখুন পাদটীকা-৯

২৫. উপরোল্লিখিত, পৃ. ২০৯

২৬. সারওয়ানী, খণ্ড-২, পৃ. ১৬৪

২৭. আই.এইচ. কোরেশী [illegible] আমিন' [illegible] আমিনকে বোঝানো হয়েছে এবং [illegible] প্রধান [illegible] সঙ্গে [illegible]লনীয় না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৮. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫। তিনি লিখেছেন 'আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এবং অভিজ্ঞতার বলে নিশ্চিত হয়েছি যে রাজস্ব সংগ্রহের মতো কোনো ধরনের আয় বা অন্যান্য সুবিধা অন্য কোনো চাকুরিতে নেই। ভালো এবং বৃদ্ধ লোকেরা, অনুগত এবং অভিজ্ঞ সেবকেরা রাজস্ব সংগ্রহ থেকে আয় এবং সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারে। দুই বছর পর একই ধরনের অন্য সেবকদের দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপিত (বদলী) করা হতো

২৯. কানুনগো, পৃ. ৩১৩

৩০. আই.এইচ. কোরেশী, পৃ. ২০৯, ২৫৯-২৬০

৩১. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫। তিনি লিখেছেন বর্তমান, অতীত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য প্রত্যেক পরগনায় একজন করে কানুনগো ছিলেন...

৩২. আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী। ২য় খণ্ড পৃ. ৭২। রহিম : পৃ. ৯৯

৩৩. কানুনগো, পৃ. ৩১৩

৩৪. আই.এইচ. কোরেশী, পৃ. ২০৮

৩৫. কানুনগো, পৃ. ৩১২

৩৬. আই.এইচ. কোরেশী : পৃ. ২০৭

৩৭. কানুনগো, পৃ. ৩১২

৩৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৩১২

৩৯. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৩১২ এই অফিসটি বাংলায় মহলানবীশ করা হয়েছে। কানুনগো আরো বলেন যে, তিনি ছিলেন সামরিক বিভাগের করণিক যার প্রধান কাজ ছিল হুলিয়া বা সৈনিকদের বিস্তারিত বিবরণী লেখা

৪০. আই.এইচ. কোরেশী : পৃ. ৮৯। তিনি বলেন প্রত্যেক প্রশাসনিক মহকুমায় একজন করে স্থানীয় বারিদ ছিল যিনি কেন্দ্রীয় দপ্তরে চিঠির মাধ্যমে নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ করতেন

৪১. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১

৪২. আই.এইচ. কোরেশী, পৃ. ৯১, ৯২

৪৩. কানুনগো, পৃ. ৩১৩। আরো দেখুন পাদটীকা-১

৪৪. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৩১৫। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটি মূলত সোনারগাঁ এর সুলতান ফখর আল দিন মুবারক শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। করিমঃ চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ. ৩১

৪৫. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৩১৭

৪৬. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫, ১২৭-১২৮, ১৭০

৪৭. আই.এইচ. কোরেশী, পৃ. ১৯৩

৪৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ১৯৩

৪৯. কানুনগো, পৃ. ৩১৭

৫০. দাউদী, পৃ. ১৬৫। তিনি লিখেছেন : (এখানে ফার্সি ভাষার উদ্ধৃতি আছে)

৫১. কানুনগো, পৃ. ৩১৭। পাদটীকা-১

৫২. বাবুর নামা, বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ। পৃ. ৮৪[illegible]

৫৩. মির্জা নাথান, বাহারিস্তান-ই-গায়েবী। ময়েদুল ইস[illegible] কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ ১৯৩৬; পৃ. ১৬৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৪. সারওয়ানী, ২য় খণ্ড পৃ. ১৭৬
৫৫. অবশ্যই চট্টগ্রাম এবং সাতগাঁও বন্দরে শুল্ক কর্মকর্তাদের দ্বারা শুল্ক আদায় করা হতো
৫৬. দাউদী, পৃ. ১৬৫, রহিম : পৃ. ৭৭-৭৮
৫৭. রহিম, পৃ. ৯৫
৫৮. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৯৭
৫৯. উপরোল্লিখিত, পৃ. ৯৭
৬০. সুজন রায়, খুলাসাত আল তাওয়ারিখ উর্দু অনুবাদ; নাজির হুসাইন জায়দী, লাহোর, ১৯৬৬, পৃ. ৪৯
৬১. মোল্লা আব্দ আল কাদের বাদাউনী মুন্তাখাব আল তাওয়ারিখ মূল গ্রন্থ: খণ্ড-১, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫, রহিম পৃ. ১০৬। পাদটীকা-১
৬২. উপরোল্লিখিত, মূল গ্রন্থ খণ্ড-১ পৃ. ২৮৪-২৮৫
৬৩. নিমাত আল্লা, খণ্ড-১ পৃ. ২৮৪-৩৭৭। পাদটীকা-১
৬৪. বাদাউনী, মূল গ্রন্থ, খণ্ড-১ পৃ. ৪১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

আফগান শাসনকালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু চিত্র

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দিল্লি এবং লক্ষ্মণাবতী মুসলমানদের দখলে আসে এবং তথায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই বাংলার মুসলিম সমাজ আরব, ইরান, তুর্কি, আবিসিনীয় এবং আফগানদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। আলোচ্য সময়ের পরের দিকে আফগান ও মোগলরা বাংলায় প্রবেশ করে। শেরশাহের বাংলা দখলের সাথে সাথে অভিবাসনের এই হার বেড়ে যায়। স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা এদের সাথে যুক্ত হলে মুসলিম সমাজের সম্মিলিত আকৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে এই বিশাল জনগোষ্ঠী বাঙালি হিসেবে নিজেদের স্বাধীন স্বত্তা, পরিচিতি ও ঐতিহ্য গড়ে তোলে। এমন কি বাংলার স্বাধীন সুলতানদের শাসনকালে এই বাঙালি মুসলিম সমাজ একদিকে দিল্লির সুলতানদের আগ্রাসন ও অন্যদিকে স্থানীয় বিদ্রোহীদের হাত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যথেষ্ট পারঙ্গমতা দেখাতে সক্ষম হয়। অবশ্য এই সময়ে ধারাবাহিক যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সামাজিক ভারসাম্যের ভিত্তি অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে যায়।

শেরশাহের গৌড় বিজয়ের মাধ্যমে বাংলা আফগানদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। নতুন এই উপনিবেশে প্রশাসনিক কতৃত্ব ও প্রভাব স্থাপন এবং সার্বিক শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে শেরশাহ বাংলাকে বিভক্ত করে তার অনুগত সেনাপতিদের বিভিন্ন অংশের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আলোচ্য এই সময়কালে এমন এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাকে ফার্সিতে 'মুলুক আল তাওয়ায়েক'[১] (জোর যার মুলুক তার এর মত) বলা হয়।

আফগান এবং অন্যান্য অভিবাসী মুসলিম জাতি গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন বৈশিষ্ট্য ছিল। গোত্রীয় স্বকীয়তা বজায় রেখেই তারা একটা জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করতো। পক্ষান্তরে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিমরা যদিও হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ থেকে এসেছিল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্ণের। সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মান্তরিত মুসলিমদের সিংহভাগই সাধারণ জনগণের মধ্যে থেকে এসেছিল। মুসলিম অভিবাসী (বিশেষত আফগান অভিবাসী) এই জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রের মাধ্যমে এক মিশ্র প্রজন্মের বিকাশ ঘটে।[২] এতগুলো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মানুষের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো শেরশাহের জন্য ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

নিজে আফগান বংশোদ্ভূত হওয়ায় শেরশাহ আফগানদের বিভিন্ন গোত্রীয় ও উপজাতীয় চরিত্র, রীতিনীতি, স্বভাব ও স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল

~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। তাই ক্ষমতারোহণের সাথে সাথে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে নিজেকে সুলতান না বলে যুগের খলিফা[৩] হিসেবে প্রচার করেন এবং তাম্র মুদ্রা প্রচলন করে তা জানিয়ে দেন। পাশাপাশি তিনি হিন্দি ভাষাকে মুদ্রার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে ফার্সি ভাষার মতো রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেন।[৪] প্রশাসনিক কাজে হিন্দু মেধাবীদের কাজে নিয়োগ করেন। হিন্দি লেখকদের রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ দেন এবং হিন্দি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বাংলায় হুসেন শাহী সুলতানদের আমলে এই ঐতিহ্য ও ধারা বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। শেরশাহ এই ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করেন। তরফদারের বর্ণনা মতে:

"এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে হুসাইনী শাসকবর্গ (হুসেন শাহী শাসকবৃন্দ) আরব বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভূমি আরবের সাথে তাদের সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল না। আরব ভূখণ্ড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাংলায় তাদের পক্ষে নিজস্ব আরবীয় সংস্কৃতি লালন করাও সম্ভব ছিল না। ফলে শাসক শ্রেণিকে তাদের বিদেশি জন্মসংস্কৃতি ভুলে গিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার কারণে সুলতানেরা বাঙালি বনে যান এবং স্বভাব চরিত্রে বাঙালি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তারা বাংলা ভাষাকে সেইরূপ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করেন যা মুসলিম পূর্ব হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে সংস্কৃত ভাষা লাভ করেছিল।"[৫]

সমাজে শেরশাহের প্রধান অবদান ছিল এই যে, তিনি আফগানদের জন্য বাংলাকে নতুন উপনিবেশে পরিণত করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ঐতিহাসিক মূল উৎসে তেমন একটা পাওয়া যায় না। তবে কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করে একত্রিত করা যেতে পারে। কানুনগো এই দিকটি তার গ্রন্থে এমন চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যে আমি তার লেখা হুবহু তুলে ধরতে উৎসাহিত বোধ করছি :

"মধ্যযুগে বাংলাকে উপনিবেশে রূপান্তরের ঘটনা এ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ ভাবে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন নি। শেরশাহ কর্তৃক বাংলায় আফগান গোত্রগুলোকে প্রতিষ্ঠার তথ্য ফার্সি ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে খুব কমই পাওয়া যায়। যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' সূত্রে এই বিষয়ে মূল্যবান তথ্য সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত আবুল ফজলকেই আমরা তথ্যের মূল উৎস (যদিও খুব ক্ষীণ উৎস) বলে মনে করতাম। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং সংস্কৃত আফগান পাঠানদের মধ্যে এমন পরিবর্তন এনেছিল যা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাহারিস্তান গ্রন্থে বাংলার পাঠান সম্প্রদায়গুলোর এবং এদেশে তাদের আশ্রয়স্থলের নাম পাওয়া যায়। বাংলায় সূর বংশের শাসন বিলুপ্তির পঞ্চাশ বছর পরেও এগুলোর অস্তিত্ব ছিল।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভাইসরয় ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তারা মূলত শেরশাহের সময়কাল থেকে তৃতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রজন্মের উত্তরাধিকারি। বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎস খুঁজে বের করার জন্য একদল গবেষকের জনগণের মধ্যে নিবেদিত অবস্থান যেমন তাদের অতীত খুঁটিনাটি বিষয় সমূহকে তুলে এনেছে, ঠিক তেমনি ভাবে যদি বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে গবেষণার কষ্ঠিপাথরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা যায় তাহলে ষোড়শ শতকে বাংলায় আফগান উপনিবেশের একটা ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র পাওয়া যেতে পারে। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক জ্ঞানসমৃদ্ধ তরুণ প্রজন্মকে মাঠ পর্যায়ে আফগানদের উৎসের সন্ধানে সমাজে তাদের অবস্থান, আচার-আচরণ, রীতি-প্রথা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষত রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ত্রিপুরা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম জেলাগুলোতে ক্ষয়িষ্ণু পাঠান জনগোষ্ঠী শেখ এবং সৈয়দ নামে পরিচিতদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যও সংরক্ষণ করতে হবে। প্রায় একশ বছর আগে বাংলায় মাত্র একজন পাঠানই 'তারিখ-ই-চট্টগ্রাম' নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম হামিদ উদ্দিন খান (সঠিক ভাবে হামিদ আল্লা খান)। কিন্তু তার লেখনীর মূল আবেগ স্বজাতির ইতিহাসের চেয়ে মাতৃভূমির প্রতি বেশি প্রবল ছিল। শেরশাহ বাংলায় একই গোষ্ঠীর বা খাইলের নিবিড় উপনিবেশ গড়ে তোলেন নি যার ঋণাত্মক পরিণাম লোদী যুগেই প্রতিফলিত হয়েছে। সৈয়দ মাহমুদ শাহের অধীনে বাংলায় প্রথম আশ্রয়প্রার্থী লোহানীরা উড়িষ্যায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা মান সিংহ তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে বাংলায় জমিদান করা পর্যন্ত তারা উড়িষ্যাকে নিজেদের ঘর বানিয়ে ফেলেছিলেন।

শেরশাহের সময় আফগান বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিল কাকর,পানী বাতানী, উসতারনী (শিররানীদের সমগোত্রীয়), তারিন (শিররানীদের আত্মীয়) ও মাহমুদ খাইল (মুসা খাইল, পানী এবং কাকরদের আত্মীয় স্বজন)। উত্তর বিহার ও বাংলায় কাকররা অন্যদের সংখ্যায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সম্রাট সেলিম শাহের মৃত্যুর পর উত্তর বিহার ও বাংলায় তারা কররানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কোনো কোনো গোত্র প্রধানকে 'মজলিস-ই-আল্লা' খেতাব প্রদান করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে সন্দেহ ভাজন ভূঁইয়াদের পূর্বপুরুষ ফতেহাবাদের (ফরিদপুর জেলার) মৃসলিস কুতুব। যদি অনুমান করা সঠিক হয় যে, আফগান জমিদাররা মোগল ভাইসরয় ইসলাম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ জমিদারিতে বহাল ছিলেন, তা হলে এটা পরিষ্কার যে, শেরশাহ আফগানদের উত্তর এবং পূর্ব বাংলার নদী তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে দক্ষিণপূর্বে সুদূর চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে দেন। অন্য অনেক এলাকার মতো চট্টগ্রামেও একটি পাঠানটুলি আছে। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান, বীরভূম, হিজলী এবং চন্দ্রকোনায় আফগানদের নতুন আবাসন গড়ে উঠেছিল। এই বসতিগুলো হয় সীমান্তে না হয় দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু জমিদারদের মাঝে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল।

শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম জয়, এমন কি তারপরও, বাংলায় আফগানদের অনুপ্রবেশ চলতে থাকে। চট্টগ্রাম জেলার সুদুর রামু পর্যন্ত অধিকারের পর মূল পাঠান জনগোষ্ঠী

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যারা মগদের সাথে মিলে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা মোগল এলাকার বাইরে চলে যান। তাদের উত্তরসুরীরা অদ্যাবধি নাফ নদীর এই পারে ছোটো আরক বা ছোটো আরাকান নামক স্থানে বাস করছেন। তাদের সুঠাম, শক্তিশালী দৈহিক গঠন, লম্বা চুল এবং অরাজকতার জন্য তারা আজও পরিচিত।

শেরশাহ শুধু আফগানদের মাধ্যমে বাংলায় উপনিবেশের যাত্রা শুরু করেননি তিনি উত্তর ভারতের রাজপুতদেরও বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করার সুযোগ করে দেন। বীরভূমের বীর হামীর এবং মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার জমিদার চন্দ্রাভান নামদ্বয় এই পরিচয় বহন করে যে এরা বাংলার বাইরের রাজপুত বংশোদ্ভূত।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে মোগলদের মতো আফগানদেরকে বিদেশি মনে করা হতো না। আফগানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে গেলে এই আফগানরা হিন্দু জমিদারদের অধীনে চাকুরি নেয় এবং মোগলদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়।[৬]

ধর্মবিশ্বাসে এই আফগানরা মুসলমান ছিল। ইসলামে সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু আফগানদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, বাঙালি ও মোগলদের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই এই ভ্রাতৃত্ববোধকে আঘাত হানে। রাজনৈতিক হানাহানি এই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে। কিন্তু যেহেতু সময় হচ্ছে সবচেয়ে ভালো প্রতিষেধক, কালক্রমে এই তিক্ততা নিরসন হয়ে যায়। শেরশাহ এবং ইসলাম শাহ নিজেরা যেমন ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন, তেমনি সাধারণ প্রজাদেরও তারা তা মেনে চলার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ব্যক্তি জীবনে শেরশাহ ইসলামী বিধান মতো জীবনযাপন করতেন। ওলামা মাশায়েখদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাদের সাহচর্য দিতেন।[৭] একইভাবে সোলায়মান কররানীও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। বিহারের প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে ন্যায় বিচার ও দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাকে দ্বিতীয় সোলায়মান বলে প্রশংসা করা হয়েছে।[৮] ঐতিহাসিক নিমাত আল্লা[৯] তাঁর প্রশাংসা করে লিখেছেন যে, ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সোলায়মান কররানী কঠোর ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি স্বভাবতই রাতের নামাজ ১৫০ জন ওলেমা মাশায়েখদের সাথে নিয়ে আদায় করতেন। তাদের সাথে ধর্মীয় বিধানাবলী আলোচনা করতে করতে রাত্রি যাপন করতেন এবং সকালের নামাজ আদায় করে রাষ্ট্রীয় কাজে মনোনিবেশ করতেন। সারওয়ানী লিখেছেন, "রাজা বাদশাহদের উচিত তাদের রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের অনুশাসন পালন করা যাতে তাদের প্রজারা এবং সাধারণ মানুষেরা ধর্মীয় আচারাদি পালনে অনুপ্রাণিত হয়। কারণ প্রজাদের প্রত্যেক উপাসনারই রাজারা অংশীদার। অপরাধ ও অনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্থ হয়। কারণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তার অনুসারীদের জন্য যে সকল সুফল রেখেছেন, তা থেকে রাজা,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রজা ও অধীনস্থ কর্মচারীরা বঞ্চিত হন। আর তাই প্রজাদের রাজাদেশ যেমন মেনে চলা উচিৎ তেমনি রাজাদেরও আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা বাঞ্চনীয়।[১০]

আফগানরা ধর্মীয় বিশ্বাসে মুসলমান হলেও তাদের উপর গোত্রীয় প্রভাব ছিল প্রবল। তাদের সমাজ শরীফ (স্বাধীন জন্ম গ্রহণকারী), আশ্রিত, মাওয়ালী ও দাস বা গোলামদের নিয়ে গঠিত। এরা তাদের দেশ রোহ (আফগানিস্তানের রোহ অঞ্চলে) কখনো কোনো স্বৈরাচারী শাসক, বংশ পরম্পরা কোনো রাজা, কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ও বিদেশি স্বৈরাচারী শক্তির অধীনে থাকেনি এবং তাদের সে ধরনের কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না।[১১] কানুনগো পাঠান সমাজে সরকারের ধরন সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রত্যেক পরিবার পরিচালিত হয় পুরুষ দ্বারা। পরিবারের প্রধান নিজ গোত্রের নেতা নির্বাচিত করেন। তাকে বলা হয় মালিক। তিনি আফগান সমাজে সরকার প্রধান এবং জিরগার দলনেতা। তিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন, রাজনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করেন এবং আন্তঃগোত্রীয় বিবাদ মীমাংসা করেন। তারা পীর ছাড়া অন্য কারো কথা শুনলেও মানেন না। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে পাঠানদের দেশে পীর সাহেবদের বিচরণ ছিল অবাধ ও সম্মানজনক। তাদের অমান্য করে চলার সাধ্য কোনো পাঠান শাসকের ছিল না, তিনি আহমদ শাহ আবদালী বা শেরশাহ যেই হোন না কেন।"[১২] পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানবগণ, আমি তোমাদের নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে আল্লাহর নিকট অধিক ধার্মিক।'[১৩] আফগানরা যদিও বাংলাকে তাদের আবাসস্থল করে নিয়েছিল এবং বাংলার আবহাওয়ার সাথে মিশে গিয়েছিল তবুও তারা তাদের গোত্রীয় পরিচয় অটুট রেখেছিল। মির্জা নাথান তার রচিত 'বাহারিস্থান-ই-গায়েবী' গ্রন্থে আফগানদের স্ব স্ব গোত্রের পরিচয়ে বাংলায় বসতি স্থাপনের তথ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।[১৪]

মোগল এবং পাঠানেরা তাদের স্ব স্ব গোত্রের পরিচয় বজায় রেখে চলায় বাংলার সমাজে তাদের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গোত্র, বংশ, প্রতাপ-প্রতিপত্তি, শিক্ষা এবং ব্যবসা ভিত্তিক পরিচয় প্রাধান্য পেত। আলোচ্য সময়ে হিন্দু সমাজ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং একই প্রভাবে মুসলিম সমাজ ও প্রভাবিত ছিল। টি. কে. রায় চৌধুরীর ভাষায় "জাতি নিয়ে গঠিত সামাজিক কাঠামোর ছায়ায় মুসলমানেরা আপাতভাবে একটি অভিন্ন অবস্থান দেখালেও হিন্দু সমাজের পাশাপাশি এবং সমান্তরাল অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে জাতিভেদ পরিলক্ষিত হয়। সরলভাবে বলতে গেলে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের অবস্থান সবার উপরে আর ধর্মীয় অপবিত্রতার অজুহাত সব চেয়ে নিম্নে অবস্থান অচ্ছুৎদের। মুসলিম সমাজে সবচেয়ে উপরে অবস্থান তাদের যাদের হাতে ক্ষমতার দণ্ড ছিল এবং যারা জরুরী পণ্য ও সেবা পেশার সাথে জড়িত তাদের অবস্থান সমাজের সর্ব নিম্নে। তবে পার্থক্য শুধু এটুকুই যে একসঙ্গে খাওয়া পান করার ক্ষেত্রে এদের কোনো বাধা ছিল না।[১৫] কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে শেরশাহ থেকে শুরু করে সোলায়মান

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কররানী পর্যন্ত সকল আফগান শাসকেরা ইসলাম ও শরীয়াকে ধারণ করে রেখেছিলেন, হিন্দুদের সাথে উদার ছিলেন এবং বাংলায় প্রবেশ করার পর প্রথমবারের মতো মুদ্রায় হিন্দি ভাষা ব্যবহার করেছেন।[১৬] হিন্দি ভাষার এই ব্যবহারের মধ্যে বোঝা যায় যে তারা হিন্দি লিখেছিলেন, হিন্দি ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং উদার মুসলমান ছিলেন। প্রত্যেক মহিলা এবং পুরুষের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং মুসলমানদের মধ্যে মহোত্তম ব্যক্তিই সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ইসলামের এই নীতিই তাদের চালিকা শক্তি ছিল। সেভাবেই সমাজে এক মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের সম্পর্ক নির্ণয় করা হতো। সুতরাং শাসক ও শাসিত এবং উচ্চ ও নিচ সবাই 'সাদাত' অর্থাৎ শিক্ষিত জনদের মর্যাদার আসনে বসাতেন।[১৭] রাষ্ট্র ও ব্যক্তি কর্তৃক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সামরিক বেসামরিক চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান করা হতো এবং রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হতে পারতেন। শেরশাহ নিজেই এক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ ইত্যাদিও উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে প্রবেশাধিকারে কোনো বৈষম্য করা হতো না। সামরিক বেসামরিক উভয় ধরনের সরকারি চাকুরি যোগ্যতা সম্পন্ন সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এক সাথে উপাসনালয়ে প্রার্থনা করা, শিক্ষা গ্রহণ করা এবং খাবার জন্য বসা মুসলিম সমাজে সাধারণ বিষয় হলেও বাংলার অমুসলিমদের মধ্যে তা প্রচলিত ছিল না। শাসকের নিকট অথবা ধর্মীয় গুরুর নিকট সমাজের উচ্চ-নিচ সবারই সমান প্রবেশাধিকার মুসলিম সমাজের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৮]

মুসলমানদের থেকে পৃথক রাখার ব্রাহ্মণদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও[১৯] নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের তারা মুসলমানদের নিকট থেকে পৃথক রাখতে পারেননি। ব্রাহ্মণরা নিজেরাও বেশিদিন মুসলিমদের থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি। সুতরাং হিন্দু ধর্মের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করার ফলে ইসলামে ধর্মান্তরিতরা মুসলমানদের সঙ্গে সহজে মিশে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ফলে মুসলিম সমাজ সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হয়।

সুতরাং বিদেশি বংশোদ্ভূত মুসলমান এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা শিক্ষাগত যোগ্যতায় সমাজে একত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করতেন। তারা একত্রে মসজিদে নামাজ আদায়, রমজান মাসে গাম্ভীর্যের সাথে রোজা পালন, অন্যান্য সাহিত্যের সাথে কোরআন পাঠ করা, দরিদ্রদের সাহায্যার্থে যাকাত আদায় করা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্জ ব্রত পালন করতেন। অর্থাৎ একই স্বার্থসম্বলিত একাধিক জনগোষ্ঠী আন্তরিকভাবে একই সাথে বসবাস করতেন যা আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের অর্থে শ্রেণি হিসেবে পরিচিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে অভিন্ন স্বার্থসম্বলিত একাধিক জনগোষ্ঠী দলবদ্ধভাবে বসবাস করতেন। সারওয়ানী তার 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দলের কথা উল্লেখ করেছেন।[২০]

ক) রাজা এবং শাসকশ্রেণি যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে রাজকুমার, খেতাব প্রাপ্ত অমাত্যবর্গ এবং বড় বড় রাজস্ব অঞ্চলের আধিকারিকবৃন্দ।
খ) সাদাত (অর্থাৎ উলামা এবং মাশায়েখবৃন্দ) ও শিক্ষিত শ্রেণি।
গ) সৈনিকবৃন্দ
ঘ) ব্যবসায়ী শ্রেণি
ঙ) জমিদার শ্রেণি এবং
চ) প্রজাবৃন্দ (দুর্বল, বৃদ্ধ ও শ্রমজীবি জনগোষ্ঠী)

১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় রচিত বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়' কাব্য গ্রন্থে বাংলার উচ্চ শ্রেণির মুসলমানদের কথা পাওয়া যায়।[২১] সাতগাঁও এর মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে কবি নিম্নলিখিত গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন

ক) মোঙ্গল, পাঠান এবং মোকাদিম (মাখদুম?)
খ) সৈয়দ, মোল্ল্যা এবং কাজী।

সুতরাং দেখা যায় যে শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সফলতার উপর ভিত্তি করে সমাজে মুসলমানরা পরিচিত ছিল। একই সাথে মহানবী (স.)-র বংশের সাথে সম্পর্কিত ও রাজপরিবারের সাথে সুসম্পর্ক সমাজে তাদের মর্যাদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচিত হতো।[২২] সম্পদ ও ক্ষমতা ছাড়াও বংশ-সম্পর্ক যে সমাজে উচ্চ মর্যাদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি মাপকাঠি ছিল তা সারওয়ানীর বক্তব্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তিনি লিখেছেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, উচ্চ রাজপদের অধিকারী এবং রাজাদের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত তারা রাজকার্যকে তুচ্ছ মনে করতেন এবং তাই এ কাজগুলো উজিরদের উপর ন্যস্ত করা হতো।[২৩]

মুকুন্দরাম[২৪] ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের একজন মোগল কবি। তিনি মোগল মুসলিম সমাজের পেশাজীবি দলগুলোর একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

* গোলা বা গোয়ালা	গরু পালনকারী, দুধ বিক্রেতা। তারা রোজা পালন করে না নামাজ ও পড়ে না।
* জোলা বা জোলাহা	এরা কাপড় বোনে।
* মুকেরি	গরু/মহিষ গাড়িচালক।
* পিঠারি	পিঠা প্রস্তুতকারক। (বর্তমানের বিস্কুট, রুটি, কেক প্রস্তুতকারক)
* কাবারি বা মেছে	যারা মাছ ধরে এবং বিক্রি করে
* ঘোষাল বা ঘোর্ষাল	ধর্মান্তরিত মুসলমান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

	কাল	ভিক্ষুক শ্রেণি।
*	সানাকার	তাঁত প্রস্তুতকারক, রং মিস্ত্রি।
*	তীরকার	ধনুকী, তীর/ধনুক প্রস্তুতকারক।
	কাগচি/কাগচা	যারা কাগজ তৈরি করে।
*	রং-রেজ	কাপড় রং করে যারা।
*	দর্জি	কাপড় সেলাই করে।
*	কসাই	মাংস বিক্রেতা/গো-মাংস বিক্রেতা।
*	হাজ্জাম	নাপিত ও খৎনাকারক।
*	কালান্দর	ভবঘুরে, দরবেশ এবং ভ্রষ্টাপাগল ব্যক্তি।

উপরোল্লিখিত পেশাগুলো থেকে বোঝা যায় যে দৈনন্দিন পেশাভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ছিল। পেশার প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, তারা আদিকাল থেকে এ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং এটা ধারণা করা যায় যে ,এদের কেউ কেউ যেমন গোয়ালা, জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবারি, তীরকার, কাগচি পেশাজীবিরা ধর্মান্তরিত মুসলমান ছিলেন। ড. করিমের মতে, "নিম্নবর্ণের লোকেরা যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা নিজেদের আদি পেশা থেকে সরে আসেনি।"[২৪]

বাংলার মুসলিম সমাজে জনগোষ্ঠীর শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে পণ্ডিতেরা যথার্থই বলেছেন যে বাংলার মুসলিম সমাজ মূলত দুটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিন্যস্ত ছিল উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি। উচ্চশ্রেণির লোকেরা উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের আচার অনুসরণ করতেন কিন্তু নিম্নশ্রেণির লোকেরা হিন্দু সমাজে চালু থাকা স্থানীয় প্রথা ও পেশা অনুসরণ করা অব্যাহত রেখেছিলেন।[২৫] সুতরাং মুসলিম সমাজ স্থানীয় এবং অস্থানীয়দের দ্বারা গঠিত ছিল এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণিতে বিন্যস্ত ছিল। মসজিদ, মক্তব, খানকাহ, হাট ও বাজার এবং ঈদগাহে তাদের পারস্পরিক মিলন হতো।

মুসলিম অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়েই তৎকালীন সময়ের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট বাবরের দিল্লি অধিকারের পর থেকে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ফলশ্রুতিতে বাংলার উপর আফগানদের চাপ, শেরশাহের বাংলা বিজয়, বাংলার স্বাধীনতা হারানো, সুলতান মুহম্মদ শাহ সূরের শাসনকালে বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা, বাংলায় স্বাধীন আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠা, দাউদ শাহের পরাজয় ও তার মৃত্যুর পর পুনরায় বাংলার স্বাধীনতা হারানো--এ সব কিছুর বিরূপ প্রভাব বাংলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। দীর্ঘ মেয়াদে বাংলার সম্পদের উপর চাপের কারণে শাসক ও শাসিতের অর্থনৈতিক অবস্থা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিহারে ঠিক একই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানদের ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে হয়।[২৬] বাংলায় ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা সূফি, সাধক ও সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয় কারণ বৈষ্ণবরা প্রকাশ্যে নাচ, গান করে কৃষ্ণের প্রতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালবাসা প্রদর্শন করতো। চৈতন্যের অনুসারীরা খোলা জায়গায় সারারাত কীর্ত্তন-ভজন পরিবেশন করে তাদের প্রেমিকাদের (গোপী) সাথে আনন্দ উদযাপন করতো। অনুষ্ঠানে হৈচৈ এবং উদ্দামতার কারণে শুধু মুসলমানরা নয় হিন্দু ব্রাহ্মণরাও এর বিরোধিতা করে চৈতন্যের বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে নালিশ করতো। তারা গান বাজনা প্রিয় মুসলিম শাসকদের[২৭] নিকটও নালিশ করেন যদিও তারা নিজেরাই এ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

সার্কী সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের মুসলিম সমাজ এক ধরনের নৈতিক, আত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। কিন্তু বিশ্ব সভ্যতা ধ্বংসের পূর্বে মেহেদীর (হেদায়েত দানকারী ধর্মীয় সংস্কারক) আবির্ভাব ঘটার কথা। তাই মুসলমানেরা অতি উৎসাহ ভরে তাদের মাঝে একজন মেহেদীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মীর সাইয়েদ মোহাম্মদ খান নিজেকে মেহেদী বলে দাবি করলে জনগণ তার সাথে জমায়েত হলো।[২৮] উলেমা সমাজের লোকজন মেহেদীবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে মীর সাইয়েদ মোহাম্মদকে দেশ ছাড়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। বাংলায় আফগানরা আবার নবরূপে আধ্যাত্মিকতায় মেতে ওঠে যেমনটি তাদেরকে বিহারে দেখা গিয়েছিল। তারা ফকির দরবেশ বনে গিয়ে বাংলার আনাচে কানাচে বিচরণ করতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে তাদেরকে 'কালান্দার' নামে অভিহিত পাওয়া যায়। ড. এনামুল হক বলেন, "তাদের নাম প্রত্যেক হিন্দু মুসলমান লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। তাদের নাম ধাম, অদম্য উৎসাহ এবং নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকলাপ এদেশে এমনভাবে দৃশ্যমান হয়েছিল যে সকল শ্রেণির ফকির দরবেশদের 'কালান্দার' নামে আখ্যায়িত করা হতো।"[২৯] বাংলায় চিশতিয়া তরিকা খুব সংঘবদ্ধভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। এই তরিকার সাধকদের সূফি বলা হতো। এর সাধকগণ 'শামা' (ধর্মীয় গান বা কাওয়ালী) শোনার প্রতি বেশ আসক্ত ছিলেন। আই.এইচ কোরেশীর ভাষায়- খসরু এবং হাসান (উভয়েই খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন) উভয়েই বড় মাপের সংগীতভক্ত ছিলেন। তাদের শিষ্যরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজদরবারে উপস্থিত থাকতেন। তাদের মাধ্যমে ভারতীয় শাস্ত্র সংগীতের জ্ঞান ও যশের এক বিশাল ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৩০]

ইসলামে সংগীত নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। গোঁড়া উলেমাদের মতে ইসলামে সংগীত নিষিদ্ধ। চিশতিয়া তরিকার সূফি সাধকরা 'শামা (ধর্মীয় গান বাজনা) শোনার অনুমতি দিয়েছেন। উলেমারা চিশতিয়া তরিকার সূফি সাধকদের শামা শোনা পছন্দ করতেন না। সুলতান গিয়াস আল দীন তুঘলকের শাসনামলে উলেমারা রাজ দরবারে শায়েখ নিজাম আল দীন আউলিয়াকে 'শামা' শোনার জন্য রীতিমত অভিশংসন করেন এবং তা নিষিদ্ধের চেষ্টা করেন।[৩১] শায়েখ সাফল্যের সাথে উলেমাদের অভিযোগ প্রতিহত করেন এবং 'শামা' শোনা অব্যাহত রাখেন। সুলতান ইসলাম শাহ সূরের শাসনকালে শায়েখ আলাই[৩২] এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি দরবারী ওলেমা (যারা রাজার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৃষ্ঠপোষকতার আশায় রাজশক্তিকে সমর্থন দিত) এবং সেই সকল মাশায়েখ যারা শামা শ্রবণ করতো উভয়ের তীব্র বিরোধিতা করেন। সেই সময়ে বিহারে প্রতিষ্ঠিত শায়েখ বুদ্ধ[৩৪]আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শামা শুনতেন।

আফগান শাসক ও শাসক শ্রেণির লোকেরা ধর্মানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও সংগীতানুরাগী ছিলেন। তারা এ কলা ও শিল্পের ভালো বোদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা ইসলামের বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করে নাচ গানের কলাকৌশল এমনভাবে আয়ত্ব করেছিলেন যে তৎকালীন সকল ওস্তাদদের খ্যাতিকে ছাড়িয়ে যান। ফলে ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো কোনো কার্যকলাপ যেমন যৌনতা, মদপান, নাচ ও গান ইত্যাদি আফগান শাসক ও অমাত্যদের মধ্যে অবাধে চলতো যেমন তা চলতো হিন্দু সমাজে। অবশ্য এগুলো হিন্দু সমাজে ধর্মীয় বিধান সম্মত ছিল। সুলতান বাহলুল লোদী ধর্মভীরু ছিলেন কিন্তু তিনি সংগীত ভক্তও ছিলেন।

সুলতান সিকান্দার শাহ লোদীর বাড়ির পাশে মীর সাইয়েদ রুহুল্লাহ এবং সাইয়েদ ইবনে রসুলের আস্তানা ছিল। ইসলামী শরীয়াহর বিধি বিধানকে পাশ কাটিয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগীত কলা কুশলীদের সেখানে সমবেত করে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হতো।[৩৩] রাতের তিন প্রহর অতিক্রম করলে গান বাজনার আসর শুরু হতো এবং প্রায় সকাল পর্যন্ত তা চলতো। সুলতান সিকান্দার শাহ চারজন বালক-ভৃত্য ক্রয় করেছিলেন। এদের প্রথম জন 'চাং' বাজাতো (চাং হচ্ছে দোতারা বিশেষ যাতে ৫০/৬০টি তার থাকতো এবং তা দুই হাত দিয়ে বাজানো হতো); দ্বিতীয় জন 'কানুন' বাজাতো; তৃতীয় জন তাম্বুরা বাজাতো এবং চতুর্থ জন 'বীণ' বাজাতো। এছাড়া দক্ষ শেহনাই (সানাই) বাদক ছিল। কিন্তু কেউই সুলতানের পছন্দ মালিগাওরা, কল্যাণ, কানাড়া এবং হুসেনী কানাড়া ছাড়া অন্য কোনো সূর বাজাতো না।

সুলতান মাহমুদ লোদীও সংগীতের একজন বোদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় দোরা'র যুদ্ধে যখন তার পরাজয় হয় তখন তার রাজনৈতিক জীবনেরও সমাপ্তি ঘটে। সারওয়ানীর মতে, তিনি তখন একজন হতভাগ্য ব্যক্তি হয়ে গেলেন এবং রাজনীতি থেকে সরে এসে নিভৃতে তার দাসীদের নিয়ে নাচ-গান বাজনাসহ সকল ধরনের ঐন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলেন।[৩৩] বাদাউনী এবং আবুল ফজলের মতে ইসলাম শাহও সংগীতের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আকবরের দরবারে খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞ সূর দাস ও রাম দাস ইসলাম শাহের দরবারে খ্যতি ও যশস্বীতা অর্জন করেছিলেন।[৩৪] স্বামী হরিদাস মহাসংগীত বিশারদ তানসেনের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

একইভাবে শেরশাহ সূর-এর ছোট ভাই নিজাম খান সূর এর ছেলে সুলতান মোবারিজ খান সূর ওরফে আদিল শাহ সূর একজন সংগীত বিশারদ ছিলেন। তিনি হেরেমে (অন্দরমহলে) নর্তকীদের নিয়ে নাচে গানে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। সেই যুগে সংগীতের কলা কৌশল রপ্ত করে তিনি একজন মহা সংগীতজ্ঞে পরিণত হন। আকবরের দরবারি সংগীতজ্ঞ তানসেন এবং রাজ বাহাদুর (মালওয়ার আফগান রাজা যিনি নিজেই সংগীতজ্ঞ ছিলেন) আদিল শাহ সূর-এর শিষ্য ছিলেন। আদিলের সংগীত প্রতিভা সমসাময়িক সংগীতজ্ঞদের বিস্মিত করেছিল। তিনি এমন একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ ছিলেন যে তিনি পাখওয়াজ (মানুষের সমান বড় এক ধরনের ঢোল) হাত ও পা উভয় দিয়েই বাজাতে পারতেন। তার একটি ভৃত্য বালককে তিনি সংগীতে এমন পারদর্শী করে তুলেছিলেন যে সে একসময় সংগীতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। আদিল শাহ তাকে মুজাহিদ খান নাম দিয়েছিলন এবং দশ হাজারের একটি বাহিনীর অধিনায়ক পদে উন্নীত করেছিলেন।

আনন্দ ফূর্তি, নাচগান এবং নারী সঙ্গে বাজ বাহাদুর এতই মত্ত থাকতেন যে তার পক্ষে দিবা-রাত্রি পার্থক্যটাই দুরূহ ছিল।[৩৫] তিনি তার দরবারে নয়শত শিল্পী, সংগীতজ্ঞ ও নর্তকীর সমারোহ ঘটিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে রূপমতি ছিল রূপে, গুণে, কলা কুশলে অন্যতম। তিনি বিভিন্ন ধরনের রাগেও পটু ছিলেন এবং প্রেমের অনেক গানও লিখেছিলেন। তার সময়ে সংগীত বেশ প্রসারিত হয়েছিল। ১৫৬১ খ্রি. সম্রাট আকবর মালওয়া জয় করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে বাজ বাহাদুর তখন আনন্দ ফূর্তিতে এত বিভোর ছিলেন যে সেই সৈন্যদল মালওয়ার রাজধানী সারংপুরের অতি নিকটে মাত্র তিন মাইল দূরে আসার পর তার চৈতন্যোদয় হয়।

মোগল ঐতিহাসিকেরা নাচগানের ক্ষেত্রে বাজ বাহাদুরের পারদর্শিতা বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সংগীতে 'বাজখানী' নামে এক ধরনের কলার প্রচলন তার মাধ্যমে হয়। তিনি ধ্রুপদী রাগ পরিবেশন করলেও খেয়াল রাগের অধিক উৎকর্ষ সাধন করেন। বাজ বাহাদুর এতটাই ইন্দ্রিয়বিলাসী দক্ষ নটিয়ে ছিলেন যে তার নারী নর্তকীদের সাথে নিজেকে কৃষ্ণের ন্যায় বৃন্দাবনে গোপীর সাথে নাচের ভাবমূর্তি কল্পনা করতেন। সুতরাং বাজ বাহাদুর নিঃসন্দেহে একজন উচ্চমার্গীয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের উদার ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

বাংলার সুলতান আলা আল দিন হুসেন শাহের শাসনকালে জৌনপুরের পতন ঘটে। উল্লেখ্য জৌনপুরের সুলতানের নামও ছিল আলা আল দীন হুসেন শাহ আর তার রাজ্যকে বলা হতো সার্কী রাজ্য। তাই তার নামের শেষে সার্কী যুক্ত করে জৌনপুরের সুলতানকে বলা হতো আলা আল দীন সার্কী। তাঁর সাম্রাজ্যের পতন হলে তিনি বাংলায় পালিয়ে এসে বাংলার সুলতানের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বাংলার সুলতান জৌনপুরের সুলতানকে মর্যাদা সহকারে আশ্রয় দেন। সার্কী বাংলায় প্রবেশ করার সময় কিছু সংখ্যক সূফি, সাধক, কবি এবং সংগীতজ্ঞ শিল্পীদের নিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক হালিমের মতে, "হুসেন শাহ সার্কী সংগীত গুরু ছিলেন। সংগীতে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে তার সৃষ্ট 'হুসেনী তৌদি' বা 'জৌনপুরি তৌদি', 'আচাড়ী তৌদি,' 'হুসেনী কানাড়া' এবং বারো প্রকারের শ্যামার লয় উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানেরা নিজেদের ভঙ্গীমায় খেয়াল সংগীতের প্রবর্তক ছিলেন। তার প্রচেষ্টাতেই এই সংগীত বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। দরবারি পৃষ্ঠপোষকতায় বহুগামী সমাজে সংগীত, শিল্পকলা এবং নৃত্যের প্রভাব এমনভাবে বিস্তার ঘটে যে সমাজের অমাত্যবর্গ এবং স্বচ্ছল শ্রেণির ব্যক্তিরা এই শিল্পসমূহকে অবসর সময় কাটানোর উপায় হিসেবে উৎসাহ দিতে থাকেন। ফলে শহরে বন্দরে বিভিন্ন জায়গায় নাচগানের আসর, জুয়ার আখড়া, মদের দোকান ইত্যাদি গড়ে ওঠে। একই সাথে সে সব স্থানে সমাজের এমন সব লোকদের আনাগোনা পরিলক্ষিত হয় যাদের একান্তভাবে স্বীয় বাসগৃহে এসব আসর বসানোর সামর্থ্য ছিল না। ইসলামী শরিয়াহ ও বিধি বিরোধী এ সকল কার্যকলাপকে প্রতিহত করার জন্য সরকার থেকে 'মুহতাসিব' নিয়োগ করা হলেও তিনি এক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় রাখতে পারেননি। বাংলায় আফগান সুলতানেরা এধরনের কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য স্থানে আফগানরাই নৃত্য ও সংগীতের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাই ধারণা করা যায় যে বাংলায়ও তারা সংগীত ও নৃত্যের অনুরূপভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

হুসেন শাহী শাসনকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তরফদার বলেন সমসাময়িক বাংলা উৎস থেকে বলা যায় তৎকালীন শাসকেরা সভাকবিদের আবৃত্তি করা পৌরাণিক গল্প ও কাহিনি শুনতেন। মোগল কবিদের মধ্যে যশোরাজ খান, কবিন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীবর নন্দী এবং শ্রীধর রাজদরবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস দুজনই সর্প পূজার কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেন। তারা দরবারে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বলে মনে না হলেও হুসেন শাহের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকেননি। জন মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগের কারণে মোগলকরণের পরে এসব সুলতান বাংলা ভাষাকে পূর্ণ সহযোগিতা ও উন্নতি, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে সাহায্য করেছিলেন। প্রাক মুসলিম বাংলায় সংস্কৃত ভাষা যে ভূমিকা রেখেছিল, বাংলা ভাষা তখন সেই ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।[৩৬] তিনি আরো বলেন যে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে যে ক্রমবিকাশ ঘটেছিল তাতে জৌনপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে হয়। সিকান্দার লোদীর কাছে পরাজিত হয়ে হুসেন শাহ সাকী খালগাঁয়ে অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত বাংলায় তার সাথে কিছু কবি, সূফি, সাধকও এসেছিল। এমনই এক আগমনকারী হচ্ছেন কুতুবন যিনি ৯৩৯ হিজরি (সঠিক হচ্ছে ৯০৯ হি:)/১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মৃগবর্তী' নামে হিন্দিতে একটি রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন।[৩৭]

বাংলায় আফগানদের ইতিহাস ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন ও শান্তি-অশান্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা অবাধে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়ে লিখিত দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী-মজনু', শাহ মুহম্মদ ছগীর এর 'ইউসুফ-জোলেখা' তারই সাক্ষ্য বহন করে। বাংলায় লিখিত লাইলী মজনু, ইউসুফ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জোলেখা এবং কুতুবনের হিন্দিতে রচিত 'মৃগবতী' বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ধারার বিকাশের উজ্জল প্রমাণ। সেই সময়ের সংগীতজ্ঞরা সূর ও বাণীর ক্ষেত্রে নতুন নতুন রাগ আবিষ্কার করেন এবং শাসক ও শাসিতের মনে এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।

মেহেদীবাদী আন্দোলন উপমহাদেশে ইসলামের ধর্মীয় শুদ্ধতার রূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ১৪৯৪ খ্রি. জৌনপুরের সার্কী শাসনের পতনের পর থেকে এই আন্দোলন উচ্চ-নিচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সর্বত্র শিক্ষিত মুসলমানদের মনে এ ধারণা হতে থাকে যে মেহেদীর আবির্ভাব হবে এবং তিনি মুসলমানদের ক্ষয়িষ্ণু নৈতিকতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন। জৌনপুরের মীর সাইয়েদ মুহাম্মদ এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি নিজেকে মেহেদী দাবি করেন এবং তার বেশ কিছু অনুসারীও তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আলেমরা তাকে ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করেন এবং উত্তর ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন। মীর সাইয়েদ মুহাম্মদ ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে বেলুচিস্তানে ফারহ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৮]

মৃত্যুবরণ করলেও মীর সাইয়েদ এর আন্দোলন চলমান থাকে। তার একজন আফগান শিষ্য মোল্লা আব্দুল্লা নিয়াজী[৩৯] আন্দোলনে যোগ দিলে তাতে গতি সঞ্চারিত হয়। শেখ আলাই আন্দোলনে যোগ দিয়ে একে আরো বেগবান করেন। শেখ আলাই[৪০] ছিলেন প্রখ্যাত মোগল শাইখ (মুসলিম ধর্মীয় নেতা) শেখ হাসানের ছেলে। তিনি গৌড়ে বাস করতেন। বাল্যকাল থেকেই তার ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের পূর্বাভাস ছিল। তিনি ইসলামী শিক্ষায় পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও তর্কবাগীশ ছিলেন। তার পিতার মৃত্যুতে তিনি ইহজাগতিক আরাম আয়েশ ত্যাগ করে পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শাইখ এর অবস্থান দখল করেন। মোল্লা আবদ আল্লা নিয়াজীর সাথে তার যোগাযোগ ও সংশ্রব তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনে। তিনি মেহেদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্ত্রীকে জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করে তাকে সঙ্গ দিতে বলেন। শেখ আলাই গৌড় ত্যাগ করে দিল্লি অভিমুখে সফর করেন এবং দিল্লির সন্নিকটে বায়ানা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তিনি বাংলা থেকে চলে এসে এবং সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্রদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শেখ আলাই মেহেদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পর আন্দোলন যেমন গতিশীল হয় তেমনি তার প্রভাব ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বায়ানার বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় প্রচার প্রচারণায় লিপ্ত হন। ধীরে ধীরে তিনি জঙ্গিবাদী হয়ে ওঠেন। তার দলের কাছে প্রচুর টাকা পয়সা থাকতে পারে ভেবে ডাকাতদের আক্রমণ হতে পারে এই শঙ্কায় বাংলায় তিনি তার দলীয় লোকজনকে আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার সাথে রাখতে পরামর্শ দেন। সমাজে অনৈতিক কাজ প্রতিহতের জন্য রাজকর্মচারী থাকা সত্ত্বেও শেখ আলাই নিজেই সমাজে বিভিন্ন স্থানে অনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বাধা দিতেন। তিনি বাজার পরিদর্শন করতেন এবং ইসলামে নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ বলপূর্বক সরিয়ে ফেলতেন। জনসাধারণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্যে নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার দায়িত্বে নিয়োজিত মুহতাসিবের মতো তিনি ইসলামী শরিয়া বিরোধী কার্যক্রমে রত ব্যক্তিদের সাবধান করে দিতেন। বাদাউনীর মতে[৪১] শেখ আলাই মুসলিম সমাজকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালনার জন্য সুলতানের আদেশ ব্যতীত নিজেই নির্দেশনা প্রদান করতেন। তিনি তার কর্মকাণ্ড শুধু বায়ানাতেই সীমিত রাখেননি বরং তিনি প্রকাশ্যেই সবার জন্য নসিহত করতেন। ফলে সমাজের সকল শ্রেণির লোকদের মধ্যে তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আব্দুল্লাহ সুলতানপুরী ছিলেন রাজধর্মগুরু। অবস্থার এ পরিবর্তন দেখে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি শেখ আলাইকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এন.বি. রায় লিখেছেন তার প্রকাশ্য ধর্ম প্রচারণা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই রাজ ধর্মগুরু আব্দ আল্লা সুলতানপুরী ইসলাম শাহকে এই ধর্মদ্রোহী শিকড় গেড়ে বসার আগেই দমনের পরামর্শ দেন।[৪২] শেরশাহের বয়োজ্যেষ্ঠ সেনাপতি খাওয়াস খান শেখ আলাইয়ের অনুসারীদের অন্যতম ছিলেন। আলাই রাজদরবারে ওলামা মাশায়েখদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং সমাজে ও রাজদরবারে উভয় স্থানেই তাদের বিরোধিতা করতে থাকেন। রহিমের মতে, "গোঁড়া ওলামাবৃন্দ, যারা রাজ ধর্মগুরু হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং সুলতানকে সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, তারা শেখ আলাইকে নিজেদের অবস্থানের বিপক্ষে বিরাট হুমকি মনে করলেন।"[৪৩]

সুতরাং সুন্নী ইসলাম রক্ষার অজুহাতে ওলামারা নিজেদের স্বার্থ, ক্ষমতা ও দাপট বজায় রাখতে শেখ আলাই এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। ওলামাদের চাপ সত্ত্বেও ইসলাম শাহ শেখ আলাই এর প্রতি সদয় ছিলেন বলেই মনে হয়। রহিম বলেন, "তিনি নিজেও সমাজে সংস্কার করতে চেষ্টা ছিলেন এবং মুসলিম সমাজ ও রাজদরবারকে এই সব ওলামাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার চিন্তা করেছিলেন। ওলামাদের বিরুদ্ধে ইসলাম শাহ ও মেহেদীবাদী আন্দোলনকারীদের মধ্যে এখানে একটা মিল পাওয়া যায়।[৪৪] সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ফিরিয়ে আনতে শেখ আলাই এর মতো লোকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মেহেদীবাদী আন্দোলন পরিত্যাগ না করা ও রাষ্ট্রীয় মুহতাসিবের চাকুরি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকায় শেখ আলাই এর অবস্থান তাকে মোল্লা আব্দুল্লাহ সুলতানপুরীর ফতোয়া অনুযায়ী ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে শেখ আলাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং শেখ বুধের সম্মতিক্রমে তা কার্যকর করা হয়।

বিহারের শেখ বুধ আলোচ্য সময়ের ওলামা মাশায়েখদের অন্যতম ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তার নাম শেখ আলাই এর মৃত্যুদণ্ড ও শেখ বুধকে এই দণ্ড কার্যকরে সম্মতিদানে ইসলাম শাহের আদর্শের সাথে যুক্ত করেছেন। ইসলাম শাহ কর্তৃক শেখ বুধের নিকট থেকে শেখ আলাই এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চূড়ান্ত অনুমোদন চাওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। শেখ বুধ তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন হয়ে উঠেছিলেন বিধায় দিল্লি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন শেখ আলাই বিহারে শেখ বুধের বাসস্থানের নিকটে পৌঁছান তখন সেখানে শ্যামা (আধ্যাত্মিক গান বাজনার আসর) পরিবেশন চলছিল। শেখ আলাই যে কোনো ধরনের সংগীত বা বাদ্যযন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে বোঝা যায় যে শেখ বুধ চিশতিয়া সাধকদের মতো আধ্যাত্মিক মার্গ অর্জনের লক্ষ্যে শ্যামা সংগীত চর্চা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শেখ বুধ শেখ আলাই এর জ্ঞান ও ধর্মীয় পরিপূর্ণতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাদাউনীর মতে, "তিনি ইসলাম শাহকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন যে মেহেদীবাদী আন্দোলন বা মেহেদীর বিষয়টি দূরূহ ও জটিল এবং মেহেদীকে চিহ্নিত করা নিয়ে যেহেতু মতপার্থক্য রয়েছে তাই তাকে (শেখ আলাইকে) ধর্মদ্রোহী হিসেবে শাস্তি দেওয়া যায় না।"[৪৫]

অপরদিকে শেখ বুধের সন্তানেরা আশংকা করলেন যে বৃদ্ধ বয়সে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বাবাকে দিল্লি ডেকে পাঠাতে পারে। তাই তারা প্রথম সিদ্ধান্তটা রহিত করে অন্য এক চিঠির মাধ্যমে মাওলানা আব্দুল্লা সুলতানপুরীর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেন।[৪৬] চিঠিটি সিলগালা করে শেখ আলাই এর হাতে তুলে দেওয়া হলো। তিনি চিঠিটি নিয়ে ইসলাম শাহের দরবারে উপস্থিত হলেন। উলেমাদের দ্বারা ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড এই চিঠি প্রাপ্তির পরপরই কার্যকর করা হয়। শেখ আলাই এর মৃতুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মেহেদীবাদী আন্দোলনের যবনিকা ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, আফগানদের শাসনামলে বাংলায় ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় গুরুদের (পীর দরবেশ) প্রভাব ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল। বাংলার আলেম সমাজ (ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত) অথবা আধ্যাত্মিক গুরুরা (পীর, দরবেশ) বাংলার বাইরেও বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। মুসলিম সমাজ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর পীর দরবেশগণের প্রভাব ধর্মের আরেকটি দিক অর্থাৎ সূফিবাদ চর্চার ব্যাপক সহায়ক হয়। বাংলায় আরবি অথবা ফার্সি ভাষায় আধ্যাত্মিক জীবন চর্চায় লিখিত সাহিত্য খুব কমই পাওয়া যায়। বাংলায় জনৈক আব্দুর রহমান নামের এক ব্যক্তি ফার্সি ভাষায় সূফিবাদের উপর 'গঞ্জ-ই-রাজ'[৪৭] নামক কবিতা ৯৬৬ হিজরি/১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন। এটি ৪২টি অংশে বিভক্ত। প্রথম দুটি অংশে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (স.) সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে। শেষাংশে সন্নিবেশিত আছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন পুস্তকটি কবে, কোথায় এবং কার রাজত্বকালে লিখিত হয়। এ ছাড়া অন্যান্য অংশে তিনি যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হচ্ছে পীরের প্রয়োজন কেন, পীরের প্রতি শিষ্যের করণীয় কী; আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা; রাসুল (স.) এর জন্ম বৃত্তান্ত; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর; নিভৃতে ৪০ দিনের (এক চিল্লার) আধ্যাত্মিক চর্চার নিয়মাবলী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ইত্যাদি।[৪৮]

সুতরাং দেখা যায় যে, তৎকালীন বাংলার হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজই আধ্যাত্মিক ইসলামের প্রভাব বলয়ে এসেছিল। আফগান শাসক শ্রেণির উপর ও ওলামা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাশায়েখদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। শাসক শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় ভাষা, সাহিত্য, নাচ, গান, বাজনার উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে আফগান ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে এমন সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে আফগানদের সামরিক দিক থেকে পরাজিত করার পরও মোগলদের প্রায় অর্ধশত বছর লেগেছিল বাংলাকে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পেতে।

পাদটীকা ও সূত্রসমূহ

১. কানুনগো শেরশাহ এণ্ড হিজ টাইমস, কলি : ১৯৬৫, পৃ. ৩১৯
২. এই পদ্ধতি প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল যেমনটি ড. করিম তার লিখিত 'সোসাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন। ২য় সংস্করণ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃ. ১৮৯
৩. আই, এইচ, কোরেশী 'দি এডমিনিষ্ট্রেশন অব দি সালতানাত অব দিল্লি', দিল্লি ১৯৭১, পৃ. ৩৮। আরো দেখুন পরিশিষ্ট-বি, পৃ. ২৩১
৪. করিম 'দি ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অব চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম', চট্টগ্রাম, ১৯৭৯, পৃ. ৭১-৭৪
৫। হুসেন শাহী বেঙ্গল, ঢাকা ১৯৬৫, পৃ. ২৩৯-২৪০
৬. কানুনগো : পৃ. ৩১৯-৩২১
৭. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ১৫৮-১৫৯
৮. 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল', ১৮৭৫, পৃ. ৩০৩
৯. নিমাত আল্লা ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫
১০. সারওয়ানী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮
১১. কানুনগো পৃ. ৩। তিনি লিখেছেন 'মধ্যযুগীয় পাঠান সমাজ সম্প্রদায়হীন হলেও শ্রেণিহীন ছিল না'
১২. উপরোল্লিখিত পৃ. ২
১৩. উপরোল্লিখিত পৃ. ৩
১৪. পবিত্র কোরআন সূরা ৪৯ আয়াত ১৩ (সূরা আল হাজরাত, আয়াত ১৩) এখানে আরবি উদ্ধৃতি আছে
১৫. মির্জা নাথান 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'। বোরাহ কর্তৃক ইংরেজিঅনুবাদ, আসাম ১৯৩৬; খণ্ড-১, পৃ. ১৯৪। 'কবি কংকন কর্তৃক উল্লেখিত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী যেমন পাঠান, সুবালি, নেহালী, পানি, ভুদানি ইত্যাদি সম্ভবত হুসেন শাহী শাসনকালেও টিকে ছিল' লিখেছেন তরফদার তার 'হুসেন শাহী বেঙ্গল'গ্রন্থে;পৃ. ৩১২।আরো দেখুন পৃ.৩৪৩ এর পাদটীকা-১। পণ্ডিত বলেছেন "এটা লক্ষ্যণীয় যে ফার্সি ভাষার শব্দ 'সার-ই-খাইল' রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে গৃহকর্তার সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে
১৬. টি.কে. রায় চৌধুরী : 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর এন্ড জাহাঙ্গীর', দিল্লি ১৯৬৯, পৃ. ২৮
১৭. করিম 'দি ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অব চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম' ১৯৭৯, পৃ. ৭১-৭৪। 'দি জার্নাল অব দি নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' খণ্ড- ২৭ অংশ-১, ১৯৬৫ পৃ. ৬৭-৭০। ভট্টশালী 'ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি কালেকশন অব হাকিম হাবিবুর রহমান এন্ড প্রেজেন্টেড টু দি ঢাকা মিউজিয়াম', ঢাকা ১৯৩৬, পৃ. ৭-১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮. সারওয়ানী ২য় খণ্ড পৃ. ১৫৮-১৫৯; আই, এইচ কোরেশী 'দি এডমিনিস্ট্রেশন অব সালতানাত অব দিল্লি', ১৯৭১, পৃ. ১৮৪
মাখদুম-উল-মুলক শেখ আব্দুল্লা সুলতানপুরী (সদর-উস-সুদুর) এবং সুলতান (ইসলাম শাহ) একদিন সংকীর্ণ পথে যাচ্ছিলেন যখন একটি ক্ষিপ্ত হস্তী তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে। সদর এগিয়ে যেতে চাইলে সুলতান তাকে নিষেধ করেন। পণ্ডিত বলেন, "হে সম্রাট, আমাকে এগিয়ে যেতে দিন কারণ যদি আপনি নিহত হন পুরো রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।" সুলতান উত্তর দিলেন, প্রভু আপনি বুঝতে পারছেন না যে আমাকে প্রতিস্থাপনের জন্য নয় লক্ষ আফগান আছে কিন্তু আপনি যদি ধ্বংস হয়ে যান তাহলে আপনার মতো আরেকজন ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ জন্ম নেবে না। এই ঘটনা শিক্ষা এবং শিক্ষিতদের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধার বাস্তব উদাহরণ

১৯. চণ্ডীদাস মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, "কয়েকজন মুসলমান তাদের খাবার একই জায়গা এবং একই পাত্র থেকে নিয়েছেন।" উদ্ধৃতি রহিম 'সোশাল এন্ড কালচার হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' : খণ্ড-১, করাচী ১৯৬৩, পাদটীকা-৩

২০. তরফদার : পৃ. ১৮৯-১৯৮

২১. সারওয়ানী : ২য় খণ্ড পৃ. ১৫৭-১৯২

২২. সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃ. ১১৪। আরো দেখুন করিম সোশাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, চট্টগ্রাম : ১৯৮৫ পৃ. ১৯৩

২৩. করিম পৃ. ১৯১-১৯৭

২৪. সারওয়ানী : ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬

২৫. করিম পৃ. ২০৪-২০৫। কবি কঙ্কন চণ্ডী পৃ. ৮৬। তিনি লিখেছেন রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা। কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটক। (২১ লাইনের বাংলা কবিতার উদ্ধৃতি)

২৬. উপরোল্লিখিত : পৃ. ২০৫

২৭. সারওয়ানী ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯। তিনি লিখেছেন" "কিছু আফগান যারা ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ভিখারী হয়েছিল তাদের সৈনিক তালিকাভুক্ত করে সে অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল; আর যারা সৈনিক তালিকাভুক্ত হয়নি বরং ভিক্ষাবৃত্তির জীবন বেছে নেয় তাদের মেরে ফেলা হয়েছিল

২৮. আর. ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাস : ২য় খণ্ড, কলি ১৯৭৪ পৃ. ২৪০

২৯. এন.বি. রায় : দি সাকসেসরস অব শেরশাহ, ঢাকা ১৯৩৪, পৃ. ৪৪

৩০. ই. হক : 'বঙ্গে সূফি প্রভাব', কলি ১৯৩৫, পৃ. ১৫০

৩১. আই. এইচ কোরেশী : 'দি এডমিনস্ট্রেশন অব দি সালতানাত অব দিল্লি', দিল্লি ১৯৭১, পৃ. ১৮৭

৩২. এ. সাঈদ : এ লিগ্যাল প্রনাউন্সমেন্ড অন শ্যামা জার্নাল অব দি ইতিহাস সমিতি খণ্ড-২, ঢাকা ১৯৭৩। পৃ. ৬৭-৯২

৩৩. নিমাত আল্লা : খণ্ড -১, পৃ. ৩৭৮-৩৮৭

৩৪. উপরোল্লিখিত পৃ. ৩৮৩

৩৫. হালিম 'হিস্ট্রি অব দি লোদী সুলতানস অব দিল্লি এন্ড আগ্রা,' ঢাকা ১৯৬১, পৃ. ১২৬-১২৭। হালিম : হিস্ট্রি অব ইন্দো-পাক মিউজিক' ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ১৮-১৯

৩৬. সারওয়ানী : খণ্ড-২, পৃ. ৬৬

৩৭. রহিম : ' হিস্ট্রি অব দি আফগান ইন ইন্ডিয়া', করাচী, ১৯৬১, পৃ. ১৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৮. বাদাউনী : 'মুন্তাখাব আল তাওয়ারিখ' ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬
৩৯. রহিম : পৃ. ১৫১। নিমাত আল্লা : পৃ. ৩৮৯
৪০. উপরোল্লিখিত : পৃ. ১৫১। নিমাত আল্লা : খণ্ড-১, পৃ. ৪০৬-৪০৮
৪১. হালিম 'হিস্ট্রি অব ইন্দোপাক মিউজিক' ঢাকা ১৯৬২, পৃ. ৬৬-৬৭। তরফদার পৃ. ২৯৪-২৯৫
৪২. তরফদার : পৃ. ২৪০
৪৩. উপরোল্লিখিত : পৃ. ২৫৪
৪৪. নিমাত আল্লা : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯। পাদটীকা : ২, রহিম : পৃ. ১৫৪
৪৫. উপরোল্লিখিত : খণ্ড-২ পৃ. ৩৭৯। উপরোল্লিখিত : পৃ. ১৫৭-১৫৮
৪৬. এন.বি. রায় : পৃ. ৪৪। উপরোল্লিখিত ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮, পাদটীকা-১
৪৭. রহিম : উদ্ধৃতি পৃ. ১৫৫
৪৮. এন.বি.রায় : পৃ. ৪৮
৪৯. রহিম : পৃ. ১৫৬
৫০. নিমাত আল্লা : খণ্ড-১, পৃ. ৩৮৩-৩৮৫। রহিম : পৃ. ১৫৬-১৫৭
৫১. এন.বি. রায় : পৃ. ৫১
৫২. বাদাউনী : 'মুনতাখাব আল তাওয়ারিখ': ইংরেজি অনুবাদ কৃত : র‍্যাংকিং, পৃ. ৫২২-৫২৪
৫৩. সুলতানী আমল : করিম : পৃ. ৫২২
৫৪. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৫২২
৫৫. উপরোল্লিখিত : পৃ. ৫২২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়
উপসংহার

বাংলা বিজয়ের অনেক আগেই এ অঞ্চলে আফগানদের উপস্থিতি ছিল। তারা মুসলিম বিজয়ী বাহিনীর সাথে এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। এদের কেউ কেউ এখানেই স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে থাকে; আবার কেউ প্রশাসক এবং সরকারী চাকুরে হিসেবে সম্মানজনক অবস্থানে নিজেদের উন্নত করে।

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন জহির আল দীন মহম্মদ বাবর দিল্লি দখল করেন তখন মোগলরা পুর্বে পলায়মান দিল্লি ও আগ্রা থেকে উৎপাটিত লোদী আফগানদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে। জীবন রক্ষার্থে আফগানরা বাংলায় প্রবেশ করে। মোগলরা তাদের পশ্চাৎধাবন করে এবং বাংলার সুলতানদের শাসনাধীন পশ্চিম সীমান্ত খরিদ এ এসে অবস্থান নেয়। সুলতানদের নিকট তথায় অবস্থানরত আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করে। এই লক্ষ্যে বাবর বাংলার সুলতান নুসরাত শাহের সাথে চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন এবং বাঙালি সুলতানের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। কিন্ত সুলতান নুসরাত শাহ বাবরের ইচ্ছার সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে মোগল সৈন্যদের খরিদে প্রবেশ ও অবস্থানকে বাংলার সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করেন। মোগল সৈন্যরা খারিদ থেকে ফিরে যায় কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। মোগল সৈন্যদের খারিদ দখল ও অবস্থান শেষ পর্যন্ত বাঙালি সুলতান এবং মোগল সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করে। এই যুদ্ধে বাংলার সুলতান পরাজিত হলেও বাবরের দৃষ্টিতে বাঙালি সৈন্যদের দক্ষতা দারুণ প্রশংসিত হয় এবং তিনি অঞ্চলটি দখলের পরিবর্তে সুলতান নুসরাত শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে দিল্লি ফিরে যান।

শাসনকালের শেষের দিকে এসে নুসরাত শাহের নৈতিক স্খলন ঘটে এবং প্রজাদের উপর বিভিন্ন মাত্রার নিপীড়ন চালাতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পরপরই অতি উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবরাজ ও উচ্চপদস্থ অমাত্যবর্গের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ক্ষমতার জন্য প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র স্বার্থপরতা সব ধরনের কৌশল তাদের আচ্ছাদিত করে। 'দরবারী কূটচাল' অমাত্যদের ছোটো ছোটো দল উপদলে বিভক্ত করে ফেলে। বাংলার সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে যখন সার্বজনীন ঐক্য, ন্যায়পরায়নতা, সতর্কতা এবং সম্মিলিত প্রয়াসের সর্বাধিক প্রয়োজন, তখন এই বিভক্তি দেশকে সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে দেয়। এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বাংলার সুলতানের হাজীপুরের প্রভাবশালী গভর্নর মাখদুম-ই-আলম সমর্থিত গোষ্ঠী সদ্য প্রয়াত

~ www.amarboi.com ~

সুলতান নুসরাত শাহের পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজকে ক্ষমতায় অধিষ্টিত করে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ফিরোজকে হত্যা করে তার চাচা মাহমুদ নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। মাখদুম-ই-আলম সুলতান মাহমুদ শাহের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ফলে সুলতান মাহমুদ শাহ কুতুব খানকে সেনাপতি করে মাখদুম-ই-আলমের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। এই যুদ্ধে মাখদুম-ই-আলম পরাজিত ও নিহত হন। মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খ্রি. কুতুব খানকে বিহার দখল করতে নির্দেশ দেন।

এভাবেই বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ বিহারের সুলতান জালাল খান লোহানীর গৃহ শিক্ষক শের খান (পরবর্তীকালে শেরশাহ) এর সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। কুতুব খানের বিহার দখলের অভিযান ব্যর্থ হয় এবং তিনি এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সুলতান মাহমুদ শাহ অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রতিশোধ গ্রহণে পরের বছর ১৫৩৪ খ্রিটাব্দে কুতুব খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে সেনাপতি করে পুনরায় বিহার অভিযানে প্রেরণ করেন।এই অভিযান ও ব্যর্থ হয়। ইব্রাহিম খান ও তার পিতার মত একই ভাগ্য বরণ করেন। শেরশাহের নিকট এই দুই ধারাবাহিক পরাজয়ে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষমতার জন্য অন্তঃদ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থপরতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলার শক্তিশালী সেনাবাহিনী যারা একদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত করেছিল, তাদেরই এমন মারাত্মকবাবে অপমানিত ও ধ্বংস হতে হয়েছিল যে পর্তুগিজদের সহায়তা নিয়েও শেরশাহের গৌড় অভিযান প্রতিহত করতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে শেরশাহের বঙ্গ বিজয় ছিল ১৫৩৩ সাল থেকে ১৫৩৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ফসল। ১৫৩৩ সালে শেরশাহ বাংলার সেনাবাহিনীকে বিহারে এবং ১৫৩৪ সালে বাংলার আর একদল সেনাকে সুরুজগড়ে পরাজিত করেন। ১৫৩৫ সালে তিনি মুঙ্গের জয় করেন এবং ১৫৩৬ সালে বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করে বসেন। ১৫৩৭ সালে তিনি গৌড়ে পৌঁছান এবং মুক্তিপণ আদায় শেষে প্রত্যাবর্তন করেন। এর ফলে শেরশাহ তাঁর অধিকৃত এলাকাসমুহে সুলতান হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ১৫৩৮ সালে তিনি সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করেন এবং সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ন গৌড় আক্রমণ করে শেরশাহকে গৌড় থেকে বিতাড়িত করেন এবং নয় মাস অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে গৌড়ে অবস্থান করেন। শেরশাহ নিশ্চুপ সময় পার করেন নি বরং সম্রাট হুমায়নের অধিকৃত অঞ্চলের পশ্চাৎভাগ দিল্লি দিয়ে যাওয়ার পথটি দখল করে নেন। শেরশাহের এই কৌশলগত অবস্থানের ফলে হুমায়নের দিল্লি ফেরার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তিনি পরিস্থিতির জটিলতা উপলব্ধি করেন। পরে শেরশাহ চৌসার যুদ্ধে ১৫৩৯ সালে হুমায়নকে পরাজিত করেন এবং দ্রুততার সাথে বাংলা অভিমুখে আক্রমণ পরিচালনা করে দখলকারী মোগলদের সরিয়ে দেন। তিনি গৌড়

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুনঃদখল করেন এবং দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। তিনি খিদির খান সুর্ক কে বাংলায় তার পক্ষে গর্ভনর নিযুক্ত করে পশ্চিমে পুনরায় হুমায়নের পশ্চাৎধাবন করেন। ১৫৪০ সালে শেরশাহ সম্রাট হুমায়নকে বিলগ্রাম (জৌনপুর) এর যুদ্ধে পরাজিত করেন। ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ এবং পরে মোগল সম্রাট হুমায়নের শোচনীয় পরাজয় শেরশাহকে বাংলার পর দিল্লির মসনদে আসীন করে।

শেরশাহ দিল্লিতে অবস্থান করেই গৌড় এর গর্ভনর খিদির খান সুর্কের বিদ্রোহের সংবাদ পান। তিনি দ্রুততার সাথে বাংলার দিকে যাত্রা করেন। খিদির খানও পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী বেশে শেরশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাংলার পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হন। শেরশাহ তাকে দেখা মাত্র পদচ্যুত করেন এবং কাজী ফজিলতকে তার স্থলে নিয়োগ করেন। তিনি তার অনুগত আফগান অমাত্যদের বিভিন্ন সামরিক কর্মকতা ও জায়গিরদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কাজী ফজিলতকে তাদের সকলের গতিবিধির উপর নজরদারী করে তাকে অবহিত করার জন্য আদেশ দেন।

সুতরাং শেরশাহের গৌড় অভিযান নিস্কণ্টক ছিল না। একদিকে তাঁকে নিজ অনুগত গভর্নরদের বিদ্রোহ আর অন্যদিকে পরাজিত সুলতান মাহমুদ শাহের অনুগতদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়েছে। শেরশাহ বাংলাকে কোনো এক গর্ভনরের দায়িত্বে না ছেড়ে সম্মিলিতভাবে আফগান অমাত্যদের ও জায়গিরদারদের দায়িত্ব প্রদান করে কাজী ফজিলতকে নিজেই নিযুক্ত করেন প্রশাসনে তদারকীর জন্য। যেহেতু আফগান জায়গিরদাররা এবং স্থানীয় অমাত্যরা ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন, এই অবস্থাকেই 'মুলুক আর তাওয়াইফ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শেরশাহের প্রশাসন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষগুলোকে এবং পর্তুগিজ বণিকদের মোকাবিলা করেন। বাংলা আফগানদের জন্য নতুন আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর এভাবেই শেরশাহ তার বাধাগুলোকে দূর করে সমগ্র বাংলায় তার কর্তৃত্ব সুসংহত করেন।

শেরশাহ ছিলেন একজন মহান শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসক ও রাষ্ট্র নায়ক। তিনি এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো রচনা করেছিলেন যা শুধু তাকেই বাঁচিয়ে রাখেনি বরং পরবর্তী মোগলদের জন্য একটা আদর্শ মডেল হিসেবে অনুকরণীয় ছিল। তার নির্মিত গ্রান্ড ট্র্যাংক রোড, অনেকগুলো শেরপুর এবং শেরগড় আজও তার সময়ের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। তার নির্মিত সরাইখানার কথা লোকের মুখে মুখে প্রচালিত। শেরশাহ তার সফল উত্তরসুরী হিসেবে তার পুত্র ইসলাম খানকে যথাযথভাবে প্রশাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লির আফগান সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। শামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজী দিল্লি থেকে বাংলাকে স্বাধীন করে শাসন করতে থাকেন। মুহম্মদ শাহ গাজী এবং তার পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উভয়েই সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তারা দিল্লির সুলতান আদিল শাহের সাথে প্রতিযোগিতা করেন। পিতা পুত্র উভয়েই আরাকান আক্রমণ করে আরাকান সম্রাটকে পরাস্ত করেন এবং রাজ্যের একাংশ দখল করে নেন। তাদের এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে আরাকান টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়।

সূরদের অনুসারী কররানীরাও (শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ এর দলভুক্ত) বেশ কয়েক বছর সফলতার সাথে বাংলা শাসন করেন। সুলায়মান কররানী একজন প্রতিভাবান শাসক ছিলেন যিনি তার তীক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে বাংলায় মোগলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্ত তার পুত্র দাউদ শাহ একই পরিস্থিতিতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি। তার দুর্বলতা, বিশেষত তার অযোগ্যতা সম্রাট আকবরের সম্প্রসারণবাদী কৌশলের সাথে একত্রিত হয়ে আফগানদের পতন ও মোগলদের বঙ্গ বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়।

বাংলার এই আফগান শাসকেরা অত্যন্ত সফলতার সাথে পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিহত করেন। হুসেন শাহী বংশের সুলতান মাহমুদ শাহ শেরশাহের বিপক্ষে যুদ্ধে পর্তুগিজদের সামরিক মিত্র ছিলেন। তিনি তাদের সাতগাঁও এবং চট্টগ্রামে তাদের নিজস্ব কারখানা এবং রাজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ছাড়ও দিয়েছিলেন। আফগানরা বাংলায় একটা প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। যদিও তাদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হতো তারপরও তাদের কিছু শান্তিকালীন সময় ছিল যা তারা প্রজাকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের ও উন্নতি হতে থাকে। কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই বাংলা ভাষার উন্নয়ন চলতে থাকে। কমপক্ষে দুই জন মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ও দৌলৎ উজির বাহরাম খানের নাম পাওয়া যায় যাঁরা বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। আফগানরা ধর্ম নিরপেক্ষ বা ধর্মানুরাগী পণ্ডিত ও বিদ্যা চর্চার ভাল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১] শাসকেরা সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করে এবং বাঙালিদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তারা স্থানীয় মানুষের খুব কাছে আসতে সক্ষম হন। এই সম্পর্ক বাংলার মানুষকে শক্তি যোগাতো। যখন শাসন ক্ষমতা আফফগানদের হাত থেকে মোগলদের হাতে চলে যায় তখন আফগানরা বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে এবং শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে কয়েক দশক ধরে এই স্থানীয় মানুষেরাই মোগলদের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে সমস্যার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার যুদ্ধে এই স্থানীয় আফগানরা বাঙালিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টীকা এবং সূত্র

১. বাংলার বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম ঈশা খান, যিনি মোগলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন, তাঁর কামানের গায়ে বাংলা লেখা ছিল

"সরকার শ্রীযুত ঈশা খাঁন মসনদাল্বি সন হিজরি ১০০২" বাংলায় উৎকীর্ণ এই লেখা স্পষ্টভাবে আফগানদের স্থানীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং এই ভাষা চর্চার প্রমাণ বহন করে। এ জন্য দেখুন : "Bengal Past as Present, Vol- xxxviii, Cal-1928"-এর ৩য় পৃষ্ঠা ছবি নং-৭। ঈশা খানের বাংলায় উৎকীর্ণ লেখা সম্বলিত সেই কামান ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে এখনো সংরক্ষিত আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

ফার্সি ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, ঐতিহাসিক বিবরণী

১.	খান সারওয়ানী	তারিখ-ই-শেরশাহী ১০০৫ হিজরি/১৫৮৭ খ্রি. সংকলিত। ইংরেজি অনুবাদ এলিয়েট এবং ডাউসনের গ্রন্থে হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওউন হিস্টোরিয়ান ৪র্থ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭২। মূল পাঠ সম্পাদিত এবং অনূদিত এস.এম ইমামুদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সাল
২.	আব্দ আল্লা	তারিখ-ই-দাউদী; সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সংকলিত, ১৫৭৬ সাল দাউদ শাহের পরাজয় ও মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণনাকৃত। মূল পাঠ সম্পাদিতঃ শেখ আব্দুর রশিদ, আলিগড়, ১৯৫৪। ইংরেজি অনুবাদ এলিয়ট এবং ডাউসন এর গ্রন্থ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ঔন হিস্টোরিয়ানস খণ্ড-৪
৩.	আবু তুরাব আলী	তারিখ-ই-গুজরাট। ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সংকলিত মূলপাঠঃ বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ কলিকাতা-১৯০৭
৪.	আহমদ ইয়াদগার	তারিখ-ই-শাহী বা তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানা; মূলপাঠ সম্পাদিত এম, হেদায়েত হোসেনঃ বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজঃ কলিকাতা-১৯৩৯। ইংরেজি অনুবাদ এলিয়ট এন্ড ডাউসন খণ্ড-৫, লন্ডন, ১৮৭৩
৫.	আবুল ফজল আল্লাসী	আইন-ই-আকবরী বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ ১৮৭৭ খণ্ড-১ অনুবাদকৃত এইচ, ব্লকম্যান এন্ড এইচ, এস, জারেট ১৮৯১; খণ্ড-২ এবং খণ্ড-৩ যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত ও টিকাসংযুক্ত। কলিকাতা ১৯৪৮-৪৯ আকবরনামা, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ ১৮৮৬। এইচ, বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত, ১৯০২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬.	আব্দ আল কাদের বাদাউনী	মুন্তাখাব আল তাওয়ারিখ/মৌলভী আহমদ আলী কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ : কলিকাতা-১৮৬৮। জর্জ এস,এ, র‍্যাংকিং এবং স্যার ডব্লিউ হেগ কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ, ১৮৯৮ এবং ১৯২৫
৭.	আব্দ আল বাকী নিহাবান্দী	মা'বির-আল-রাহিমি ১১০৩ হিজরি/১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত; মূলপাঠ বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ : কলিকাতা-১৯২৪-৩১
৮.	আব্দ-আল হামিদ লাহোরী	বাদশা নামা, ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সংকলিত মূলপাঠ বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজঃ কলিকাতা, ১৮৬৭-৬৮
৯.	আব্দ-আল-রাহমান	মাখজান-ই-গঞ্জ-ই-রাজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি যা ৯৬৬ হিজরি/১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত
১০.	আব্দ আল হক দেহলভী	আখবার আল-আখিয়ার-ফি-আসরার-আল-আবরার; দিল্লি, ১৩৩২ হিজরি, উর্দু অনুবাদ, করাচী, ১৯৬৩
১১.	আব্দ আল রাহমান (ওরফে শাহনেওয়াজ খান)	মিরাট-ই-আফতাবনামা, ১৮০৩ সালে রচিত
১২.	আব্দ আল-হক হক্কী	তারিখ-ই-হাক্কী বা জিকর-ই-মুলুক। এলিয়ট এবং ডাউসন কৃত এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ঔন হিস্ট্রোরিয়ানস, ৬ষ্ঠ খণ্ড
১৩.	বাবুর, জহির আল দিন মোহাম্মদ	ওয়াকিয়াতে বাবুরী বা বাবুর নামা; মূল তুর্কী পাঠ থেকে ইংরেজি অনুবাদঃ এস.এ বেভারিজ; লন্ডন, ১৯২১, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৭৯
১৪.	বুকানন হ্যামিল্টন	অজ্ঞাত পাণ্ডুলিপি, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল যা মার্টিন এর ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া গ্রন্থে সারাংশকৃত, ২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৮৩৮
১৫.	গোলাম হোসেন সেলিম	রিয়াদ-আল-সালাতিন। মৌলভী আব্দুল হক আবিদ কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিকা ইন্ডিকা সিরিজ, ১৮৯৩। আব্দুস সালাম কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, কলিকাতা ১৯০২, পুনর্মুদ্রণ দিল্লি, ১৯৭৫
১৬.	গুলবাদান বেগম	হুমায়ন নামা এ, এস, বেভারিজ কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরেজিতে অনূদিত; লন্ডন, ১৯০২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭.	গোলাম হোসেন তাবেতাবেয়ী:	সিয়ার-আল-মুতাখখারিন মুল পাঠ ১৮৩৩ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত, নেওয়াল কিশোর কর্তৃক লক্ষ্মৌতে সম্পাদিত, রেমন্ড (মুস্তফা) কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ; ক্যামব্রে এন্ড কোম্পানি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা-১৯০২
১৮.	হামিদ আল্লা খান	আহাদিস আল খাওয়ানীন, কলিকাতা, ১৮৭১
১৯.	হাসান বিন মুহম্মদ আল খাকী শিরাজী	মুন্তাখান-উত-তাওয়ারিখ বা আহসান আল তাওয়ারিখ, এলিয়ট এবং ডাউসন, ৬ষ্ঠ খণ্ড
২০.	জওহর আফতাবচী	তাজকিরাত-আল-ওয়াকিয়াত, স্টুয়ার্ট কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ; লন্ডন ১৮৩২। পুনর্মুদ্রণ, লক্ষ্মৌ, ১৯৭৪
২১.	খাজা কামগার খান	মা আথির-ই-জাহাঙ্গিরী, সংকলিত ১৬৩১ সালে
২২.	মির্জা নাথান (শিতাব খান)	বাহারিস্তান-ই-গায়েবী, ২য় খণ্ড এম আই বোরা কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, গৌহাটি, ১৯৩৬
২৩.	মুহসিন কানি	দাবিস্তান-আল-মাদাহিব, বোম্বে সংস্করণ (কোনো তারিখ নেই)
২৪.	মহম্মদ সালিহ কাম্বোহ	আমল-ই-সালিহ, মূলপাঠ: বিব্লিথেকা ইন্ডিকা সিরিজ কলি: ১৯২৩-১৯৩৯
২৫.	মুহম্মদ হাকিম এবং কাদিখান:	মুন্তাখাব আল লুবাব, বিব্লিকা-কলিকাতা-১৮৬৯-১৯২৫
২৬.	মুল্লা মুহাম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ:	গুলশান-ই-ইব্রাহিমী বা তারিখ-ই-ফিরিশতা, মুলপাঠ নেওয়াল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ব্রিগস কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত
২৭.	ফিরিশতা	উর্দু সংস্করণ, আব্দুল হাই, লাহোর, ১৯৬৬
২৮.	মুহম্মদ কাজিম	আলমগীর নামা, মূলপাঠ খাদিম হুসাইন এবং আব্দুল হাই কর্তৃক সম্পাদিত; বিব্লিথেকা ইন্ডিকা সিরিজ কলি-১৮৮১
২৯.	মুতামিদ খান	ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরি; ১৬২৮ সালে সংকলিত, বিব্লিবেকা ইন্ডিকা সিরিজ, ১৮৬৫
৩০.	মুস্তায়িদ খান	মা'আথিরে-আলমগিরি' ১৭০৭-১০ সালের মধ্যে সংকলিত যদুনাথ সরকার কর্ত ৃক অনূদিত; বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ ১৯৪৭
৩১.	মুহাম্মদ বাবার	মুজমাল-ই-মুফাসসিল, ১৬৫৬ সালে লিখিত

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩২. মুহাম্মদ বারারি	গুলজার-ই-আবরার, পাণ্ডুলিপি নম্বর ২৫৯ ইন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতা; এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকায় ফটোষ্ট্যাট কপি
৩৩. মুহম্মদ হাদি (কামার খান উপাধিধারি)	হাফত গুলশান; এলিয়ট এবং ডাউসন, ৮ম খণ্ড
৩৪. মির্জা মুহম্মদ ইউসুফি	জিন্নাত আল ফিরদাউস: এলিয়ট এন্ড ডাউসন ৮ম খণ্ড
৩৫. মুহম্মদ আলী খান	বাহর আল মাওয়াজ; এলিয়ট এন্ড ডাউসন, ৮ম খণ্ড
৩৬. মৌলভী ওবায়দুল হক	তাজকিরাহ্-ই-আউলিয়া-ই-বাঙ্গালী, ফেনী, বাংলাদেশ
৩৭. মুল্লা আহমদ	সুবহে সাদিক, এলিয়ট এন্ড ডাউসন, ষষ্ঠ খণ্ড
৩৮. মুহাম্মদ বাকা	মিরাত উল আলম এন্ড মিরাত-ই-জাহান্নুমা, ১৬৬৭ সালে সংকলিত, এলিয়ট এন্ড ডাউসন, ৫ম খণ্ড
৩৯. নিমাত আল্লা	তারিখ-ই-খান জাহানী ওয়া মাখজানে আফগানী, ১৬১২ সালে সংকলিত। ডর্ন এলিয়ট এন্ড ডাউসন কৃত ইংরেজি অনুবাদ ৫ম খণ্ড; মুলপাঠ এস,এম ইমামুদ্দিন কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬০
৪০. নুরুল হক	জুবদাত-আল-তাওয়ারিখ; এলিয়ট এন্ড ডাউসন ৬ষ্ঠ খণ্ড
৪১. শাহনেওয়াজ খান	মা'আ থির অল উমারা, মুলপাঠ, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ- ১৮৮৮-১৮৯১। এইচ, বেভারিজ এবং বি, দে কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ, ১৯৫১ ও ১৯৫৩
৪২. সেলিমুল্লাহ	তারিখ-ই-বাঙ্গালা; গোল্ডউইন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, কলি-১৭৮৮
৪৩. জহির আল দিন মুহাম্মদ বাবর	মূল তুর্কী থেকে এস,এ, বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ লন্ডন, ১৯২১ মুদ্রণ, দিল্লি ১৯৭৯

মুদ্রাসমূহ

১. আহমদ শামস উদ্দিন	ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম গ্রন্থের ২য় খণ্ডের অতিরিক্ত অংশ (Supplement), কলি, দিল্লি ১৯৩৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২.	বোথাস এ, ডব্লিউ	ক্যাটালগ অব দি প্রভিন্সিয়াল কয়েন্স, ক্যাবিনেট অব আসাম ২য় সংস্করণ, এলাহাবাদ, ১৯৩০
৩.	ভট্টশালী এন. কে	ক্যাটালগ অব কয়েন্সঃ এ, এস, এম, তাইফুর কর্তৃক সংগৃহিত এবং ঢাকা জাদুঘরকে প্রদত্ত, ঢাকা, ১৯৩৬
৪.	করিম, এ	কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল; এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা ১৯৬০
		ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অব দি চিটাগাং ইউনির্ভাসিটি মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম, ১৯৭৯
৫.	লেনপুল, ষ্ট্যানলি	দি কয়েন্স অব দি মোহামেডান স্টেটস অব ইন্ডিয়া ইন দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, ১৮৯৫
৬.	স্ট্যাপলটন. এইচ. ই	ক্যাটালগ অব দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অব কয়েন্সঃ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম, শিলং, ১৯১১
৭.	টমাস, ই	দি ক্রনিকলস অব দি পাঠান কিংস অব দিল্লি, লন্ডন ১৮৭১
৮.	রাইট, এইচ, নেলসন	ক্যাটালগ অব দি কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিঃ ২য় খণ্ড ২য় অংশ, অক্সফোর্ড ১৯০৭
		দি কয়েনেজ এন্ড মেট্রোলজি অব দি সুলতানস অব দিল্লি, দিল্লি ১৯৩৬

শিলা লিপি/শিলাসমূহ

১.	আহমেদ, কিয়ামুদ্দিন	কর্পাস অব দি এরাবিক এন্ড পার্সিয়ান ইনস্ক্রিপশনস অব বিহার, পাটনা, ১৯৭১
২.	আহমেদ, শামসুদ্দিন	ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯৬০
৩.	কানিংহাম, আলেকজান্ডার	আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্টস (এএসআইআর) ১৫তম খণ্ড, কলিঃ ১৮৮২
৪.	দানী, আহমেদ হাসান	বিব্লিওগ্রাফি অব দি মুসলিম ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল, জেএএসবি এর পরিশিষ্ট, ঢাকা, ১৯৫৭
৫.	খান, আবিদ আলী	মেমোয়ার্স অব গৌড় এন্ড পান্ডুয়া; এইচ, ই, ষ্ট্যাপল্টন কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯[illegible]
৬.	র‍্যাভেন শ', জে.এ	গৌড়: ইটস [illegible] এন্ড ইনস্ক্রিপশন, লন্ডন, ১৮৭৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী

১.	বার্বোসা দুয়াতে	দি বুক অব দুয়াতে করবোসা, ২য় খণ্ড। এম, এল, ডেমস সোসাইটি, লন্ডন কর্তৃক ১৯১৮ সালে ইংরেজি অনুবাদ
২.	ব্যারোস, জোয়া দ্য	দ্য এশিয়া, ডুয়ার্টে বার্বোসার বইয়ের উদ্ধৃতাংশ ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট-১
৩.	ইবনে বতুতা	দি রেহলা অব ইবনে বতুতা, মেহদী হুসেইন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, বারোদা, ১৯৫৩
৪.	মহুয়া	কিংডম অব বেঙ্গালা; জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫
৫.	মার্কো পোলো	দি বুক অব মার্কো পোলো: ১ম ও ২য় খণ্ড, ইয়ুল এন্ড কর্ডিয়ার, লন্ডন, ১৯০৩
৬.	পুর্কাস. স্যামুয়েল	পুরকাস, হিজ পিলগ্রিমস, ১০ খণ্ড, গ্লাসগো, ১৯০৫
৭.	সুজা. ফারিয়া. ওয়াই	দি পর্তুগিজ এশিয়া, ১ম খণ্ড। ষ্টিভেনসন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৮৮৫
৮.	ভার্থিমা. লুদেভিসি দি	দি ট্রাভেলস অব ভার্থিমা, লন্ডন, ১৮৬৩। জন উইন্টার জোনস কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ

প্রাচীন বাংলা রচনাবলী/বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী

১.	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা-মজনু ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংকলিত। আহমেদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা একাডেমী ,সংস্করণ, ঢাকা ১৯৫৭
২.	কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীকাব্য: ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে সংকলিত	
৩.	বিপ্রদাস	মনষা বিজয়: সুকুমার সেন সম্পাদিত। বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ, কলিকাতা, ১৯৫৩
৪.	বিজয় গুপ্ত	মনসা মঙ্গল; বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, বরিশাল। (প্রকাশনার কোনো তারিখ নেই।)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাভাষায় রচিত আধুনিক রচনাবলী/গ্রন্থাবলী

১.	আহমদ, এ	বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ, নোয়াখালী, বাংলা সন ১৩৫৪
২.	বন্দোপাধ্যায়, আর. ডি,	বাংলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড। বাংলা সন ১৩২১ ২য় খণ্ড, কলিকাতা: বাংলা সন ১৩২৪
৩.	বসু : জে.সি	মেদিনীপুরের ইতিহাস: কলি: বা:স: ১৩৪৬
৪.	ভট্ট্যাচার্য। আশুতোষ	বাংলার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস: কলি: বা:স: ১৩৪৬
৫.	চক্রবর্তী. এম.এন (সম্পাদিত)	বীরভূম বিবরণী: ৩য় খণ্ড, বীরভুম, বা:স: ১৩৩৫
৬.	চক্রবর্তী : আর. কে	গৌড়ের ইতিহাস: ২য় খণ্ড, মালদা, ১৯০৯
৭.	চৌধুরী। এ. সি	শ্রীহট্টের ইতিহাস, ১ম অংশ, কলি: বা:স: ১৩১৭; ২য় অংশ, কলি: বা:স: ১৩২৪
৮.	দাশগুপ্ত, এম, এস	শ্রীহট্টের ইতিহাস: সিলেট, ১৯০৩
৯.	পি,সি, সেনগুপ্ত	বগুড়ার ইতিহাস; রংপুর সাহিত্য পরিষদ, ১৯১২
১০.	হক, ই	মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৭ বঙ্গে সূফি প্রভাব, কলি: ১৯৩৫ পুর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৪৮
১১.	হক. ই ও করিম. এ	আরাকান রাজ্য সভায় বাংলা সাহিত্য, কলি: ১৯৩৫
১২.	করিম. এ	বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, ঢাকা ১৯৭৭, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা ১৯৭৭
১৩.	মিত্র. এস. সি	যশোর-খুলনার ইতিহাস: খণ্ড-১, ২য় সংস্করণ; কলি: রায় ১৩২৯/১৩৩৫, ২য় খণ্ড
১৪.	মজুমদার. বি. বি	শ্রী চৈতন্য চরিতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯
১৫.	মজুমদার. কে	ময়মনসিংহের ইতিহাস. কলিকাতা ১৯০৬
১৬.	সাহা. আর. আর	পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় অংশ, পাবনা, বা: স: ১৩৩৩
১৭.	সেন: ডি. সি	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য. ৮ম সংস্করণ, কলি: বা: স: ১৩৩৬/১৯৪৯ খ্রি.। বিরাট বঙ্গ: ১ম ও ২য় খণ্ড, কলি: ১৯৩৪-৩৫ খ্রি. বা স ১৩৪১-৪২ বৈষ্ণব লিটারেচার অব মিডাইভাল বেঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮. সেন; সুকুমার — মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালি, কলিকাতা ১৯৪৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : কলি : ১৯৪০

১৯. জাকারিয়া. এ.কে.এম — তাবাকাত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৮৪

ইউরোপীয় ভাষায় রচিত আধুনিক রচনাবলী/গ্রন্থাবলী

১. আহমদ. এ — হিস্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড খাদিমস; সিলেট, ১৯১৪

২. আহমদ. এম. এ — আরলি তার্কিশ এম্পায়ার অব দিল্লি; লাহোর, ১৯৪৯

৩. আহমদ. রফিউদ্দিন — বেঙ্গল মুসলিম এ কোয়েষ্ট ফর আইডেন্টিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউদিল্লি, ১৯৮১

৪. আলী. এস. এ — এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি সারাসিনস; লন্ডন, ১৯২১

৫. আর্নল্ড. টি — দি প্রিচিংস অব ইসলাম; নতুন সংস্করণ, লাহোর, ১৯৫৬

৬. আশরাফ. কে. এম — লাইফ এন্ড কন্ডিশন অব দি পিপল অব হিন্দুস্তান; (১২০০-১৫০০), ২য় সংস্করণ, দিল্লি ১৯৭০

৭. বাগচী. পি. সি — স্টাডিজ ইন তন্ত্রাস, ১ম অংশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯

৮. বখশ. এস. কে — এসেজ ইন্ডিয়ান এন্ড ইসলামিক, লন্ডন, ১৯১২ স্টাডিস, ইন্ডিয়ান এন্ড ইসলামিক; লন্ডন ১৯২৭

৯. ব্যানার্জী. এস. কে — হুমায়ন বাদশাহ; অক্সফোর্ড, ১৯৪১। হিস্ট্রি অব শাহজাহান; এলাহাবাদ, ১৯২২

১০. বোস এম.এম — পোষ্ট চৈতন্য শাজিয়া কাল্ট অব বেঙ্গল; কলি বিশ্ব ১৯৩৬

১১. ব্রাউন. পি — ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার; (ইসলামিক পিরিয়ড) ২য় সংস্করণ বোম্বে, ১৯৪২

১২. ব্রাউন, ই, জি — এ লিটারেরী হিস্ট্রি অব পার্সিয়া; ২য় খণ্ড, ক্যাম্ব্রিজ ১৯২৮

১৩. বেভারিজ. এইচ — হিস্ট্রি অব বাকেরগঞ্জ

১৪. বেলেউ — আফগানিস্তান এন্ড দি আফগানস, ১৮৭৯। রেসেস ইন আফগানিস্তান, ১৮৮০

১৫. ক্যাম্পাস, জে.জে. এ — হিস্ট্রি অব দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল; কলি ১৯১৯। পুনর্মুদ্রণ, পাটনা, ১৯৭৫

১৬. ক্রেইটন, এ — রুইন অব গৌড়; ১৮টি চিত্রে বর্ণনাকৃত এবং উল্লেখিত, লন্ডন, ১৮১৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭.	ডানিয়েল, এ. এইচ	ঢাকা এ রেকর্ড অব ইটস চেঞ্জিং ফরচুন; ঢাকা, ১৯৫৬। মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৬১
১৮.	দাশগুপ্ত, টি. সি	আসপেক্টস অব বেঙ্গলী সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার; কলি : বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫
১৯.	দাশগুপ্ত, এস. বি	অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস; কলি বিশ্ব : ১৯৪৬
২০.	দাশগুপ্ত, জে, এন	বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরী, কলি বিশ্ব ১৯১৪ বেঙ্গল ইন দি সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরী, কলি বিশ্ব : ১৯১৬
২১.	দ্য, এস. কে	আর্লি হিস্ট্রি অব দি বৈষ্ণব ফেইথ এন্ড মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, কলি : ১৯৪২
২২.	ডর্ন, বার্নহার্ড	দি হিস্ট্রি অব দি আফগানস; সুশীল গুপ্ত পাবলিকেশনস, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৬৫
২৩.	এল্ফিন্সটন	একাউন্ট অব দি কিংডম অব কাবুল এন্ড ইটস ডিপেন্ডেন্সিজ; ৩য়-৮ম খণ্ড
২৪.	ইথি, এইচ	ক্যাটালগ অব দি পার্সিয়ান ম্যানাসক্রিপ্টস ইন দি লাইব্রেরী অব ইন্ডিয়া অফিস; ১ম খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৯০৩
২৫.	এলিয়ট এন্ড ডাউসন	হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ঔন হিস্টোরিয়ানস; ৩য়-৮ম খণ্ড, লন্ডন ১৮৬৭-৭৭
২৬.	এর্স্কিন, উইলিয়াম	বাবুর এন্ড হুমায়ন; ১ম ও ২য় খণ্ড। হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া; লন্ডন, ১৮৫৪
২৭.	ফেরিয়ার	হিস্ট্রি অব দি আফগানস
২৮.	গাইট এডওয়ার্ড	এ হিস্ট্রি অব আসাম; কলি ও সিমলা, ১৯২৬
২৯.	গ্রায়ারসন, জি. এ	লিংগুয়িষ্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া; কলি ১৯২১-২৭
৩০.	গ্রান্ট, জি. এ	ফিফথ রিপোর্ট; ৩য় খণ্ড, কলি- ১৯১৮
৩১.	হাবিবুল্লাহ, এ.বি.এম (সম্পা.)	এন, কে ভট্টশালী কমেমোরেশন ভলিউম; ঢাকা, ১৯৬৬
৩২.	হালিম, এ	হিস্ট্রি অব লোদী সুলতানস অব দিল্লি এন্ড আগরা; ঢাকা, ১৯৬১। হিস্ট্রি অব ইন্দো-পাক মিউজিক, ঢাকা, ১৯৬২
৩৩.	হেইগ, উলসলি (সম্পা.)	দি ক্যাম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া; ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, ক্যামব্রিজ, ১৯২৮
৩৪.	হাবিব, আই	সোসাইটি এন্ড পলি[illegible] ইন মি[illegible]ইভাল মুসলিম ইন্ডিয়া; আলিগড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৫.	হার্ভে, জি.ই	হিস্ট্রি অব বার্মা ফ্রম দি আর্লিয়েষ্ট টাইমস টু দি বিগিনিং অব দি ইংলিশ কংকুয়েষ্ট; লন্ডন, ১৯২৫
৩৬.	হোডিভালা, এস. এইচ	স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি; বোম্বে, ১৯৩৯
৩৭.	হান্টার, ডাব্লু. ডাব্লু	এ ষ্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অব বেঙ্গল; ৬ষ্ঠ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭৬
৩৮.	হোষ্টিংস, জে (সম্পাদনা)	এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড ইথিকস; এডিনবার্গ, নবম খণ্ড, ১৯১৭; ১০ম খণ্ড, ১৯১৮; ১২শ খণ্ড, ১৯২১
৩৯.	হ্যাডেল, ই,বি	ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার; ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৪৯
৪০.	হিট্টি, পি.কে	হিস্ট্রি অব দি এরাবস; ৪র্থ সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৪৯
৪১.	ইভানো, ভ্লাদামির	কনসাইজ ডেসক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ অব দি পার্সিয়ান ম্যানাসক্রিপ্টস ইন দি কালেকশন অব দি এশিয়ান সোসাইটি অব বেঙ্গল; বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ, কলি ১৯২৯
৪২.	ইসহাক, এম	ইন্ডিয়াস কন্ট্রিবিউশন টু দি স্টাডি অব দি হাদিস লিটারেচার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫
৪৩.	জাফর শরীফ	কানুন-ই-ইসলাম বা ইসলাম ইন ইন্ডিয়া; ইংরেজি অনুবাদ জি,এ, হারলটস; নতুন সংস্করণ, উইলিয়াম ক্রুক কর্তৃক সংশোধিত; ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লি, ১৯৭২
৪৪.	ক্রেমারস, জে. এইচ (সম্পা.)	শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম; লিডেন ১ম খণ্ড, ১৯৫৩
৪৫.	করিম, এ	সোসাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল ডউন টু ১৫৩৮; ২য় সংস্করণ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫ কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েন্স অব বেঙ্গল; ঢাকা ১৯৬০ ক্যাটালগ অব কয়েন্স অব বেঙ্গল; ঢাকা ১৯৬০। ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অব চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম; চট্টগ্রাম, ১৯৭৯ ঢাকা, দি মুঘল ক্যাপিটাল; ঢাকা, ১৯৬৪
৪৬.	কেনেডি, এম. টি	দি চৈতন্য মুভমেন্ট; ওয়াই,এম,সি,এ, কলি ১৯২৫
৪৭.	খান, এ. এ	মেমোয়ারস অব গৌড় এন্ড পান্ডুয়া; কলি: ১৯২৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৮. ল, এন. এন — স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এন্ড কালচার; লন্ডন, ১৯২৫

৪৯. লেভি, আর — দি সোশাল ষ্ট্রাকচার ইন ইসলাম; কেমব্রিজ, ১৯৫৭

৫০. মজুমদার, আর. সি. এন্ড পুশালকার,এ.ডি. (সম্পাদনা) — দি হিস্ট্রি এন্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল; ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড; বোম্বে, ১৯৫৭

৫১. মজুমদার, আর. সি.এইচ.সি, রায় চৌধুরী এন্ড কে. কে দত্ত — দি এডভান্স হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া; লন্ডন, ১৯৪৮

৫২. মজুমদার, আর. সি (সম্পাদন) — হিস্ট্রি অব বেঙ্গল; ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৪২

৫৩. মার্টিন. এম — দি হিস্ট্রি, এন্টিকিটিজ, টপোগ্রাফি এন্ড ষ্ট্যাটিসটিকস অব ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া, ১ম ও ২য় খণ্ড, লন্ডন ১৮৩৮

৫৪. মোরল্যান্ড, ডব্লিউ. এইচ — ইন্ডিয়া এট দ্যা ডেথ অব আকবর; লন্ডন, ১৯২০

দি এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইন্ডিয়া; পুনর্মুদ্রণ দিল্লি ১৯৬৮ (ক্যামব্রিজ, ১৯২৯)

৫৫. মুখার্জী, আর. কে — দি চেনজিং ফেস অব বেঙ্গল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮

৫৬. মীর হাসান আলী — অবজারভেশনস অব দি মুসলমানস অব ইন্ডিয়া; অক্সফোর্ড ২য় সংস্করণ, ১৯১৭। ডব্লিউ ক্রুক সংস্করণ

৫৭. মারে, কর্ণেল জে, ডব্লিউ — ডিকশনারী অব দি পাঠান ট্রাইবস

৫৮. মুজিব, এ — দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস; লন্ডন, ১৯৬৭

৫৯. নিকোলসন. আর. এ — দি মিষ্টিকস অব ইসলাম, লন্ডন, ১৯১৪

দি আইডিয়া অব পার্সোনালিটি ইন সূফিইজম; ক্যামব্রিজ, ১৯২৩

৬০. নিজামী, কে.এ — সাম আসপেক্টস অব সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া ইন দি থার্টিন্থ সেঞ্চুরী; আলীগড়, ১৯৬১

৬১. ওমান, জে. সি — দি ব্রাহমানস, থেইসটস এন্ড মুসলিমস অব ইন্ডিয়া; ২য় সংস্করণ, লন্ডন (তারিখ নেই)

৬২. ফাইরে, এ. পি — হিস্ট্রি অব বার্মা; লন্ডন, ১৮৮৪

৬৩. প্রসাদ, বেণী — হিস্ট্রি অব জাহাঙ্গীর; এলাহবাদ, ১৯৬২

৬৪. প্রসাদ, ঈশ্বরী — হিস্ট্রি অব মিডাইভাল ইন্ডিয়া; এলাহাবাদ, ১৯৩৩

হিস্ট্রি অব কারানা তুর্কস; এলাহাবাদ, ১৯৩৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

		লাইফ এন্ড টাইমস অব হুমায়ন; কলি : ১৯৫৬
৬৫.	প্রিন্সেপ.জে	এসেজ অন ইন্ডিয়ান এন্টিকিটিজ; এডওয়ার্ড টমাস কর্তৃক সম্পাদিত; ২য় খণ্ড; লন্ডন, ১৮৫৮
৬৬.	কানুনগো, কে. আর	শেরশাহ এন্ড হিজ টাইমস; কলিকাতা ১৯৬৫
		শেরশাহ; কলিকাতা, ১৯২১
৬৭.	কুরেশী, আই. এইচ	দি এডমিনিস্ট্রেশন অব দি সুলতানাত অব দিল্লি, ২য় সংস্করণ লাহোর, ১৯৪৪; পুনর্মুদ্রণ করাচী, ১৯৭১
		দি এডমিনিস্ট্রেশন অব দি মোগল এম্পায়ার; করাচী, ১৯৬৬
		দি হোলী কুরআন; মওলানা মুহম্মদ আলী কৃত ইংরেজি অনুবাদ
৬৮.	রেনেল, জেমস	বেঙ্গল এটলাস, ১৭৮১
৬৯.	রোজ, ই. ডেভিডসন	হিন্দু মুহম্মডান ফিস্টস, কলি-১৯১৪
৭০.	রায় চৌধুরী, টি, কে	বেঙ্গল আন্ডার আকবর এন্ড জাহাঙ্গীর; কলি ১৯৫৩ পুনর্মুদ্রণ : দিল্লি, ১৯৬৯
৭১.	রিসলে, হার্বার্ট	দি পিপল অব ইন্ডিয়া; সম্পাদনা ডব্লিউ ক্রুক; পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ১৯৬৯
৭২.	বিট্রিশ মিউজিয়াম	
৭৩.	রহিম, এম. এ	হিস্ট্রি অব দি আফগানস ইন ইন্ডিয়া, করাচী, ১৯৬১
		সোসাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল; ১ম ও ২য় খণ্ড করাচী, ১৯৬৩
৭৪.	রবিনসন,এম এবং শ'এল.এ	কয়েন্স এন্ড ব্যাংক নোটস অব বার্মা, ম্যানচেস্টার, ইস্টল্যান্ড, ১৯৮০
৭৫.	রায়, এন. বি	সাকসেসরস অব শেরশাহ, ঢাকা, ১৯৩৪
৭৬.	সরকার, জে. এন	চেতন্য'স পিলগ্রিমেজেজ এন্ড টিচিংস; কলি ১৯১৩। মোগল এডমিনিষ্ট্রেশন; ৩য় সংস্করণ, কলি ১৯৩৫
	ঐ (সম্পাদনা)	হিস্ট্রি অব বেঙ্গল; ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৪৮
৭৭.	সরন, পি	দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টস অব দি মোগলস; বোম্বে, ১৯৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭৮. শরমা, এস. আর — দি রিলিজিয়াস পলিসি অব দি মোগল এম্পেররস; কলি : ১৯৪০

৭৯. শিকদার, ইকবাল আলী শাহ — ইসলামিক সূফি ইজম; লন্ডন, ১৯৩৩

৮০. সেন, ডি.সি — চৈতন্য এন্ড হিজ কম্পেনিওনস; কলি বিশ্ব ১৯১৭

সেন, ডি,সি — হিস্ট্রি অব বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচর; কলি : বিশ্ব : ১৯১১

সেন, ডি,সি — দি ফোল্ক লিটারেচার অব বেঙ্গল; কলি বিশ্ব ১৯২০

৮১. সেন, পি. সি — মহাস্থান এন্ড ইটস এনভায়রনস; বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯২৯

৮২. সিরাজুদ্দিন, এ. এম — দি রেভিনিউ হিস্ট্রি অব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন চিটাগং; ১৯৭১

৮৩. শাস্ত্রী, এ. এম. এ — আউটলাইন্স অব ইসলামিক কালচার; ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্যাঙ্গালোর, ১৯৩৮

৮৪. স্মিথ, ভি. এ — দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া; অক্সফোর্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯২১

আকবর, দি গ্রেট মোগল; অক্সফোর্ড, ২য় সংশোধিত ২য় সংস্করণ, ১৯২৬

৮৫. ষ্টুয়ার্ট, সি — হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, লন্ডন, ১৮১৩; পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯০৩

৮৬. সুবহান, জে. এ — সূফিইজম, ইটস সেইন্টস এন্ড স্রাইনস, লক্ষ্মৌ, ১৯৩৮

৮৭. সাইকিস, পার্সী — হিস্ট্রি অব আফগানিস্থান, লন্ডন, ১৯৪০

৮৮. তাইফুর, এস. এম — গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা; ঢাকা ১৯৫২

৮৯. সিনহা, এন. কে — দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল; ২ খণ্ড, ১৯৬৫

৯০. তারাচাঁদ — ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার; এলাহাবাদ, ১৯৪৬

সোসাইটি এন্ড ষ্টেট ইন দ্য মোগল পিরিয়ড; দিল্লি, ১৯৬১

৯১. টমাস, ই — ক্রনিকলস অব দি পাঠান কিংস অব দিল্লি; লন্ডন, ১৯৭১

৯২. ত্রিপাঠি, আর. পি — সাম আসপেক্টস অব মুসলিম এডমিনিষ্ট্রেশন; এলাহাবাদ, ১৯৩৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯৩. টমাস, এফ, ডব্লিউ — মিউচুয়াল ইনফ্লুয়েন্স অব মোহামেডানস এন্ড হিন্দুস ইন ইন্ডিয়া; ক্যাম্ব্রিজ, ১৮৯২

৯৪. টিটাস, এম. টি — ইন্ডিয়ান ইসলাম, মহিসূর, ১৯৩০

৯৫. তরফদার, এম. আর — হুসেন শাহী বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৬৫

৯৬. ওয়েল — এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক পিপলস; এস, খুদাবক্স কর্তৃক অনুবাদকৃত; কলিকাতা (কোনো তারিখ উল্লেখ নেই)

৯৭. ওয়াহেদ হুসেইন — এডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস ডিউরিং দ্যা মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া; কলি: ১৯৩৪

৯৮. ওয়াইজ, জে — নোটস অব রেসেস, কাষ্টস এন্ড ট্রেডস অব ইষ্টার্ণ বেঙ্গল; লন্ডন, ১৮৮৩

৯৯. ইয়াসিন, এম — এ সোশাল হিস্ট্রি অব ইসলামিক ইন্ডিয়া; ২য় সংশোধিত সংস্করণ, দিল্লি, ১৯৭৪

১০০. ইয়ুল, হেনরী ও — হবসন-জবসন; দিল্লি, ১৯৬৮। উইলিয়াম ক্রুক কর্তৃক সম্পাদিত। এ,সি বার্নেল

জার্নালস এবং গেজেট সমূহ

(খণ্ড ও সংখ্যার কথা পাদটিকায় উল্লেখ আছে)

১. বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট — কলিকাতা

২. বাংলা একাডেমী পত্রিকা — ঢাকা

৩. দি ক্যালকাটা রিভিউ — কলিকাতা

৪. ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ারস অব বেঙ্গল এন্ড বিহার- — জেলা সদর থেকে প্রকাশিত

৫. ঢাকা রিভিউ — ঢাকা

৬. এপিগ্রাফিকা ইন্দো-মুসলেমিকা — কলিকাতা এবং দিল্লি

৭. ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়াটারলি - — কলিকাতা

৮. ইতিহাস পত্রিকা — চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

৯. ইসলামিক কালচার — হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ইন্ডিয়া

১০. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল - কলিকাতা

১১. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ- ঢাকা

১২. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান- ঢাকা

১৩. জার্নাল অব দি বিহার এন্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি- পাটনা

১৪. জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি — ত্রিবেন্দ্রাম, ইন্ডিয়া

১৫. জার্নাল অব দি ইতিহাস সমিতি — ঢাকা

১৬. জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটি - করাচী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭. জার্নাল অব দি ন্যুমেসমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া-বারানসী, ইন্ডিয়া

১৮. জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এন্ড আয়ারল্যান্ড — জে. আর. এ. এস. লন্ডন

১৯. বিশ্ব ভারতী এনালস — বিশ্বভারতী, ইন্ডিয়া

প্রবন্ধসমূহ

১. বসু, কে. কে — 'সাম ওল্ড একাউন্টস অব ভাগলপুর' জেওবিআরএস-২১, ১৯৪০

২. বীমস, জন — 'অন দি জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া ইন দ্য রেইন অব আকবর।' জেএএসবি, ১৮৮৫, পার্ট-১

'নোটিশ অন আকবরস সুবাহস উইথ রেফারেন্স টু আইন-ই-আকবরী' সংখ্যা-১, বেঙ্গল, জেআরএএস, ১৮৯৬

৩. ভট্টাচার্য এস. এন — 'অন দি ট্রান্সফার অব ক্যাপিটাল অব মোগল বেঙ্গল ফ্রম রাজমহল টু ঢাকা, (জাহাঙ্গীর নগর) বাই ইসলাম খান চিশতী।' ডিইউএস-১

৪. ভট্টাচার্য, বিশ্বেসর — 'বেঙ্গলী ইনফ্লুয়েন্স ইন আরাকান' বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৩৩, ১৯২৭

৫. ব্লখম্যান, এইচ — 'কন্ট্রিবিউশন টু দি জিওগ্রাফি এন্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, (মোহামেডান পিরিওড)' জেএএসবি, ১৯৭৩

৬. চক্রবর্তী, মনমোহন — 'নোটস অন গৌড় এন্ড আদার ওল্ড প্লেসেস ইন বেঙ্গল।' জেএএসবি, ১৯০৯

৭. হাবিবুল্লাহ, এ. বি. এম — 'আরাকান ইন দি প্রি-মোগল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' জেআরএএসবি, খণ্ড-১১, সংখ্যা-১, কলিকাতা-১৯৪৫

৮. করিম, আব্দুল — 'চিটাগং কোষ্ট এজ ডেসক্রাইব্ড বাই সিদি-আল-রাইস' জে.এ.এস.বি, (ডি), খণ্ড-১৫, সংখ্যা-১, এপ্রিল ১৯৭১

'ওয়াজ চিটাগং এভার এ ক্যাপিটাল সিটি এ ফ্রেশ স্টাডি অব সাম রেয়ার কয়েন্স অব চিটাগং' জেএএসবি, (ডি), (হিউম্যানিটিজ) খণ্ড-৩১, জুন ১৯৮৬

'এ মিডাইভাল কয়েন অব আরাকান' জার্নাল অব দি ন্যুমেসমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া- খণ্ড-২২, ১৯৬০

'এ্যান আনপাবলিশড সুলতানাত ইনস্ক্রিপশন এন্ড মোগল [illegible] চিটাগাং' জেএএসবি খণ্ড-৯, সংখ্যা-২, এপ্রিল ১৯৬[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯.	করিম, কে.এম	'মোগল নাওওয়ারা ইন বেঙ্গল' জেএএসপি খণ্ড-১৪, সংখ্যা-১, এপ্রিল ১৯৬৯
১০.	খান, সিদ্দিক	'মুসলিম ইন্টারকোর্স উইথ বার্মা' ইসলামিক কালচার হায়দ্রাবাদ, জুলাই ১৯৩৬
১১.	ওল্ডাহান, টি	'নোটিস আপন দি জিওলজি অব রাজমহল হিলস' জেএএসবি, ১৮৫৪
১২.	কানুনগো, কে. আর	ঢাকা এন্ড ইটস মিডাইভাল হিস্ট্রি', বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট খণ্ড-৬৬, ১৯৪৬-৪৭
১৩.	কানুনগো, এস. বি	'চিটাগং ডিউরিং দ্য আফগান রুল (১৫৩৮-১৫৮০)' জেএএসবি (ডি), খণ্ড-২১, সংখ্যা-২, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৭৬
১৪.	রহিম. মো. আব্দুর	'চিটাগং আন্ডার দি পাঠান রুল ইন বেঙ্গল' জেএএসবি, খণ্ড-১৮, সংখ্যা-১, ১৯৫২
১৫.	সরকার, জে. এন	'দি কংকুয়েষ্ট অব চিটাগং' জেএএসবি খণ্ড-৩, সংখ্যা-৬, জুন ১৯০৭
১৬.	সাঈদ, এ	'এ ফোরটিনথ সেঞ্চুরী লিগ্যাল প্রনাউন্সমেন্ট অন সামা' জার্নাল অব দি ইতিহাস সমিতি, ঢাকা ১৯৭৩
১৭.	সিরাজুদ্দিন, এ. এম	"মুসলিম ইনফ্লুয়েন্স ইন আরাকান এন্ড দি মুসলিম নেমস অব আরাকানিজ কিংস এ রিএসেসমেন্ট" জেএএসবি, (ডি), খণ্ড-৩১, সংখ্যা-১, জুন ১৯৮৬
১৮.	শর্মা, শ্রীরাম	'বেঙ্গল আন্ডার জাহাঙ্গীর বাহারিস্তান গায়েবী অব মির্জা নাথান' জার্নাল অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, খণ্ড-১১ (১৯৩২) খণ্ড-১৩ (১৯৩৪) খণ্ড-১৪ (১৯৩৫)
১৯.	শের উইল, ক্যাপটেইন ডব্লিউ.এস.	'নোটিশ আপন এ ট্যুর থ্রু দি রাজমহল হিলস' জেএএসবি, ১৮৫১
২০.	তরফদার, এম, আর	'দি ফ্রন্টিয়ারস অব বেঙ্গল আন্ডার দি হুসেইন শাহী রুলারস' বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৭৭, ১৯৫৮
২১.	ওয়াইজ. জি	'দি ফিরিঙ্গিজ অব চিটাগং' দি ক্যালকাটা রিভিউ জুলাই/১৮৭১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট-এক
ফরিদের শের খান উপাধির ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত

দিল্লির লোদী সুলতানদের শাসনকালে হাসান খান সূর ছিলেন খাসপুর-তান্ডা ও সাসারামের একজন অখ্যাত অপরিচিত জাগিরদার। আফগান নারী এবং ভারতীয় দাসীদের গর্ভে হাসান খান সুরের অনেকগুলো সন্তান ছিলো। আফগান স্ত্রীর জ্যেষ্ঠতম সন্তান ছিল ফরিদ। ফরিদ খান সূরকে হাসান খান সূর তার জাগিরের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ফরিদ তার পিতার ইচ্ছানুযায়ী দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। ফলে তার নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে তাকে বিহারের শাসক সুলতান বিহার খান লোহানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই বিহার খান লোহানীর একটা নাবালক পুত্র ছিল যার নাম জালাল খান লোহানী। সুলতান বিহার খান লোহানী তার পুত্র ও উত্তরাধিকার জালাল খান লোহানীর টিউটর হিসাবে ফরিদ খান সূর কে নিযুক্ত করেন। ধীরে ধীরে ফরিদ সুলতানের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। তিনি তার প্রতি আস্থা রাখলেন এবং দেশের আর্থিক প্রশাসনে দায়িত্বও অর্পণ করলেন।

ফরিদ সন্তোষজনকভাবে সুলতান বিহার খান লোহানীকে সেবা প্রদান করতে থাকেন এবং সুলতান তার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই সময়েই ফরিদ খান শের খান হিসাবে পরিচিতি পেলেন। কে তাকে শের খান উপাধি দিল এবং কেন দিল সে নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। সমসাময়িক আফগান ঐতিহাসিকদের উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই মত পার্থক্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরাই পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে সারওয়ানী লিখেছেন "একদিন সুলতান বাহার খান শিকারের উদ্দেশ্যে ফরিদকে সাথে নিয়ে বের হলে তারা একটি বাঘের মুখোমুখি হন। ফরিদ বাঘটিকে হত্যা করেন। বিহার খান যিনি সুলতান মুহম্মদ উপাধি ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন, নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি ফরিদকে শের খান উপাধিতে ভূষিত করেন।"[১] একই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ডর্ন লিখেছেন "একদল শিকারীর সাথে শিকারে গিয়ে ফরিদ একটি সিংহ (Lion) কে হত্যা করেন যার কারণে তাকে শের খান (Lion Khan) উপাধি দেওয়া হয়।"[২] আর নিমাত আল্লার সূত্র বলছে একদিন সুলতান মুহম্মদ শিকারে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সেখানে একটি বাঘ উপস্থিত হয়। ফরিদ বাঘটির মুখোমুখি হন এবং তরবারির আঘাতে বাঘটিকে হত্যা করেন। সুলতান অত্যন্ত খুশি ও দয়াপরবশ হয়ে ফরিদকে শের খান উপাধিতে ভূষিত করেন।"[৩] সুজাত খান সূর সম্পর্কে এক বিবরণী দিতে গিয়ে নিমাত আল্লা লিখেছেন "কুতুব খান বাঙালির পুত্র

~ www.amarboi.com ~

ইব্রাহিম খান যখন জালাল খান নুহানীর রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন ফরিদ খান বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জালাল খান তখন ফরিদকে শের খান এবং শেখ ইসমাইলকে সুজাত খান উপাধি দেন।"[৪] তারিখ-ই-দাউদী গ্রন্থে আব্দ আল্লা লিখেছেন "একদিন বিহার খানের বাবা দরিয়া খান তার ভ্রাতুস্পুত্র দৌলৎ খানকে কিছু কাজ করতে বললে সে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ফরিদকে ডেকে বললেন, আমি দৌলত খানের ভ্রাতুস্পুত্র কে কাজটি করতে বলেছিলাম কিন্তু সেটা করতে সে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমি কাজটির দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি। তুমি যদি কাজটি করে দিতে পার তাহলে দৌলৎ খানের উপাধি শের খান তোমাকে প্রদান করা হবে। ফরিদ সাফল্যের সাথে কাজটি করলো এবং ফিরে এলো। ইতিমধ্যে দরিয়া খান মৃত্যুবরণ করেন। ফরিদ সুলতান মুহম্মদের অধীনে চাকুরি নেন এবং পরপর সফলতা পেতে থাকেন। একদিন সুলতান মুহম্মদ শিকারে বের হন। হঠাৎ একটা বাঘ সামনে এসে পড়লো। ফরিদ বাঘটির সম্মুখীন হলেন এবং তরবারীর আঘাতে বাঘটিকে হত্যা করলেন। সুলতান মুহম্মদ সন্তুষ্ট হয়ে ফরিদকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন, পদমর্যদা উন্নীত করলেন এবং শের খান উপাধিতে ভূষিত করলেন। তার বাবা পূর্বেই ফরিদকে শের খান উপাধির প্রস্তাব করেছিলেন। তখন থেকে ফরিদ শের খান বলে পরিচিত হলো।"[৫]

সামান্য ভিন্নতা নিয়ে 'ওয়াকিয়াতে মুশতাকীর' ভাষ্য প্রায় একই রকমের। ভাষ্যের ভিন্নতা এখানে, যে এতে বলা নেই যে ফরিদ বাঘকে হত্যা করে শের খান উপাধি পেয়েছিলেন। ওয়াকিয়াত এর তথ্যানুযায়ী "দরিয়া খানের দরবারে দৌলত খান এবং তার ভাই থাকতেন। একদিন দরিয়া খান দৌলত খানকে একটি কাজ করতে বললে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। দরিয়া খান ফরিদকে কাছে ডাকলেন। শেখ ফরিদ উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'আমি দরিয়া খানকে একটি কাজ করতে বলেছিলাম কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি কাজটি তোমার দায়িত্বে দিচ্ছি। কাজটি যদি তোমার দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহলে আমি তোমাকে দৌলতখানের বাবার উপাধিটা দেব এবং বাবার নাম ছিল শের খান। যখন শেখ ফরিদ (সফলভাবে কাজটি সম্পন্ন করার পর) ফিরলেন, তাকে শের খান উপাধি দেওয়া হলো। তখন থেকেই তিনি শের খান নামে পরিচিত।[৬] উপরোক্ত তথ্য প্রমাণগুলো সমন্বয় করলে দেখা যায়

ক) প্রায় সব ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন যে শেখ ফরিদ বিহারের দরিয়া খান লোহানী এবং তার বংশধরকে মূল্যবান সেবা প্রদান করে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন।

খ) সারওয়ানী বিশ্বাস করেন যে ফরিদ খান একটি সিংহকে হত্যা করেই বিহার খান লোহানীর নিকট থেকে শের খান উপাধি লাভ করেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ) নিমাত আল্লা পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন। তার ভাষ্য মতে ফরিদ খানকে দুইবার শের খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রথমবার বিহার খান কর্তৃক এবং দ্বিতীয়বার জালাল খান কর্তৃক।

ঘ) তারিখ-ই-দাউদীর লেখক আব্দ আল্লা বাঘ হত্যার ঘটনাকে বিশ্বাস করেন। তবে তার মতে দরিয়া খান লোহানীই ফরিদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে শের খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ঙ) ওয়াকিয়াত-ই-মুশতাকীর লেখক রিজক আল্লা মুশতাকীর গ্রন্থে বাঘ হত্যার ঘটনাটি উল্লেখ নেই। তার মতে দরিয়া খান প্রদত্ত কাজটি সফলভাবে সম্পাদন করে তাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন বিধায় ফরিদ কে শের খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। আর তাতেই তিনি শের খান হিসাবে পরিচিত হন।

রিজক আল্লা মুশতাকী এবং কানুনগো[৭] ব্যতীত আধুনিক ও মধ্যযুগীয় প্রায় সকল ঐতিহাসিকগণ সারওয়ানীর বাঘ হত্যা কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন। জালাল খান ফরিদকে শের খান উপাধি দিয়েছিলেন মর্মে নিমাত আল্লার দ্বিতীয় উক্তিটি স্ববিরোধী ও ভিত্তিহীন। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাবুর নামায়[৮] ফরিদকে শের খান হিসাবে উল্লেখ নিমাত আল্লার দ্বিতীয় স্ববিরোধী উক্তি (অর্থাৎ জালাল খান ফরিদকে শের খান উপাধি দিয়েছিলেন) কেই মিথ্যা প্রমাণিত করে। সুতরাং ফরিদকে শের খান উপাধি প্রদানকারী ব্যক্তি কখনোই জালাল খান হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কে এবং কেন ফরিদকে শের খান উপাধি দিয়েছিলেন? তারিখ-ই-দাউদীর মতে দারিয়া একদিন ভীষণ অপমানিত বোধ করেন যখন তিনি দৌলৎ খান বা তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটি কাজ করতে বললে সে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ফরিদকে ডেকে কাজটি করতে দেন এবং বলেন যে কাজটি করতে পারলে দৌলত খানের বাবার উপাধি 'শের খান' তাকে দেয়া হবে। রিজক আল্লা মুশতাকী ফরিদের সিংহ হত্যার ঘটনাটি মোটেই উল্লেখ করেননি।

সুলতান ইব্রাহিম লোদী ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন। পাঠান অমাত্যদের সাথে সুলতান বাহালুল লোদী উদার ব্যবহার করতেন এবং তাদের সমমর্যাদার আসনে আসীন করেন। কিন্তু সুলতান সিকান্দার শাহ লোদী পাঠান অমাত্যদের ক্ষমতা খর্ব এবং মর্যাদারও হানী করেন। এই পাঠান অমাত্যরা যুবরাজ জালাল খান লোদীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আনুষ্ঠানিক মনোনয়নকে পাশ কাটিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করেন। তারা সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে দিল্লি ও আগ্রাতে ইব্রাহিম লোদীকে এবং জৌনপুরে জালাল খানকে সিংহাসনে বসান। পাঠান অমাত্যরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা করেন। ফলে খুব শীঘ্রই দুই ভাই পরস্পর শত্রু হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওঠেন। ইব্রাহিম লোদী তার ভাই জালাল খান লোদীকে পরাজিত করেন। যেহেতু তিনি বীরত্ব, মেধা, কড়া শাসন এবং আপোষহীন মনোভাবাপন্ন হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন, আফগান অমাত্যরা তার অধীনে থাকা পছন্দ করলেন না। ফলে সুলতান এবং তার অমাত্যদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং তারা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। সুলতান তার অবাধ্য অমাত্যদের বশে আনার লক্ষ্যে কখনও কখনও কঠিন মনোভাব এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলতানের এমন আচরণে সেই সব অমাত্যরাও তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় যারা তার শাসনের শুরুতে তার প্রতি অনুগত ছিলেন। এদের মধ্যে দরিয়া খান লোহানী একজন যিনি বিহারের লোদী গভর্নর ছিলেন। তিনি পূর্বাঞ্চলে অবাধ্য অমাত্যদের বশে আনার লক্ষ্যে ১৫১৮ থেকে ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানকে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনিও সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।

১৫১৮-১৫২২ সময়কালে শেরশাহের বাবা হাসান খান সূর দরিয়া খানের খুব নিকটের সহযোগি ছিলেন এবং অবাধ্য আফগান অমাত্যদের দমন অভিযানে তাকে সহযোগীতা করেছিলেন। হাসান খান যখন দরিয়া খানকে সঙ্গ দিচ্ছেন তখন ফরিদ খান খাসপুর, তান্ডা এবং সাসারামে বাবার জায়গীর দক্ষতা ও সফলতার সাথে পরিচালনা করছিলেন। তার সুশাসন চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং আফগানদের মধ্যে তার সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ সুশাসন ফরিদের জন্য নাম ও খ্যাতি উভয়ই এনে দেয়। বিহার থেকে হাসান খানের জায়গীর নিকটেই ছিল এবং সম্ভবত ফরিদের প্রশাসনিক খ্যাতি সম্পর্কে দরিয়া খান জানতে পেরেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে তিনি যখন বিদ্রোহ করেন ফরিদ তার সংস্পর্শে এসেছিল। তিনি ফরিদকে ছোটো একদল সেনার অধ্যক্ষ করে নিজের বিদ্রোহী অমাত্যদের দমনে পাঠাতেও পারেন। ফরিদ খান এই কাজ সফলভাবে সম্পাদন করায় দরিয়া খান লোহানী ফরিদকে শের খান উপাধি দেওয়া মনস্থ করেন। কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তার সে ইচ্ছাটি অপূর্ণ থেকে যায় । দরিয়া খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান বিহার খান লোহানী পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হন।

সারওয়ানী, নিমাত আল্লা, *অবদ আল্লা* এবং রিজক আল্লা মুশতাকীর মত প্রায় সব আফগান ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে ফরিদ খান *দারিয়া খান* লোহানী এবং তার উত্তরাধিকারীদের মেধাবী সেবা প্রদান করেছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি শুধু দরিয়া খান লোহানীর দরবারেই নয় বরং সমগ্র বিহারে নাম, যশ ও খ্যাতির শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন। এভাবেই বিহার খান লোহানীর জন্য এবং তার মৃত্যুর পরে তার বিধবা স্ত্রী দুদু বিবি ও বিহারী আফগানদের জন্য তিনি অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। *যখন চৌন এর* মুহম্মদ খান সূর ফরিদের বিরুদ্ধে বিহার খানের দরবারে ষড়যন্ত্র শুরু করেন এবং তার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবার জায়গীর তার সৎ ভাইদের নামে হস্তান্তরে অনুমোদনের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন তখন, সকল ঐতিহাসিকদের মতে, বিহার খান ফরিদের সেবাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না এবং মুহম্মদ খান সূর এর প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বিহার খান ফরিদের সেবাকে অনেক গুরুত্বের সাথে মুল্যায়ন করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য হচ্ছে সারওয়ানীর মতে[৯] সুলতান মুহম্মদ বলেন যে (ফরিদ) সে আমার অনেক সেবা দিয়েছে। তোমার অভিযোগ মতে যদি তার ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তা সুষ্ঠু পরীক্ষা না করে আমি জায়গীর হস্তান্তর করতে পারি না। নিমাত আল্লার মতে[১০] ফরিদ খানের সেবা বিবেচনা করে সুলতান মুহম্মদ কোনো কারণ ব্যতিরেকে তার জায়গীর হস্তান্তর করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানালেন। ডর্নের ভাষ্য হচ্ছে[১১] সুলতান মুহম্মদ উত্তরে বলেন যে শের খানের চমৎকার সেবা এবং রাজবংশের প্রতি অবদানের গুরুত্ব তার কাছে এত বেশি যে সামান্য ভূল ত্রুটির জন্য তাকে এত বড় শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না। আবদ আল্লার মতে[১২] শের খানের সেবার মূল্য বিচার করে সুলতান মুহম্মদ জায়গীর হস্তান্তর করতে রাজি হননি।

সুতরাং উপরোল্লিখিত তথ্যানুযায়ী এটা প্রতীয়মান হয় যে, দরিয়া খান লোহানী এবং তার উত্তরসূরীদের প্রতি ফরিদের সেবাই তাকে শের খানের মর্যাদা বা উপাধি অর্জনে সাহায্য করেছিল। বাঘ হত্যার বিষয়টি যেহেতু রিজক আল্লা মুশতাকী বিশ্বাসই করেন না, সেহেতু তিনি এ ব্যাপারে তার বর্ণনায় কোন কিছু উল্লেখ করেননি। তারিখ-ই-দাউদীর লেখক আবদ আল্লা মনে করেন না যে, বাঘ হত্যার জন্য ফরিদকে শের খান উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নিমাত আল্লার উক্তিটি স্ববিরোধি এবং সারওয়ানীর ভাষ্য সংশয়পূর্ণ। তিনি স্পষ্ট করে বলেননি যে বাঘ হত্যা করেই শের খান উপাধি পেয়েছিলেন। আমরা যদি সারওয়ানীর ভাষ্য পুঙ্খানাপুঙ্খ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে ফরিদ এর শের খান উপাধি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাঘ হত্যার কোনো সম্পর্ক নেই।

ফরিদ খানের বাঘ হত্যার ব্যাপারে কানুনগোর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তার মতে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে একশ'র ও বেশি শের খান এবং শের আফগানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের সবাই বাঘ হত্যা করে নি। ফরিদের ব্যাপারে এই উপাধি একটি নিখাদ দুর্ঘটনা মাত্র, বাঘ শিকার করতে গিয়ে বীরত্ব প্রদর্শনের কোনো ঘটনার সাথে যার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ফরিদের শের খান উপাধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাঘ হত্যার কোনো সম্পৃক্ততা নেই; এটা সত্য। তবে দরিয়া খান লোহানী এবং তার উত্তরসুরীদের জন্য ফরিদের একনিষ্ঠ সেবা তাকে নিশ্চত রূপেই শের খান উপাধি অর্জনে সহায়তা করেছে। বিহারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তিনি যেভাবে মোকাবিলা করে তার প্রশাসনের ভীতকে শক্তিশালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। এরই ফলশ্রুতিতে চৌনদের অমাত্য মুহম্মদ খান সুরের জায়গীর হস্তান্তরের প্রস্তাবকে বিহার খান লোহানী সরাসরি নাকচ করে দেন।

সুতরাং উপসংহারে বলা যায় দরিয়া খান লোহানীর উত্তরসুরীদের জন্য ফরিদের সেবাই তাকে শের খান উপাধি লাভের যোগ্য করে তুলেছিল। দরিয়া খান লোহানী তাকে শের খান উপাধি দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু উপাধি প্রদানের পূর্বে অকস্মাৎ তার মৃত্যু ঘটলে আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রদান করাটা বিলম্বিত হয় মাত্র। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিহার খান লোহানী তার বাবার স্থলাভিষিক্ত হন এবং বিহার সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হয়ে রাজমুকুট ধারণ করেন। তিনি বিহার রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, নিজ নামে খুৎবা পাঠ করান এবং টাঁকশাল থেকে নিজ নামে মুদ্রাও অঙ্কিত করেন। তাই তার অভিষেকের সময় স্বীয় পিতার প্রস্তাবকে স্মরণ করে বিহার খান লোহানী ফরিদকে শের খান উপাধিতে ভূষিত করেন যা ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের রচিত দিনলিপি 'বাবুর নামায়' স্থান পায়। সুতরাং বলা যায় যে, বাঘ হত্যার সাথে শের খান উপাধির কোন যোগসূত্র নেই তবে এই উপাধি অর্জন কোনো আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনাও নয়।

পাদটীকা ও সূত্রসমূহ

১. সারওয়ানী : খণ্ড -১, পৃ. ৪৭। সারওয়ানী খণ্ড-২, পৃ. ৩৫। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
২. ডর্ন পৃ. ৮৯-৯০
৩. নিমাত আল্লা খণ্ড-১, পৃ. ২৭০। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
৪. নিমাত আল্লা : খণ্ড-২, পৃ. ৪০৪-৪০৫। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
৫. দাউদী : পৃ. ১১১-১১২। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
৬. রিজক আল্লা মুশতাকী, ওয়াকিয়াত-ই-মুশতাকী: ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির একটি *রোটোগ্রাফ কপি* যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ঢাকা : পৃ. ৯৩-৯৪
৭. কানুনগো পৃ. ৭১-৭৫
৮. বাবুর নামা বেভারিজ কৃত ইংরেজী অনুবাদ। দিল্লি পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৯, পৃ. ৬৬৪
৯. সারওয়ানী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
১০. নিমাত আল্লা : খণ্ড-১, পৃ. ২৭১। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
১১. ডর্ন : পৃ. ৯০
১২. দাউদী পৃ. ১১২। এখানে ফার্সি ভাষায় উদ্ধৃতি আছে
১৩. কানুনগো : পৃ. ৭৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট-দুই
শের খান সূরের অভিষেক

ইতিহাস গ্রন্থসমূহের সরবরাহকৃত উপাত্ত এবং প্রাপ্ত মুদ্রার তথ্যের অমিলের কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে শের খান সূরেরর অভিষেক কবে ও কোথায় হয়েছিল তা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। সারওয়ানী তার গ্রন্থ 'তারিখ-ই-শেরশাহী'[১]তে শের খানের অভিষেক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু অভিষেকটি কবে এবং কোথায় হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করায় ঐতিহাসিকদের নিকট বিবরণটি অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে নিজাম আল দিন বখশিই প্রথম যিনি ফার্সি ভাষায় লেখা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে চৌসার যুদ্ধের পর শের খান বাংলায় যান, শাহ উপাধি ধারণ করেন, নিজ নামে খুতবা পাঠ প্রচলন করেন।[২] এর পরে আব্দুল কাদের বাদাউনী, আবুল কাশিম ফিরিশতা এবং নিমাত আল্লা তাদের বিবরণে লেখেন যে ৯৪৬ হিজরি/১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শের খানের অভিষেক বাংলায় হয়। মিসেস ব্যাভারিজ[৩] অজ্ঞাত একজন লেখকের 'তারিখে খানদান-ই তাইমুরিয়া' নামে একটি গ্রন্থ থেকে, যা ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত নয়, শের খানের একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শন করেছেন যেখানে প্রতিচ্ছবির উপরের অংশে লেখা আছে যে শের খানের অভিষেকটি 'সওয়াদ এ বাংগালা-এ-সুলতানপুর' নামক স্থানে হয়েছিল। তবে এখানেও তারিখের উল্লেখ নেই। ক্যাম্পোস[৪] কর্তৃক সংগৃহিত পর্তুগিজ বিবরণ থেকে প্রকাশ পায় যে শের খান বাংলায় ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৪৫ হিজরিতে অভিষিক্ত হন। কিন্তু ৯৪৫ হিজরি/১৫৩৮ খ্রি. তারিখ অঙ্কিত শেরশাহের মুদ্রার[৫] আবিষ্কার সমসাময়িক এবং পরবর্তী ফার্সি ঐতিহাসিকদের এই বিবৃতি মিথ্যা প্রমাণ করে যে তার অভিষেক হয়েছিল ৯৪৬ হিজরি/১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে।

একইভাবে ৯৪৫ হিজরি/১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে টাকশালের নাম শেরগড় এবং ক্বিলা-ই-শের গড় অঙ্কিত শেরশাহের আরো মুদ্রার আবিষ্কার ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছে যে শেরশাহ নিজে কোথায় সুলতান হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন—বাংলায় নাকি শেরগড়ে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ সুত্র এবং বেভারিজের সংগৃহিত প্রতিকৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে অভিষেকটি হয়েছিল বাংলায়। পক্ষান্তরে আবিষ্কৃত মুদ্রা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি ঘটেছিল শেরগড় বা ক্বিলা-ই-শেরগড়ে।

ঢাকা জেলার রায়পুরায় (বর্তমানে তা নরসিংদী জেলাধীন) শেরশাহের প্রথম তাম্রমুদ্রা, যাতে ৯৪৫ হিজরি/১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ অঙ্কিত আছে কিন্তু টাকশালের নাম নেই, প্রাপ্তির

~ www.amarboi.com ~

পর ভট্টশালী পর্যবেক্ষণ করেন যে ৯৪৫ হিজরির দ্বিতীয় মাস অর্থাৎ সফর মাসে এবং ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ থেকে জুলাই মাসের মধ্যবর্তী সময়ে শের খানের অভিষেক গৌড়ে অনুষ্ঠিত হয়।[৬] এইচ, এন, রাইট[৭] ৯৪৫ হিজরি তারিখ অঙ্কিত শেরশাহের দুটি তাম্র মুদ্রার ও দুটি রৌপ্য মুদ্রা প্রকাশ করেন। একটি রৌপ্য মুদ্রা ভট্টশালীর আবিষ্কৃত মুদ্রার অনুরূপ কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এটিতে টাঁকশালের নাম শেরগড় অঙ্কিত রয়েছে। অন্য রৌপ্য মুদ্রাটি ক্বিলাহ-ই-শেরগড় থেকে জারিকৃত। এটাও ভট্টশালীর আবিষ্কৃত মুদ্রা থেকে ভিন্নতর। এই মুদ্রাটিতে 'ফরিদ আল দুনিয়া ওয়াল দিন' এবং পরে অন্য পিঠে আল সুলতান আল আদিল অঙ্কিত আছে। মুদ্রাগুলোর বিবরণ[৮] নিম্নরুপ

একটি মুদ্রায় সোজা পিঠ (obverse)	উল্টোপিঠ (Reverse)
বর্গের মধ্যে কালিমা,কালিমার পরে আয়তক্ষেত্রের মধ্যে বর্গাকারে আল আদিল	বর্গাকারের মধ্যে শেরশাহ আল সুলতান খাল্লাদা আল্লাহ মুলকাহু নিচে আয়তক্ষেত্রের মধ্যে ৯৪৫ হিজরি

অন্য মুদ্রায়

সোজা পিঠ	উল্টো পিঠ
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত মহানবীর প্রথম চারজন খলিফার নাম, প্রত্যেক অংশে একটি করে	নাগরী লিপিতে সুলতানের নাম শ্রী শের শাহী, ধারে (Margin) ফরিদ আল দুনিয়া ওয়াল দিন আবুল মুজাফ্ফর

শেরশাহের অভিষেক এর তারিখ ও স্থান প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কানুনগো দুই বার অভিষেক এর তত্ত্ব প্রচার করলেন। তিনি লিখেছেন: ৯৪৫ হিজরির মহররম মাসের শুরুতে (যা শুরু হয় ৩০ মে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলা জয় করার অধিকার বলে শের বাংলা রাজ্যের উপর তার সার্বভৌমত্বের দাবী ঘোষণা করেন। মোগলরা যখন বাংলার দ্বারপ্রান্ত গারহীতে কামান দাগছিল, তার মধ্যেই তিনি গৌড় শহরে সিংহাসনে আরোহণের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। তারপর ১৫৩৯ সালে হুমায়নকে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করে দ্বিতীয় অভিষেক সম্পন্ন করেন।[৯] দ্বিতীয় অভিষেক প্রসঙ্গে কানুনগো লিখেছেন ৯৪৬ হিজরি /১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শের খান গৌড় সফর করেন। এই সফরে সবচেয়ে জাঁকজমক ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি ছিল তার দ্বিতীয়বার সিংহাসন আরোহণ বা অভিষেক। সুতরাং শেরশাহের দুইটা অভিষেকই গৌড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একটি ৯৪৫ হি./১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপরটি ৯৪৬ হি./১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে।[১০]

একই প্রসঙ্গে আলোচনায় ড. করিম লিখেছেন ৯৪৫ হি./১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের খানের বাংলায় অভিষেক অনুষ্ঠানের মত কোন সময় বা সুযোগ ছিল না। কারণ গৌড়

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ত্যাগের জন্য তার উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। তিনি আরো বলেন যে ঝাড়খন্ডের পথ ধরে গৌড় ছেড়ে রোহতাসগড় যাওয়ার সময় শের খান পশ্চিমে মোড় নেন এবং কনৌজ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা থেকে মোগলদের তাড়িয়ে দিয়ে ঐসব এলাকার উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি সেখানে রাজস্ব আদায় করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে শেরগড়ে নিজের অভিষেক সম্পন্ন করেন। শেরগড় সাসারামের উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং এখানে তিনি নিজে একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন। এই সময়টা হচ্ছে কনৌজ পর্যন্ত দেশটির দখল এবং গৌড় থেকে হুমায়নের ফিরে আসার মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ/৯৪৫ হিজরির রমজান থেকে শাওয়াল পর্য্যন্ত।[১১]

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে ধারণকৃত বিবরণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি: 'চৌসার যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার পর খাজা নিমাত আল্লা[১২] বলেন অদৃশ্য শক্তিই (এখানে সৃষ্টিকর্তা) শের খানকে এই যুদ্ধে জয়ী করেছেন। তিনি অনেক ধন সম্পদ ও অসংখ্য হাতির মালিক হয়েছেন। সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে শের খান বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। গরহী অর্থাৎ তেলিয়াগড়ে পৌঁছে তিনি মোগল গভর্নর জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে ঘেরাও করেন। জাহাঙ্গীর কুলী বেগ বারংবার যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সমগ্র বাংলা শের খানের দখলে আসে। তিনি সেখানে তার সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন, নিজ নামে খুৎবা পাঠ করান এবং সেখান থেকে নিজ নামে মুদ্রাও অঙ্কিত করেন।'

সম্রাট হুমায়ুনের বাংলা অভিযান সম্পর্কে নিমাত আল্লার বক্তব্য হচ্ছে[১৩] 'জান্নাত আশিয়ানী (হুমায়ন) গরহীর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গৌড় এর দিকে মোড় নিলেন। শের খান তখন গৌড়ে অবস্থান করছিলেন, বিদ্রোহ করে নিজেই সরকার গঠন করেছিলেন কিন্তু হুমায়নের বিপক্ষে মোকাবিলা করার মত শক্তি তার ছিল না। তাই তিনি গৌড় ছেড়ে ঝাড়খণ্ড হয়ে রোহতাসের দিকে চলে গেলেন।'তারিখ-ই-দাউদীর'[১৪] তথ্য প্রমান নিম্নরূপ ৯৪৬ হিজরিতে শের খান চৌসার যুদ্ধে জয়ী হলে আফগানেরা তাকে সিংহাসনে আসীন করে, তার মাথার উপর রাজছত্রী খুলে দেয়, তার নামে খুৎবা পাঠ করানো হয় এবং তার নামে মুদ্রাও চালু করা হয়। শেরশাহ 'শাহ আলম' উপাধি ধারণ করেন।

'জুলুসে শের খান' নামে ভিন্ন একটি শিরোনামে শেরশাহের সিংহাসন আরোহণের উপর লিখতে গিয়ে আব্বাস সারওয়ানীর বক্তব্য নিম্নরূপ :[১৫] 'শের খান, যিনি হযরত-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে তার মুন্সিদের ডেকে বললেন যুদ্ধের জয়বার্তা রাজ্যের সেই সকল অঞ্চলে অমাত্যদের পাঠানো হউক যেখানে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মসনদে আলী উমর খানের পুত্র মসনদে আলী ঈশা খানকে খান-ই-আজম উপাধি দেওয়া হলো। তিনি প্রস্তাব করলেন যে জয় বার্তাটি ফরমান আকারে পাঠানো যেতে পারে। শের খান বললেন, এটা আমার জন্য সম্মানের যে আপনাদের মত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যারা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুলতান বাহালুল লোদী এবং সিকান্দার লোদীর অমাত্য ছিলেন, তারা আফগানদের সম্মান রক্ষার্থে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন। আমি একজন নগন্য ব্যক্তি। এটা আমার জন্য শোভা পায় না যে আপনারা আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর এই জয় বার্তা ফরমান আকারে আপনাদের পাঠাবো। দেশের রাজা জীবিত অবস্থায় সাম্রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেছেন কিন্তু এখনও বিরাট অঞ্চল তার শাসনাধীনে রয়ে গেছে।

মসনদে আলী ঈশা খান বুঝতে পারলেন যে শের খান সিংহাসনে আসীন হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন। মিয়া বাবন লোদী এবং অন্যান্য অমাত্যরা একযোগে বলে উঠলেন মসনদে আলী ঈশা খান কাকবুর সারওয়ানী এবং আজম হুমায়ন সারওয়ানীর মত সম্মানীত অমাত্য আফগান সেনাবাহিনীর মধ্যেআর কেউ নেই। তারা সঠিক কথা বলেছেন এবং এই ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিৎ হবে না। শের খান এই কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন যে রাজকীয় উপাধি ধারণ বিশাল এক দায় কিন্তু এটি কন্টকমুক্ত নয়। তবুও যেহেতু আমার বন্ধুদের ইচ্ছা হচ্ছে আমি রাজমুকুট পরিধান করি, আমি তাতে সম্মতি দিলাম। সিংহাসনে আরোহণের শুভক্ষণ নির্ধারণ করতে তিনি জ্যোতিষিদের আদেশ দিলেন। জ্যোতিষিরা গণনা শেষে উল্লাসিত হয়ে বলেন, 'আপনার ভাগ্যের শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। এই ক্ষণে যদি আপনি সিংহাসনে অসীন হন তাহলে আপনাকে এবং আপনার সেনাবাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে হবে না। তিনি সিংহাসনে আসীন হলেন, রাজছত্রী তার মাথার উপর খুলে দেওয়া হলো এবং তিনি শেরশাহ নাম ধারণ করলেন। তার নামে খুতবা পাঠ করা হলো, মুদ্রা জারি করা হলো এবং তিনি শাহ আলম উপাধি ধারণ করলেন। তিনি মসনদে আলী ঈশা খান ও কাকবুর সারওয়ানীর উদ্দেশ্যে বল্লেন "যেহেতু আপনি শেখ মুলহী কাত্তাল এর পুত্র এবং যেহেতু আপনি আমার নামে খুতবা পাঠ করিয়েছেন এবং মুদ্রা জারি করেছেন, সুতরাং আপনিই স্বহস্তে আমার জয়বার্তা বিবরণ লিখে দেন। মুনশিরা এর অনুলিপি তৈরি করবে। তাই মসনদে আলী ঈশা খান কাকবুর নিজ হাতে বার্তাটি লিখলেন এবং মুন্সিরা তার অনুলিপি তৈরি করলেন। রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চলে শেরশাহের অধীনে এসেছিল সেখানে অমাত্যদের নিকট জয়বার্তা পাঠানো হলো। সাত দিন যাবৎ জয়োৎসব চলতে থাকল, ঢোল বাজতে লাগলো এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে আফগান যুবকেরা নিজ নিজ প্রথানুসারে নাচে গানে মত্ত হলো। গায়কদের পুরস্কৃত করা হলো। শেরশাহের ভৃত্যরা জাফরান, মুশক, গোলাপ এবং আম্বার মিশ্রিত শরবত নৃত্য গীতরত যুবকদের মধ্যে পরিবেশন করলো ও তাদের উপর ছিটানো হলো। তাদের আরো অনেক উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হলো। এ সব পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের স্বর্গের আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া হলো। রাজ্যের সর্বত্রই জয়বার্তা পৌছানোর সাথে সাথে এ উৎসব পালিত হলো।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পর্তুগিজদের বিবরণী থেকেও একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং উপরোল্লিখিত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে সারওয়ানী ব্যতীত সকল ফার্সি ভাষার ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন যে :

ক) শের খান চৌসার যুদ্ধের পর ৯৪৬ হিজরি/১৫৩৯ খিষ্টাব্দে বাংলায় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

খ) তিনি 'শাহ' ও শাহ আলম' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

গ) সারওয়ানী শের খানের অভিষেকের স্থান ও তারিখ উল্লেখ করেন নি।

আবার প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে আহরিত তথ্যে দেখা যায় :

ক) শের খান ৯৪৫ হিজরি/ ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন।

খ) যেহেতু রৌপ্যমুদ্রা এবং তাম্র মুদ্রায় একই তারিখ ৯৪৫ হি./১৫৩৮ খ্রি. দেখা যায় সুতরাং সময়টা মীমাংসিত বলা যায়। কিন্তু কোনো মুদ্রায় টাকশালের নাম আছে আবার কোনোটায় নেই। কাজেই সিংহাসন কোথায় আরোহণ করেছিলেন তা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে।[১৬]

গ) তিনি মুদ্রায় যে উপাধি গ্রহণ করেন তা হচ্ছে ১. আল সুলতান আল আদিল ২. খলিফাত আল জামান

সুতরাং বিভিন্ন সুত্রের তথ্যের ভিন্নতা রয়েছে। মুদ্রার তথ্যানুযায়ী ৯৪৫ হিজরিতে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়ে (স্থান যেটাই হোক না কেন) কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে ৯৪৬ হিজরিতে চৌসার যুদ্ধের পর শের অভিষিক্ত হয়েছিলেন। আবার প্রথম দিককার ঐতিহাসিক সুত্র থেকে জানা যায় যে অভিষেক বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো কেবল অঙ্কিত ধাতব পর্দাথ নয় বরং স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতীক। রাজা বা স্বাধীন সুলতান ছাড়া অন্য কারো জারি করা টাকা জনগণ গ্রহণ করতেন না। সুতরাং আমরা কিছুটা নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি যে শেরশাহের অভিষেক ৯৪৬ হিজরিতে হয়েছিল এবং মুদ্রাও অঙ্কিত করা হয়েছিল। আবার ইতিহাস পণ্ডিতেরা ঘটনার যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে দেখিয়েছেন যে চৌসার যুদ্ধের পর শেরশাহের অভিষেক হয়েছিল তাও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মুদ্রায় অঙ্কিত তারিখ (৯৪৫ হিজরি) আর চৌসার যুদ্ধের (৯৪৬ হিজরি) মধ্যবর্তী সময়ে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। এই সময়কালে শেরশাহের ক্ষমতা খর্ব না হলেও তার মর্যদার ক্ষতি হয়েছিল। কারণ সম্রাট হুমায়ন গৌড় (৯ মাস) দখলে রেখেছিলেন এবং সেখানে অবস্থানও করেছিলেন। তাহলে ঐ সময়টাতে শেরশাহ কী স্বাধীন সুলতান ছিলেন যখন তার প্রতিপক্ষ (শত্রু) হুমায়ন জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে গৌড়ে রাজত্ব করছিলেন? শেরশাহ যদি স্বাধীনতা হারিয়ে থাকেন তাহলে চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ করে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা ঘোষণা করাটা জরুরী ছিল। উপরোক্ত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কানুনগো লিখেছেন "৯৪৫ হিজরি/১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহের এই সফরের সময় গৌড়ে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি ছিল তার দ্বিতীয় অভিষেক। এক বছর

আমরা দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগে তার প্রথম অভিষেকটি হয়েছিল অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে গরহীতে হুমায়ুনের কামানের গর্জনের মধ্যে। ফলে বাংলার জনগণের মন থেকে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ও নৈতিক প্রভাব হারিয়ে গিয়েছিল কারণ বাংলার জনগণ শের খান এর গৌড় ছেড়ে যাওয়ার পর মোগলদের আগমনকে বরণ করে নিয়েছিল একই রকম উদাসীনতায়। তাই শের খানের জন্য নতুন করে তার রাজত্বের সার্বভৌমত্ব ঘোষণার প্রয়োজনীয়তায় দ্বিতীয় অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করা জরুরী ছিল।[১৭]

কিন্তু সারওয়ানী তার বই তারিখ-ই-শেরশাহী ৯৮৭ হিজরি/১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সংকলন করেছিলেন। তিনি আকবরের রাজদরবারে ওয়াকিয়ানবীশ বা সংবাদ লেখকের কাজ করতেন। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল দেখার তার সুযোগ ছিল। শের খানের সাথে তার পারিবারিক যোগাযোগও ছিল। যাদের বাবা বা দাদারা এই সময়ে জীবিত ছিলেন তাদের সঙ্গেও তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এই সময়ের চাক্ষুস স্বাক্ষীর নিকট থেকেও তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তার বই 'জুলুস-ই-শের খান' (শের খানের অভিষেক) নামে একটি ভিন্ন শিরোনামে শের খানের অভিষেকের একটি বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন যা মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রবর্তী সুত্র। সুতরাং শেরশাহের অভিষেক সম্পর্কে সারওয়ানীর তথ্যকে আমরা একেবারে অস্পষ্ট বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যেমনটি আমরা দেখিয়েছি ১৫২৬ খ্রি. থেকে ১৫৩৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়টি আফগান ও মোগলদের মধ্যে বাংলায় ও বিহারে অহরহ যুদ্ধ, সীমানা দখল ও পুনঃদখল লেগেই ছিল। সুলতান গিয়াস আল দিন মাহমুদ শাহ তার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান আলা আল দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। নিহত ফিরোজের প্রতিনিধি হিসাবে মাখদুম-ই-আলম এর পক্ষে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করা যেহেতু দুর্বল হয়ে পড়ে, তিনি সুলতান মাহমুদ শাহকে সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। একইভাবে বিহারে শের খান নাবলক সুলতান জালাল খান লোহানীর অভিভাবক হিসাবে অর্থাৎ মুকুট বাহী রাজা হিসাবে শাসন পরিচালনা করছিলেন। উভয়েই নিজের জন্য রাজ্য গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং মাখদুম-ই-আলম এবং শের খান উভয়েই সুলতান মাহমুদ শাহের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে উঠেছিলেন। তাই সুলতান মাহমুদ শাহ মাখদুম ই আলমকে তার পথ থেকে সরানো ও বিহার দখলের পরিকল্পনা করেন। তিনি মাখদুম-ই-আলমকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন। কিন্তু ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যতবারই শের খানের সাথে বাংলা বা বিহারে যুদ্ধ হয়েছে বাংলার সেনারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। হুমায়ুনও চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। সুতরাং 'দেশের রাজা পালিয়ে গেছে এবং তার অধীনে এখনও বিরাট অঞ্চল আছে' মর্মে সারওয়ানীর বিবরণ সুলতান মাহমুদ শাহ ও হুমায়ন উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক) ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহ পরাজিত হয়ে গৌড় ছেড়ে পলায়ন করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের এক বড় অংশের উপর তার শাসন কর্তৃত্ব ছিল। শের খান আনুষ্ঠানিকভাবে গৌড় জয় করার অধিকারে বাংলার উপর সার্বভৌমত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন।

খ) সম্রাট হুমায়ন গৌড়ে শের খানকে আক্রমণ করেন এবং তাকে গৌড় ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন। হুমায়ন গৌড় দখল করে সেখানে নয় মাস অবস্থান করেন।

গ) ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শের খান হুমায়নকে চৌষার যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে হুমায়ন জীবিত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। শের খান বাংলা অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হন এবং তেলিয়াগড়ে বাংলার মোগল গভর্নর জাহাঙ্গীর কূলি বেগকে সমস্ত সৈন্যসহ হত্যা করেন। এভাবে শের খান তার পশ্চাতে অবস্থান নেয়া শত্রু থেকে মুক্ত হন। সম্রাট হুমায়ন গৌড় দখল করে নিলে শের খানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং তিনি নতুনভাবে বাংলায় তার সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন এবং পুনরায় তার নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি হয়।

ঘ) সম্রাট হুমায়ন বিলগ্রামের যুদ্ধে আবার পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন। তথাপিও তিনি দিল্লি এবং আগ্রার সম্রাট ছিলেন। সাম্রাজ্যের বিরাট একটা অংশের উপর তার কর্তৃত্ব তখনও বহাল ছিল। সুতরাং শের খান

১. ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শক্তিশালী সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে এবং

২. ১৫৩৯ খ্রি এবং ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে পর পর দুটি যুদ্ধে পরাক্রমশালী মোগল সম্রাট হুমায়নকে পরাজিত করেন।

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবর আফগানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে দিল্লি অধিকার করেন। ফলে দিল্লির শাসন ক্ষমতা আফগানদের হাত থেকে মোগলদের হাতে চলে আসে। শের খান কোন সুলতান ছিলেন না এবং সুলতানের পুত্রও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাসারামের সাধারণ জাগিরদারের পুত্র। ফলে যখনই তিনি কোনো সুলতান বা সম্রাটকে পরাজিত করেছেন, তখনই তার জন্য সার্বভৌমত্ব ঘোষণা দেওয়াটা অপরিহার্য ছিল। এছাড়াও ক্যাম্পোস এর বর্ণনা মতে[১৮] ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহ নিজেকে বাংলার সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন এবং পরের বছর পাঁচ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সম্রাট হুমায়নকে কণৌজের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং দিল্লির মসনদে আরোহণ করেন।

উপরোক্ত তথ্যগুলো তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনার সঠিক তারিখের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য। এ তথ্যগুলো আমাদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থে সচরাচর পাওয়া যায় না। পর্তুগিজ বণিকেরা এ সকল ঘটনাবলি যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ, জয়, পরাজয়, ক্ষমতার হাত বদল ইত্যাদি বিষয়ে খুব সংবেদনশীল ছিলেন। কারণ এগুলি তাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতো। পর্তুগিজ বণিকেরা সুলতান মাহমুদ শাহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পক্ষে গৌড়ের যুদ্ধে শের খানের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সুতরাং তাদের ভাষ্য সারওয়ানীর জুলুস-ই-শের খান নামক প্রত্যয়নকে আরো শক্তিশালী করেছে।

সুতরাং প্রাপ্ত সকল ঐতিহাসিক ও মুদ্রার তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শের খান বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়নের উপর বিজয় লাভের পর পরাজিত মোগল সম্রাটকে তাড়া করতে চাপ প্রয়োগ করেন। যেহেতু হুমায়ন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের খানকে গৌড় ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন, শের খান তখন তাকে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। ফলে দিল্লির মসনদ শুন্য হয়ে পড়ে। শের খান দিল্লি প্রবেশ করেন, মোগল সিংহাসন অধিকার করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে আসীন হন, মুকুট পরিধান করেন, শাহ উপাধি ধারণ করেন, সিক্কা জারি করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ প্রচলন করেন। ১৫২৬ সালে বাবর লোদী আফগানদের পরাজিত করে দিল্লি থেকে বিতাড়িত করেন। এখন শের খানের প্রয়োজন ছিল দিল্লির উপর তার রাজত্ব ঘোষণা করে মোগল রাজধানী দিল্লিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তিনি একটি ফরমান (রাজ আদেশ) জারি করেন এবং আফগান নিয়ন্ত্রিত সকল এলাকায় তার অনুলিপি প্রেরণ করেন যাতে তার অভিষেকটা আফগান প্রথানুযায়ী জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। সম্ভবত এই অভিষেকটাই সারওয়ানী বিশাদ বর্ণনা দিয়েছেন তার 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থের ভিন্ন একটি শিরোনামের 'জুলুস-ই-শের খান' এ। সারওয়ানী বলেন, 'সাতদিন ধরে আনন্দের ধারায় বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় এবং প্রথানুসারে আফগান তরুণেরা দলবদ্ধভাবে নাচ-গানে মত্ত থাকেন। গায়কদের পুরষ্কৃত করা হয়। শের খানের ভৃত্যরা জাফরান, মুশক, গোলাপ এবং আম্বার মিশ্রিত শরবত পরিবেশন করলো। এসব সুগন্ধ মিশ্রিত পানি নাচিয়েদের উপর ছড়ানো হলো। অনেক ধরনের উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হলো। এবং এগুলো পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে স্বর্গের আবহের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলো। জয়বার্তা পৌঁছানো সব এলাকায় এ উৎসব পালিত হলো।

তাই দেখা যায়, শের খান বাংলার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির মসনদেও আরোহণ করেছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে সূর আফগানদের শাসন পুনরুদ্ধার করে সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেন। তিনি অভিষেকটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে আফগান ঐতিহ্যে উদযাপন করেন। এটা সম্ভবত সিংহাসনের বৈধ দাবীদার হিসাবে শের খানের তৃতীয় উৎসবমুখর অভিষেক।

টীকা ও সূত্র

১. সারওয়ানী খণ্ড-১ পৃ. ৯৩-৯৫। এলিয়ট ও ডাউসন হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়ান এজ টোল্ড বাই ইটস ঔন হিস্টোরিয়ানস : খণ্ড-৪; পুনর্মুদ্রণ সুশীল গুপ্ত এন্ড কো : কলি পৃ-৯৪

২. নিজাম আল দিন বকশী : তাবাকাত-ই-আকবরী : বিবলিওথিকা ইন্ডিকা সিরিজ। মুলগ্রন্থ পৃ. ১০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩. গুলবাদান বেগম : হুমায়ন নামা : মিসেস বিভারেজ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, কলি ১৯০২; পুনর্মুদ্রণ : দিল্লি, ১৯৭২, পৃ. ১৩৩
৪. জে.জে.এ ক্যাম্পোস দি হিষ্ট্রি অব দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল; পুনর্মুদ্রণ, পাটনা ১৯৭৯, পৃ. ৪১
৫. ইসলামিক কালচার, জানুয়ারী ১৯৩৫, পৃ. ১৩০
৬. উপরোল্লিখিত : পৃ. ১৩০
৭. এইচ.এন. রাইট দি কয়েনেজ এন্ড মেট্রোলজি অব দি সুলতানস অব দিল্লি, ১৯৩৬; সংখ্যা : ১০৪০A, ১০৪০B, ১২৫৭ এবং ১২৭০
৮. জেএএসপি, ৫ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃ. ৬৩। এইচ,এন,রাইট দি কয়েনেজ এন্ড মেট্রোলজি অব দি সুলতানস অব দিল্লি, ১৯৩৬, সংখ্যা : ১০৪০A, ১০৪০B, ১২৫৭ এবং ১২৭০
৯. কানুনগো পৃ. ১৮৯
১০. উপরোল্লিখিত : পৃ. ২২০-২২১
১১. জে,এ,এস,পি-৫ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃ. ৭১
১২. নিমাত আল্লা ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৩০৬
১৩. উপরোল্লিখিত ১ম খণ্ড পৃ. ২৯৩
১৪. দাউদী : পৃ. ১২৬
১৫. সারওয়ানী : ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪৪; ২য় খণ্ড : পৃ. ১০১-১০৪
১৬. জে,এ,এস,পি, ৫ম খণ্ড, ১৯৬৪, পৃ. ৬৩-৭১
১৭. কানুনগো : পৃ. ২২০-২২১
১৮. ক্যাম্পোস পৃ. ৪১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারিভাষিক শব্দকোষ

১.	আদল	ন্যায় বিচার।
২.	আগমহল	অগ্রবর্তী ঘাঁটি (তেলিয়াগড় গিরিপথে, রাজমহল পবর্তমালায়, বাংলায়)।
৩.	আলিম	(উলেমা শব্দের বহুবচন) জ্ঞানী ব্যক্তি।
৪.	আম্বর	সুগন্ধ।
৫.	আমিন	সরকারি কর্মকর্তা যিনি একটি এলাকা (এষ্টেট) এর দায়িত্বে নিয়োজিত, সরকারি কোষাগারে রাজস্ব আদায় করেন, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; একজন সার্ভেয়ার।
৬.	আমির	রাজনৈতিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।
৭.	বাম খানা	রাজপ্রাসাদে সমান দূরত্বে অবস্থিত স্তম্ভসমূহ। সম্মুখ বা পশ্চাদভাগস্থ স্তম্ভ সমূহ।
৮.	বাঁদী	দাসি।
৯.	বঙ্গ	পূর্ব বাংলার নিম্নাঞ্চল সমূহ।
১০.	বারিদ	ডাক বিভাগ।
১১.	বাজার	দৈনিন্দন ক্রয় বিক্রয়ের স্থান।
১২.	বিন	বাঁশী।
১৩.	বাজখানী	গান গাওয়ার একটি ধরন।
১৪.	চাং	বাদ্যযন্ত্র, তারদিয়ে তৈরি বাদ্য যন্ত্র যা দুটি দণ্ড দিয়ে বাজানো হয়।
১৫.	চাটগাম	চট্টগ্রাম।
১৬.	চৌধুরী	আধা সরকারি স্থানীয় কর্মকর্তা যিনি জমি পরিমাপের ক্ষেত্রে রায়তদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কৃষকের পক্ষে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা তাকে কিছু ফি প্রদান করা হয় ।
১৭.	চিশতিয়া	আজমিরের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রা.) এর অনুসারিবৃন্দ।
১৮.	দবির	সচিব, লেখনীতে পটু, বচন ও বাক্য ভঙ্গীতেও দক্ষ।
১৯.	দ্বারভাঙ্গা	বাংলার প্রবেশ পথ।
২০.	দারোগা	বিশেষ এলাকা তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা বা পরিদর্শক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২১.	দিওয়ান	রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
২২.	দর্জি	কাপড় সেলাই করেন যিনি।
২৩.	দরগাহ	আধ্যাত্মিক গুরুর সমাধিস্থল।
২৪.	দরবেশ	ধর্মীয় ভিক্ষুক।
২৫.	ধ্রুপদ	সঙ্গীতের লয়।
২৬.	দিহি	একটি গ্রাম।
২৭.	দোরা	আড়া আড়ি গমনকারী রাস্তা।
২৮.	ফকির	ভিক্ষুক।
২৯.	ফরমান	সার্বভৌম রাজাদেশ।
৩০.	ফৌজদার	সীমান্তবর্তী জেলা অথবা দুর্গ যা বেসামরিক বা সাধারন উভয় কার্যাবলী সম্পাদন করে এমন কিছুর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
৩১.	গঞ্জ	বিপনীকেন্দ্র, পাইকারি বাজার, গুদাম ঘর।
৩২.	গোয়াল	দুগ্ধ আহরণ / বিক্রয়কারী ব্যক্তি।
৩৩.	গোপীজ	গায়িকা / শ্রীকৃষ্ণের গায়িকা (হিন্দুদেবী)।
৩৪.	গোর	সমাধি/কবর।
৩৫.	গোমস্তা	খাজনা বা বাড়ি ভাড়া আদায়ের জন্য জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি।
৩৬.	হযরত-ই-আলা	মহামান্য, উচ্চপদস্থ আফগান ব্যক্তি।
৩৭.	হাট	নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম্য বাজার/সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে গ্রাম্য বাজার।
৩৮.	হুকুমনামা	জনগনের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের দৈনন্দিন নির্দেশনা।
৩৯.	হুলিয়া	দৈনন্দিন বিবরণী / বিবরণী।
৪০.	ইবাদত খানা	প্রার্থনালয়।
৪১.	ঈদ	ঈদ উল ফিৎর উৎসব যা রমজান মাসের শেষ রোজা ভঙ্গের পরের দিন পালিত হয়। ঈদুল আজহা, কোরবানীর উৎসব যা ঈদুল বাকারা বা ঈদুল কুরবান নামেও পরিচিত।
৪২.	ঈদগাহ	দুইটি ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য উন্মুক্ত মাঠ / স্থান।
৪৩.	ইমাম	নামাজ এ নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি।
৪৪.	ইকলিম	বাংলায় মুসলিম শাসকের অধিনে একটি অঞ্চল।
৪৫.	ইকতা	ফাইফ।
৪৬.	জান্নাতাবাদ	গৌড়ের উপাধি, স্বর্গ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৭.	জলকর	জলাশয় বা জলাভুমির রাজস্ব।
৪৮.	জাগির	জাগিরদারের সহায়তার জন্য নির্ধারিত জমির জন্য প্রদত্ত রাজস্ব।
৪৯.	জাগিরদার	জাগির এর মালিক।
৫০.	জোলাহা	জোলা বা তাঁত বুননকারী।
৫১.	কাবারি	মাছ বিক্রেতা।
৫২.	কাগচা	কাগজের টুকরা।
৫৩.	বাজ-ই-খাস	বাজে কাগজ।
৫৪.	কাগচি	কাগজ প্রস্তুত কারক।
৫৫.	কাল	ভিক্ষুক।
৫৬.	কালিমাহ	আল্লাহর একত্ব ও নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা; ইসলামের প্রথম স্তম্ভ।
৫৭.	কারকুন	নিবন্ধক, ব্যবস্থাপক।
৫৮.	কসাই	গরু/পশু হত্যাকারী।
৫৯.	খসড়া	বাজে কাগজ।
৬০.	খানকাহ	মসজিদ / মাদ্রাসা সংলগ্ন জীবিত দরবেশের আবাসস্থল। সূফিদের জন্য আবাসস্থল যেখান থেকে সূফিবাদ প্রচার ও চর্চা করা হয়।
৬১.	খাকাহ	মুসলিম দরবেশের সরাইখানা।
৬২.	খলিফা	মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (ধর্মীয় বিশ্বাসের)।
৬৩.	খিলাফাত	খলিফার শাসনকাল।
৬৪.	খিয়াল	সঙ্গীতের লয় / দল।
৬৫.	খাজাঞ্চি	ট্রেজারার বা কোষাধ্যক্ষ, ক্যাশিয়ার।
৬৬.	খাজানা	রাজস্ব।
৬৭.	খাজানাদার	রাজস্ব কর্মকর্তা/রক্ষক।
৬৮.	খুৎবা	মসজিদে বা ঈদগাহে ঈদের/জুমার নামাজের পূর্বে দেয়া বক্তব্য।
৬৯.	কীর্তন	হিন্দু ধর্মীয় সঙ্গীত।
৭০.	করোহ / কোস	দুই মাইল সমপরিমাণ দৈর্ঘ্যর মাপ।
৭১.	কোতওয়াল	নগর পুলিশ তত্বাবধায়ক।
৭২.	লিউট	বাঁশী।
৭৩.	মৌজা	গ্রাম।
৭৪.	মাদ্রাসা	মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
৭৫.	মহল	রাজস্ব আহরণের স্থান / উৎস, ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭৬.	মাহদী	ধর্মীয় পবিত্রতা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিম বিশ্বাসের সহস্রাব্দ পূর্তিতে ইসলামের পুনঃজীবনদানকারী হিসাবে আবির্ভাবের সম্ভাব্য ব্যক্তি।
৭৭.	মাখদুম	ধর্মীয়/রাজনৈতিক ভাবে যিনি সেবা দান করেন।
৭৮.	মক্তব	মুসলিম ধর্মীয় নিম্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
৭৯.	মসজিদ	মুসলিম প্রার্থনালয়।
৮০.	মসনদ	সিংহাসন।
৮১.	মসনদ-ই-আলী	আফগান উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক ব্যক্তি।
৮২.	মাতব্বর	গ্রাম্য প্রধান (বাংলার মুদাব্বির শব্দের অপভ্রংশ)
৮৩.	মাশায়েখ	শাইখ শব্দের বহুবচন (শাইখ অর্থ আধ্যাত্মিক গুরু)
৮৪.	মৌজা	একগুচ্ছ গ্রাম।
৮৫.	মুয়াজ্জিন	মসজিদ থেকে যিনি আযানের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রার্থনার আহ্বান জানান।
৮৬.	মুদাব্বির	গ্রাম্য প্রধান।
৮৭.	মোগলমারি	বাংলায় একটি স্থানের নাম যেখানে কোন এক যুদ্ধে অংসখ্য মোগল সৈন্যকে হত্যা করা হয়।
৮৮.	মুহতাসির	প্রকাশ্য অনৈতিক কার্যকলাপ যিনি প্রতিহত করেন।
৮৯.	মুকেরি	গরু/মহিষ এর গাড়ি চালক।
৯০.	মুল্লা	ইসলামী আইনে পণ্ডিত ব্যক্তি, শিক্ষিত জন, পণ্ডিত।
৯১.	মুলুক আল তাওয়ায়েফ	স্বাধীন ছোট ছোট রাজ্য, ছোট ছোট রাজ্যপাল, (শেরশাহ ছোট ছোট রাজ্য ও রাজ্যপাল সৃষ্টি করেছিলেন যারা অভ্যন্তরীনভাবে পরস্পর থেকে স্বাধীন ছিলেন, নেতৃত্বে ছিলেন একজন করে আফগান জাগিরদার, তত্বাবধানে ছিলেন একজন আমিন যিনি পদধারী প্রধান এবং বাংলায় বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার দায়িত্বে নিয়োজিত)।
৯২.	মুন্সি	শ্রুতি লেখক, ফার্সি ভাষার সচিব।
৯৩.	মুন্সিফ	বিচারক।
৯৪.	মুকাদ্দাম	গ্রাম্য প্রধান ব্যক্তি।
৯৫.	মুতাসাররিফ	রাজস্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
৯৬.	মুশরিফ	রাজস্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
৯৭.	মৃগবতী	হিন্দিভাষায় লিখিত রোমান্টিক কবিতা।
৯৮.	মদদ-ই-মা	ধর্মীয় দান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯৯. নায়েব	সহকারি।
১০০. নালা	ছোট প্রবাহমান জলাধার।
১০১. নাওওয়ারা	নৌকার তৈরি আবাসন।
১০২. নদী	নদী।
১০৩. পাচ মহল	পিছনের ফাঁড়ি (বাংলায় তেলিয়াগড় দূর্গের পিছনের অংশ)।
১০৪. পরগনা	কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছোট রাজস্ব জেলা।
১০৫. পাটোয়ারী	গ্রাম্য হিসাব রক্ষক।
১০৬. পীর	ধর্মীয় গুরু।
১০৭. পিঠারি	রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।
১০৮. পাখওয়াজ	এক ধরনের সঙ্গীত বাদ্য যন্ত্র, ড্রাম।
১০৯. কাজী	বিচারক, বিচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
১১০. কালান্দার	ভ্রাম্যমান মুসলিম আধ্যাত্মিক ফকির।
১১১. কানুনগো	আইন ও প্রথার প্রচারক, একশ্রেণির রাজস্ব কর্মকর্তা।
১১২. কিলা	দুর্গ।
১১৩. কানুন	আইন।
১১৪. কুরআন	মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থ।
১১৫. রইস	সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি/পরিবার।
১১৬. রাউলি	বুদ্ধ ধর্মাবলম্বি শিক্ষাগুরু।
১১৭. রংরেজ	রংকারক, রংমিস্ত্রি।
১১৮. রাজধানী	রাজধানী শহর।
১১৯. রাজধ্বনী	সার্বভৌমত্ব ঘোষণা পত্র।
১২০. রিকাব	থালা, বাসন।
১২১. সদর	জেলা, প্রধান কার্যালয়; বিচার ও ধর্মীয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
১২২. সা'দাত	মুসলিম শিক্ষিত বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
১২৩. সামা	মুসলিম ধর্মীয় ভক্তিগীত; বিশেষত চিশতীয়া তরিকার অনুসারিরা চর্চা করে থাকেন।
১২৪. সানাকার	তাঁত বয়নশিল্পী, রং মিস্ত্রি।
১২৫. সংকীর্ণগলি	রাজমহল পর্বতমালার সংকীর্ণ পথ/ভূমি, একে সিকরিগলিও বলা হয়।
১২৬. সরাই	পর্যটকদের জন্য বিশ্রামস্থল।
১২৭. সনদ	দলিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১২৮. সরকার	প্রদেশের মহকুমা যা অনেকগুলো পরগনার সমন্বয়ে গঠিত; রাজকুমার বা অমাত্যদের প্রশাসনকেও সরকার বলা হয়।
১২৯. সরকার-ই-আলী	সরকার প্রধান।
১৩০. সার-ই-লস্কর	আক্রমনকারী বাহিনীর প্রধান।
১৩১. সৈয়দ	মহানবীর উত্তরসুরী (বংশানুক্রমে)।
১৩২. শরীফ	মহৎ পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী।
১৩৩. শিকদার	এক খণ্ড জমির প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
১৩৪. সিপাহসালার	সেনাপতি।
১৩৫. সুবহদার	মোগলদের অধীন একজন গর্ভনর এর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি।
১৩৬. সূফি	মুসলিম ধর্মীয় গুরু।
১৩৭. সুর্নাই	বাদ্যযন্ত্রের নলসমূহ।
১৩৮. শারিয়া	ইসলামী আইন সমূহ।
১৩৯. তাম্বুর	বাঁশী, এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।
১৪০. তরফ	জমিদারি কে তরফ এবং জমিদারকে তরফদার বলা হয়।
১৪১. তেলিয়া গরহী (গরহী)	রাজমহল পর্বতমালার গিরিপথে, একে বাংলার প্রবেশদ্বার ও বলা হয়।
১৪২. তেরাই	উপত্যকা।
১৪৩. তীরকার	তীরন্দাজ।
১৪৪. তোকি	রাজকীয় বসার আসন/চৌকি।
১৪৫. তান	সুর/লয়।
১৪৬. উমারা	অমাত্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।
১৪৭. উম্মাল	চাকুরে, কর্মচারী।
১৪৮. জমিদার	ভূমির উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নির্ঘণ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

অ
অনন্ত সরোবর ১৩৯
অযোধ্যা ২৭, ৪১, ১৫২, ১৬০

আ
আই এইচ কোরেশী ১৭৬
আইন ই আকবরী ২৫, ২৬, ৮০, ১৫১
আওরঙ্গজেব ৯০
আকবর ২৪, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৬, ১৪২, ১৭৭, ১৭৮, ১২৯
আকবরনামা ২৫, ২৬
আগ্রা ৩৫, ৪০, ৬১, ৯৮, ১১৭, ১১৯
আজম হুমায়ুন ১৪৯
আজমল খান কররানী ১১৬
আজমগড় ৩৫
আলেম ২৮
আব্দ আল রাহমান ২৭
আব্দ আল্লা ২৩, ২৪, ৯৩, ১৪৯
আব্দুর রহমান ১০৮
আব্দুস সালাম ২৭
আফগান ৬৩, ৬৯, ৭৯, ৮৬, ৮৭, ১১২, ১১৬, ১২৮, ১৪৮, ১৫৩, ১৬৮
আফগান এ সাহান ২৫
আফসার ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৫৭
আফগানিস্তান ২০
আবদ আল রশীদ ৪১
আবদ আল রশীদ কায়েস ২০
আবদুল করিম ১৯, ২৩, ৮৬, ৮৮, ১০৭, ১০৮, ১১১
আবদুল হালিম ১৭৮
আবুল ফজল ২৫, ২৬, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৭০, ৮০, ৯৩, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ১৩০, ১৩৬, ১৫১, ১৫৮, ১৬৯, ১৭৭
আবুল ফাতাহ ৩৯
আব্বাস খান সারওয়ানী ২৩, ২৪, ২৫, ৫৫
আমীর্জা খান ৭৯, ৮৫, ১০২
আর ডি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৩, ১২৭
আরব ১৬৮, ১৬৯
আরব সাগর ৬৬
আরশা ১৪৯
আরাকান ২৯, ৪৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪
আলম খান ১৩৭
আলতামাস ১৩৪, ১৩৫, ১৪১
আলা আল দীন ৩৫
আলাউদ্দীন আলী শাহ ৮২
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ২০, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৫১, ১২৪
আলাউদ্দিন ফিরোজ ৪৪, ৫২
আসাম ৪৩, ৪৪
আহমদ ইয়াদগার ২৪
আহমদ শাহ আবদালী ১৭২
আদিল শাহ ৯৯, ১০৪, ১১৬, ১১৭, ১৭৯, ১৮৯
আদিল খান ৯২, ১৪৯
আবিসিনিয়া ১৬৮
আমিন ১৫৫
আমিন ই বাঙালা ১৫২, ১৫৬
আমিল ১৫৭

ই
ইউসুফ জোলেখা ১৭৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইকতা ১৪৯
ইকলিম ১৪৯
ইমাদ কররানী ১২৭, ১০৪
ইরান ১৬৮
ইলশা ১২৫
ইসলাম খান ১১৬, ১৬৯, ১৭০
ইসলাম শাহ সূর ২৪
ইসলাম শাহ ২৬, ৮৪, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১৬২, ১৬৩, ১৭৭, ১৮৯
ইসমাইল সিলাহদার ১৩৩
ইব্রাহিম আদিল শাহ ২৬
ইব্রাহিম লোদী ৩৪, ৩৫
ইব্রাহিম খান ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৯৮, ১৮৭
ইলাহী বক্স ২৭
ইতিমাদ খান ১৩৩
ইলিয়াস শাহ ২৯
ইলিয়াস শাহী ৩৩

ঈ
ঈশা খাঁ ৮৮, ৯৩, ৯৪, ১৩৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৩
ঈশা খান নিয়াজী ৮৪

উ
উদয়নালা ৫৭ ১৩৯
উসতারনী ১৭০
উম্মাল ১৫৫
উড়িষ্যা ৪৪, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৪২, ১৭০
উড়িয়া ১২১

এ
একডালা ৫৩
এডওয়ার্ড গাইট ১২০
এন বি স্যানাল ১০৩
এম আর তরফদার ২৩, ১৭৯
এলাহাবাদ ১০৪
এ পি ফাইরে ২৮
এবিএম হাবিবুল্লাহ ৪২

ও
ওয়াকিয়াতে মুশতারী ২৪
ওয়াজির হোসেন ৩৯

ক
কটক ১৩৪, ১৩৭
কররানী ২০, ২৩
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১৭৯
কনৌজ ৩৭, ১৫০
কসাই ১৭৫
কাকর ১৭০
কাগজ-ই-খাম ১৫৭
কাগচি ১৭৫
কাছাড় ১২৫
কাজী ১৭৪, ১৭৬
কাজী ১৯
কাজী ফজিলাৎ ৮৪, ৮৯, ৯১, ১১২, ১৪৯, ১৫২, ১৮৮
কাজী ফজিহাত ১৫৩
কাতলু খান ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৪১, ১৪২, ১৬৪
কান্ত দুয়ার ১২৪, ১২৫
কানুন ১৭৭
কানুনগো ১৭২
কাবারি ১৭৪
কামরূপ ৪৪
কামতা ৪৪
কামতাপুর ১২৪
কারকুন ১৫৭
কাল ১৭৫
কালঙ্গী ৯৯
কালপি ৬১, ৯৯
কালাপাহাড় ৯৪, ৯৫, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৩৩, ১৪১
কালান্ধর ১৭৫, ১৭৬
কালিদাস ৮৪, ৯৩
কালিকারঞ্জন কানুনগো ২৩, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৯, ৮০,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮৪, ৮৮, ৯০, ৯৩, ১৫১, ১৫৬, ১৫১, ১৫৬, ১৫৮
কাশ্মীর ১৪৯
কিউল ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩
কিশোরগঞ্জ ৮৩
কীর্তন-ভজন ১৭৬
কুক্কুর ২০
কুচবিহার ৪৪, ১২৪, ১২৫, ১৬১
কুমিরা মসজিদ ১০২
কুতুব খান ৪১, ৪৩, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫২
কুতুবন ১৭৯
কোসামা দুর্গ ১২৩
কোসী ৩৪
ক্যাম্পোস ২১, ২৮
ক্যাটালগ অব ইন কয়েন্স ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ৮৩
কর্ণফুলী ৪৩
কর্মনাশা ৬০
ক্রাউন প্রিন্স ৪৪

খ
খুরশীদ ই জাহানুমা ২৭
খড়গপুর ৫৮
খলিফা ২৮, ১৫৫, ১৬৯
খাওয়াজ খান ১৮১
খাজা উসমান ২৫
খাজা মালদীন ৪৪
খাজাঞ্চী ১৫৭
খান ই জাহান ৭১, ১২২, ১২৮, ১৩১, ১৩৫, ১৩৮, ১৪২
খান ই জাহান মুনিম খান ২৬
খান জামান ১২২
খান জাহান লোদী ২৫
খান জাহান ১৪০
খানপুর ৯৪, ১১৫
খানকা ১০০, ১৭৩, ১৭৫
খান্নাৎ ১২২
খালগাঁও ৩৩, ৩৪, ৫৭, ১৭৯
খারিদ ৪৪,
খিলাৎ ১৩৬
খিদির খান সূর ৭১, ৮১, ৮৮, ১৪৮, ১৫২
খিদির খান সূর্ক ৮৪, ৮৯, ৯৩, ১০৫, ১০৬, ১১৮, ১৮৮
খুলনা ৮৯
খুলাসাত আত তাওয়ারিখ ১৬২
খুতবা ৫১, ১০৫, ১০৬, ১২২, ১২৮
খোদা বখশ খান ৪৩, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ১০২
খোয়াশ খান ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮৪

গ
গরহী ৬২, ৬৪, ৬৯
গঙ্গা ৩৪, ৩৮, ৫৮, ৬৩, ১০৬, ১০৯, ১১৬, ১৩২, ১৩৯
গন্ধক ৩৪
গঞ্জ ই রাজ ২৭
গঞ্জেরাজ ১৮২
গাড়গাঁও ১২৫
গাওহার গোসাইন ৪০
গাজীপুর ১২৮
গাক্ষার ১৪৯
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ২৮, ৪০, ৪৪, ৫১, ৫৭, ৭১, ৮৭, ৯৩
গিয়াস আল দীন মাহমুদ শাহ ২৯, ৫৪, ৫৫, ১০২, ১৫২, ১৮৭
গিয়াস আল দীন বাহাদুর শাহ ১০২, ১০৪, ১১০, ১২১, ১৮৯
গিয়াস আল দীন জালাল শাহ ১১১, ১১২, ১১৯
গিধোর ৬৩
গুলশান ই ইব্রাহিমী ২৫, ২৬
গুলবাদান বেগম ২৬, ৬৮
গুজরাট ৩৫, ৩৭, ৪৩, ৬৭, ১৩০, ১৩১
গুজার কররানী ১২৭, ১২৮, ১৬৪
গোমতী ৪১
গোরখপুর ১২৮
গোলা ১৭৪
গোয়া ৮৯
গোয়ালিয়র ১২০
গোলাম হোসাইন সেলীম ২০, ২১. ২৭, ৪২, ৫২, ১১৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৌড় ১৯, ২২, ২৩, ২৭, ৩৩, ৪২, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ১০৪, ১০৫, ১১২, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৭, ১২৮, ১৬৮, ১৮৭
গ্রান্ড ট্রাংক রোড ৮০, ৮৮, ১৩২, ১৫৯, ১৮৮

ঘ
ঘাঘরা ৩৪, ০৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮
ঘোড়াঘাট ১২৪, ১২৫, ১৩৩, ১৩৮
ঘোষাল ১৭৪

চ
চট্টগ্রাম ২৩, ২৯, ৪৩, ৮০, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২, ১০০, ১০৮, ১২৫, ১৭০, ১৮৯
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২৩
চন্ড ১৩
চন্দ্রকোনা ১৬২, ১৭০
চন্দ্রভান ১৭১
চাঁদ শাহের ঝিল ১৩৯
চাম্বাল ১৫০
চার্লস স্টুয়ার্ট ২১, ৯৮, ১২০
চার্লস বেভারেজ ২৭
চাং ১৭৭
চিতোর ১২৪
চুনার ৩৮, ৪০, ৪১, ৬৭, ৬৮, ১০৪, ১০৫, ১১১, ১১৭
চুটিয়া-পুটিয়া ১২৮
চেরীনুল্লা ৬৪
চৌদ ৩৬
চৌসার যুদ্ধ ৭০, ৭৯, ৮৯, ১৮৭

ছ
ছাপ্পার ঘাট ১০৫

জ
জওহর আফতাবচি ২৬
জগন্নাথ পুরীর মন্দির ১২৪
জগন্নাথপুর ৭৫
জলপাইগুড়ি ১৬১
জয়ন্তিয়া ১২৫
জহির আল দীন মহম্মদ বাবর ২৬, ৩৩
জশোদল ৮৩
জর্জ উডন ২৭
জায়েদপুর ২৭
জান্নাতাবাদ ৬৯
জামান মির্জা ৩৮, ৪১
জামানিয়া দুর্গ ১২২
জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ ৮২
জালাল উদ্দিন ফিরোজ ৫৪
জালাল খান লোহানী ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৩৮, ৪০, ৫৪, ১৪৮, ১৮৭
জালাল খান জৌনপুর ৭০
জালাল খান ৫৫, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৯৩
জালাল খান বিন জাল্লু ৭১
জালাল সার্কী ৩৭
জাহাঙ্গীর ১৩৭, ১৬৯
জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৯
জায়গির ৩৬, ১১৬, ১১৭, ১২১, ১৫৩, ১৫৪, ১৮৮
জায়গিরদার ৩৮, ৪০, ৬১
জুনায়েদ বারলা ৩৮, ৪১, ৬৬
জুনায়েদ কররানী ১৩৪, ১৪১
জে এন সরকার ১২৩
জোলা ১৭৪
জোয়াও দ্য বারোস ৪৩
জোয়াও দ্য ভিলালোবম ৬৩
জোয়াও কোরী ৬৩
জৌনপুর ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৯৯, ১০৯, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৮, ১৭৯

ঝ
ঝাঁসী ১০৪, ১০৫, ১১৮
ঝাড়খণ্ড ৩৪, ৬৪, ৬৫, ১৩৪

ট
টকশাল ২৯, ১০২, ১০৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টি কে রায় চৌধুরী ১৭২
টোডরমল্ল ৯২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৬৪
ড
ডাচ ১০৪
ডোমজালা ১৩৯

ঢ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২

ত
তবকাত ই আকবরী ২৫
তাজ খান ৯৩, ১০৭, ১১২, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২৬
তাজখান সারংখানী ৪০
তাজকিরাত উল ওয়াকিয়াত ২৬
তাতার খান লোদী ৬২
তান্ডা ৩৬, ৯৪, ১১৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৭, ১৪৮
তাম্বুরা ১৭৭
তারিখে দাউদী ২৩, ৬৩, ৯৩
তারিন ১৭০
তারিখ ই শেরশাহী ২৪, ২৫, ৮৯, ১৫২, ১৭৪
তারিখ ই আকবরী ২৫
তারিখ ই শাহী ২৪
তারিখ ই সালাতীন ই আফগানী ২৪
তারিখ ই চট্টগ্রাম ১৭০
তারিখ ই ফিরিশতা ২৫
তারিখ মহম্মদ ২৭
তাসাউফ ২৭
ত্রিপুরা ২৭, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮০, ১০০, ১০৩, ১০৮, ১০৯, ১২৫, ১৭০
ত্রিহুত ৩৪, ৩৫, ১৩৮
তীরকার ১৭৫
তুকারয় ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭
তুর্কী ২১
তুঘলকপুর ৩৪
তেজপুর ১২৫
তেলিয়াগড় ৩৪, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ১৩৩

দ
দরিয়া খান লোহানী ৩৫, ৯৩
দরিয়াপুর ১০৬, ১০৭, ১৩২
দর্জি ১৭৫
দাউদ কররানী ২৪, ১৬৪
দাউদ শাহ কররানী ২৩, ২৪, ২৫, ১৮৯
দাউদ খান কররানী ১৯, ১২৯, ১৪২
দান্তন স্টেশন ১৩৪
দানিয়েল ৩৪
দ্বারভাঙ্গা ৩৫, ৪৩
দিনাজপুর ৫৩, ১২৭, ১৭০
দিলওয়ার লোদী ৭১
দিয়াগো বিবেলা ৮৫
দিল্লি ১৯, ২১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪২, ৫৩, ৭৯, ৯৫, ৯৮, ১০৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১৬৪, ১৬৮
দুদু বিবি ৩৭, ৪০, ১৪৮
দেওতলা ১২৭
দেবরাকসাই দুর্গ ১৩৪
দেহী ১৫৯
দৌলত উজির বাহরাম খান ২৯, ১৭৯
দ্য ব্যারোস ২১

ন
নওয়াজিশ খান ৮৪, ৮৬
নর-নারায়ণপুর ১২৪
নাফ নদী ১৭১
নাসির আল দীন নুসরাত শাহ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫১, ৫২, ৫৩, ১০২, ১৮৬, ১৮৭
নাসির উদ্দিন হুসেন শাহ ৩৯
নাসির খান লোহানী ৪০
নাসির শাহ ৫০
নিমাত আল্লা ২০, ২৪, ২৫, ৫৩, ৫৪, ৭৯, ৯১, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩২, ১৪০, ১৪৯, ১৫২, ১৭১
নিজাম আল দীন আহমদ বখশী ২৫, ২৬
নিজাম খান সূর ৯৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীরোদ ভূষণ রায় ২২, ৭৯, ৮০, ৮৮, ৯৪, ১০৫, ১০৭, ১৫১, ১৮১
নুনো দ্য কুনহা ৬৬
নুনো ফার্নান্দেজ ফ্রেইরি ৭৯, ৮৫
নোগাজিল ৭৯, ৮৫

প
পরগনা ৩৮
পশতু ২০
পয়গাম ৮৯
পদ্মা ১৬০
পর্তুগিজ ২১, ২৮, ৪৩, ৪৪, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ১০২, ১০৪, ১৬১, ১৮৮
পাখওয়াজ ১৭৯
পাখতুন ২০
পাটনা ২০, ৩৪, ৩৫, ১০৬, ১০৭, ১২২, ১৩১, ১৩২
পাটোয়ারী ১৫৮
পাঠান ১৯, ২০, ৮৭, ১০০, ১৩৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭৪
পানিপথ ৩৫, ৪১, ১১৮
পানী ১৭০
পার্জি মাইকিস ২০
পাঞ্জাব ৯০
পাণ্ডুয়া ২৭, ৮২, ১২৭
পান্ডোভাস ১২৩
পাবনা ১৭০
পারস্য ৪৪
পি-শরণ ১৫১, ১৫২
পিঠারি ১৭৪
পুনপুন নদী ১৩০
পুরী ১২৪
পূর্ণিয়া ৬৬

ফ
ফজল গাজী ৮০, ৯০, ৯৪
ফরিদ খান সূর ৩৫
ফরিদপুর ১৭০
ফরিদাবাদ ৮০
ফতেহ মালকা ৪২
ফতেহ খান ৩৭
ফতেহ খান সারওয়ানী ৩৭
ফতেহদার ১৫৭
ফতেহপুর ১১৯
ফতেয়াবাদ ২৭, ৮২, ১০৪, ১০৮, ১৭০
ফাইয়াদ আল রহমান ইসলামাবাদী ১০৮
ফারসি ২৪, ২৭, ১৬৯
ফিরোজ ৩৯
ফেরান্দাজ ৬৩, ৬৪, ৬৫

ব
বখতিয়ার খলজী ২৭, ৩৪, ১২৫
বগুড়া ১১০, ১১১, ১৬০
বদরশাহী ৪৩
বরিশাল ৮৯, ১৭০
ব্রহ্মপুত্র ১০৭, ১২৫, ১৬০, ১৬২
বর্ধমান ১৭০
বাকলা ৮৯
বাজ বাহাদুর ১৭৯
বাজাউর ২০
বাতানি ১৭০
বাদাউনী ১২৬, ১৭৭, ১৮১
বাহালুল লোদী ২৪, ২৫
বাবর ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫১, ৫২, ১৭৫, ১৮৬
বাবরনামা ২৬
বাবুই মানকালী ১৩৩
বারিদ ১৫৯
বালিয়া ৩৪
বাহরিস্তান ই গায়েবী ১৬১, ১৬৯, ১৭২
বাহরাইচ ৭০
বাহাদুর শাহ ৪৩, ৬৬
বাহাদুর শাহ গাজী ২৭
বাহাদুর শাহ গুজরাটি ৪১
বায়ানা ৬২
বায়েজীদ ৩৭, ৪০, ৪১, ১২৭
বায়েজীদ রিয়াত ২৬
বান্তেলখন্ড ৪২

আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বারো ভুঁইয়া ৮৮
বাঁশখালী ১০২, ১২৫
বাংলা ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৭০, ৭৯, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৮, ১০৩, ১১৮, ১২৭, ১৪৮
ব্রাহ্মণ ১৭২, ১৭৩, ১৭৬
বিজয় মানিক্য ২৭, ৮৯, ১০৮, ১০৯
বিজয়গুপ্ত ১৭৯
বিদ্যাসুন্দর ৪৪
বিবান ৩৭, ৪০, ৪১
বিলগ্রাম ৬৫, ৭৯, ১১৬, ১৮৮
বিহার ২২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৩, ৫২, ৫৬, ৬৬, ৬৯, ১১৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৪৮
বিহার খান লোহানী ৩৬, ৩৯, ১৪৮
বিন্ধ্য ৯৩
বিপ্রদাস পিপলাই ১৯, ২০, ১৭৪, ১৭৯
বিশ্বসিনহা ১২৪
বীণ-১৭৭
বীরভূম ১৭০
বীর হামীর ১৭১
বুকানন ১৩৯
বুরদিলন ১০৩
বেনারস ৬৮, ৬৯
বেলুচিস্তান ১৮০
বৈরাম খান ১৩৮

ভ
ভগবানগোলা ৬৪
ভট্টশালী ৮৩, ৮৪, ৮৮, ৯০, ৯৪, ১০০, ১০৭, ১০৮, ১২০, ১২৯, ১৩৫, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৫১
ভদ্রক ১৩৮
ভাগলপুর ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৫৭, ৬২, ১৩৩, ১৩৮, ১৪১
ভারত ৭৯
ভারতবর্ষ ১৯, ২৬, ৩৬, ১০৯, ১২১
ভারকুন্ডা ৬৮
ভাট্টা রেওয়া ৪১

ম
মকতুল হুসেইন ২৯
মকবুল আহমদ বানারসী ১০৮
মখদুম ১৯
মগ ১৭১
মজলিস ই আল্লা ১৭০
মজলিস কুতুব ১৭০
মনসা বিজয় ১৯, ১৭৪
মনিপুর ১২৫
মসনদে আলী দরিয়া খান ৫৫
মসজিদ ১৭৩
মহম্মদ খান ২৯
মহলানবীশ ১৫৯
ময়মনসিংহ ৮৩, ৮৮, ৯৪, ১৭০
মক্তব ১৭৩, ১৭৫
মাওলানা আবদুল হাই ১০৮
মাখদুম ই আলম ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ১২৪, ১৮৬, ১৮৭
মাখজান ই গঞ্জেরাজ ১০৮
মাঘী যুগ ৮৭
মাজনুন খান কাকশাল ১৩১, ১৩৩
মাতামুহুরী ৪৩, ১৬২
মারুফ ফার্মুলী ৪৪
মালদা ১৩৯
মালওয়া ১৭৮
মালওয়া ৪১
মাহমুদ লোদী ৩৭, ৩৯, ৪১
মাহমুদ শাহ ৪৩, ৫৩, ৬০, ৬১, ৮০, ৮৫
মার্টিম এফোনসো দ্য মেলো ৬৫
মাদ্রাসা ১৭৩, ১৭৫
মান্দারন ১৩৪
মান্দাসর ৬২
মিন বিন ২৭, ৮৭, ১০১
মিরের সরাই ৯১
মিয়া ইব্রাহিম খান ইউসুফ খাইল ৪১
মিয়া ইয়াহিয়া ৯৮
মিয়া খান সূর ৩৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিয়া হানসু ৫৪, ৫৫
মির্জা নাথান ১৭২
মীর সাইয়েদ মোহাম্মদ খান ১৭৬, ১৮৩
মীর সাইয়েদ রুহুল্লাহ ১৭৭
মুকাদিম ১৭৪
মুকুন্দ দেব হরিচন্দ্র ১২২, ১২৩
মুকুন্দরাম ১৭৪
মুকেরি ১৭৪
মুজাফ্ফর খান ১৪০
মুনতাখাব আল তাওয়ারিখ ২৫, ২৬
মুবারিজ শাহ ২৯
মুবারিজ খান ৯৮, ১০১, ১৭৭
মুলিঞ্চপুর ৬৩
মুলিপুর ৬৩
মুলুক আল তাওয়ায়েফ ৮৯, ৯১, ৯৮, ১১২, ১৬৮, ১৮৮
মুসলিম বিজয় ১৯, ২০
মুসলিম শাসন ২১, ২২
মুহম্মদ আদিল শাহ ৯৮, ১১৮
মুহম্মদ কুলী খান ১৩৩
মুহম্মদ খান ৮৫, ৮৬, ৯৩, ১১৯
মুহম্মদ খান লোহানী ৩৫
মুহম্মদ শাহ গাজী ২০, ১৮৯
মুহম্মদ জামান মির্জা ৩৭, ৪০
মুহম্মদ বিন তুঘলক ৮২
মুহতাসিব ১৭৯, ১৮১
মুন্তাখাব আল তাওয়ারীখ ১৩৩
মুদ্রা ২৮, ২৯, ৪৩, ৫১, ৬১, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১১০, ১১২, ১২২, ১২৭, ১৫১, ১৬৯
মুদ্রালিপি ২৩
মুঙ্গের ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ৫৫, ৫৭, ৬২, ৬৩, ৭১, ১০৬, ১০৭, ১২৯, ১৩৩, ১৮৭
মুন্সিফ ১৫৬, ১৬৩
মুন্সিফ ই মুন্সিফান ১৫৪, ১৫৬
মৃগবতী ১৭৯
মেঘনা ১০৭, ১০৮
মোকাদ্দাম ১৫৫, ১৫৮, ১৬২
মোগল ১৯, ২০, ২১, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৫১, ৫৫, ৫৭, ৬২, ৯১, ৯২, ১০৯, ১১১, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১৩৩, ১৪৮, ১৮৬
মোগলমারীর যুদ্ধ ১৩৫
মোদাব্বির ১৫৮
মোঙ্গল ১৯, ১৭৪
মোল্লা ১৯, ১৭৪
মোল্লা আব্দ আল কাদির রাদাউনী ২৫, ২৬
মোল্লা আব্দুল্লা নিয়াজী ১৮০
মোল্লা মুহম্মদ মাধব ৩৬
মৌর্য ১২৫

য
যদুনাথ সরকার ২২
যমুনা ১৫০, ১৬০
যশোর ১৩৩, ১৪২
যশোরাজ খান ১৭৯

র
রওদাত আল তাহিরীন ২৭
রহিম ২১, ১০১, ১০৩, ১০৭, ১১৫, ১৮১
রঘুভাঙ্গা ১২৩
রংরেজ ১৭৫
রাকাঞ্জ ১০৪
রাজমহল ১৯, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ১৩৯, ১৪১
রাজমালা ২৮, ৮৯, ১০০, ১০৮
রাজশাহী ১৭০
রাজপুত ১৭১
রামদাস ১৭৭
রামানন্দ গুহ ১২৬
রায়ত ১৫৬
রায় পারমানন্দ রায় ৮৯
রায় হুসেন খান জালওয়ানী ৮৪
রিজক আল্লা মুশতাকী ২৪, ১৪৯
রিয়াদ আল সালাতিন ২১, ২৭, ৬২, ৯৩, ৮৪, ১০৬, ১১২, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৩০
রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ ১২৮
রোহতাস ৮৯, ১১১, ১৩৭, ১৪৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রোহিলাখণ্ড ১৫২
র‍্যাভেন শ ১২৭

ল
লক্ষ্মণাবতী ১৬৮
লাইলী মজনু ২৯, ১৭৯
লাদ মালকা ৪০, ৪১
লোদী ৩৩, ৩৯, ১২৪, ১২৬, ১৩০, ১৬৪
লাম্মী ৩৪

শ
শরন ৩৪, ৩৫, ৩৭
শরীফাবাদ ৮২
শামস আল দীন ২০
শামস আল দীন মুহম্মদ শাহ গাজি ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫
শামস আল ইসলাম ১০৮
শামা ১৭৭, ১৮২
শায়েখ বুদ্ধ ১৭৭
শাহ মুহম্মদ সগীর ১৭৯
শাহ মুহাম্মদ ফার্মুলী ৩৭
শাহবাজ খান ৯৯, ১০৪, ১০৫
শাহাবাদ ৩৮
শিকদার ১৫৭, ১৬২
শিকদার ই শিকদারান ১৫৪, ১৫৬
শিকরিগলি ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭
শিলালিপি ২৩, ২৮, ২৯, ৮৫, ৮৭, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১৭১
শিলিগুড়ি ১৬১
শ্রী হরি ১৩২, ১৩৩, ১৪১, ১৬৪
শ্রীকর নন্দী ১৭৯
শ্রীচর ১৭৯
শুক্লাধ্বজা ১২৪, ১২৫
শুক্লেন মং ১২৪
শেখ ১৭০
শেখ আলাই ১৮০, ১৮১, ১৮২
শেখ ইসমাইল হাজিয়া ২৫
শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজী ১২৭
শেখ নুর কুতুব আলম ১২৭
শেখ বুধ ১৮১, ১৮২
শেখ শরাফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী ১২৭
শেখ হাসান ১৮০
শের খান ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১
শেরগড় ১৮৮
শেরপুর ৬৪, ৬৯, ৯১, ১১০, ১৬০, ১৮৮
শেরশাহ ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৮, ৫২, ৬৩, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০২, ১১৬, ১২১, ১২৭, ১৩০, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৮৭, ১৮৮
শেহনাই ১৭৭

স
সনোকার ১৭৫
সপ্তগ্রাম ১৯, ১২২
সম্বল ৭০
সাইয়েদ ইবনে রসুল ১৭৭
সাতকানিয়া ১০৮
সাতগাঁও ১৯, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৪, ৯২, ১২২, ১৭৪, ১৮৯
সাদাত ১৭৩, ১৭৪
সামপায়ো ৭৯
সারনাথ ৬৮
সারমস্ত খান সারওয়ানী ৭০
সারওয়ানী ৮৩, ৮৯, ৯০, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৭, ১৬১, ১৭১, ১৭৪
সারকী ৩৩
সারংপুর ১৭৯
সালতানাত ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪৪
সাসারাম ৩৬, ১৩৭, ১৫৪
সাঙ্গু নদী ১২৫
স্বামী হরিদাস ১৭৭
সিকান্দার লোদী ৩৭
সিকান্দার শাহ ৩৪, ৯৮, ১৭৭
সিক্কা ৫১, ১০৫, ১২৮
সিজার ফ্রেডারিক ১২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিধি আল রাইস ১০৪
সিলেট ৮৩, ৮৮, ৯৪, ১০৯, ১৭০
সিয়ার আল মুতাখখারিন ১৩৯
সিন্ধু ২০, ৯৩, ১৪৮
সুরদাস ১৭৭
সুরুজগড় ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ১০৬, ১২৩, ১৩৩, ১৮৭
সুলতান ২৮
সুলতান মাহমুদ শাহ ৫৫, ৬৮, ৮৪, ৯২, ১৪৮
সুলতান মুহাম্মদ ৩৯
সুলতানগঞ্জ ৫৭
সুজাত খান ৯৮
সুতি ৫৭
সূফি ২৮
সেলিম শাহ ১৭০
সৈয়দ ১৯, ২০, ৫১, ১৭০
সৈয়দ মাহমুদ শাহ ৭৯
সোনা মসজিদ ১২৭
সোনারগাঁ ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ১২৭, ১৪৮, ১৬০
সোনাক্ষীরা ৮৩
সোলায়মান বাইসা ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১১৬
সোলায়মান মানকালী ১৩৩
সোলায়মান কররানী ২৯, ৯৮, ১১৬, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৭১, ১৮৯
সোলায়মান খান ৯৩
সোয়াতি ২০

হ
হযরত ই আলা ১৪৮
হরিপুর ১৩৪
হাজাম ১৭৫
হাজী মুহাম্মদ খান ৪১
হাজী খান বটনী ৬৮, ৭০, ৭১
হাজীপুর ৩৫, ৪২, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৮, ১২৮, ১৩২, ১৮৬
হাটকান্ট ১৫০
হাবশী ৩৩
হাবিব খান ৮৪
হাবিবুল্লাহ ১০৩
হাবীব আল্লা ২৪
হামজা খান ৪৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭
হামিদ আল্লা খান ১০২, ১৭০
হাসান খান ১৫৪
হায়বাৎ খান নিয়াজী ৮৪
হিজলী ১৬২, ১৭০
হিন্দি ২৪, ১৬৯, ১৭৩
হিন্দু ১৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৭
হিন্দু বেগ ৪১, ৬৬
হিমালয় ৯৩
হিমু ৯৯, ১০৬, ১১৭, ১১৮
হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ২১
হুমায়ুন ২৬, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৫৭, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭৯, ৮০, ১০৬, ১১৬, ১২০
হুমায়ুননামা ২৬
হুসেন শাহ ২৯
হুসেন শাহ সারকী ৩৩, ৩৯
হুসেন শাহী বেঙ্গল ২৩
হুসেন শাহী ৫১
হৈবত খান ৬৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও